বাংলা অনুবাদ : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1960

Original Title : BRAHMAN KANYA (*Marathi*)
Bengali Translation : BRAHMAN KANYA

ডিসট্রিব্যুটার
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমণ্ড স্ট্রিট,
কলিকাতা–700 001

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীণ পার্ক, নিউ দিল্লী-110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং পুরাণ প্রেস, 21, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-700004 দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীধর ভেঙ্কটেশ কেতকর (জন্ম ইংরাজী 1884 সালের 2রা জানুয়ারি ও মৃত্যু 1937 এর 10ই এপ্রিল) ব্রাহ্মণ কন্যা উপন্যাসটির লেখক। 'বিদ্যাসেবক' পত্রিকায় 1928 সালে এটি তিনি লিখতে শুরু করেন। পরে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লেখা সম্পূর্ণ করে 1930 সালে পুস্তকাকারে সেটি তিনি প্রকাশ করেন।

মারাঠী সাহিত্যে ডঃ কেতকর কেবল একজন পণ্ডিত লেখকই নন, তাঁর নাম ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য। পঁচিশ বছরের সাহিত্য-জীবনে নানাভাবে বিপুল সাহিত্য-সম্ভার তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। অতঃপর উল্লিখিত সব বক্তব্য থেকে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, গবেষণা ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর স্বীয় বিশিষ্টতা, তবে সাহিত্যিক পর্যালোচনা, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি সৃজনশীল ব্যাপারেও কিন্তু তিনি সহজেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তাঁর কিছু লেখা যেমন অপরিসীম ফলপ্রসূ হয়েছে, আবার অন্য ধরনের রচনার জন্য তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জনেও সক্ষম হন।

বস্তুত নিছক সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য উনি লেখেন নি। তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা ছিল ভিন্ন। তখনকার দিনে তীক্ষ্ণধী ও অসম সাহসিক যুবক সমাজ মাতৃভূমির সেবায় জীবনোৎসর্গের কল্পনাতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হত। সেই কারণে শিক্ষাকালে ও তা গ্রহণান্তে তিনি নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছিলেন, "আমি যা জেনেছি, তা অন্যেরও জানা দরকার: বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা সকলেরই প্রয়োজন।" বুঝে-শুনেই এরকম একটা সংকল্প তিনি করেছিলেন। আর এ-ধরনের একটা আন্তরিক তাগিদের দরুন, আগে যা জানতেন না, তা জানার জন্য, আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি 1906 সালে আমেরিকায় যান।

তাঁর সমর্থনটা ছিল উগ্রমতাবলম্বীদের অনুকূলে। তবে বিপ্লববাদীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও ডঃ কেতকর যুক্তি-বিচার-সহ এ-পথের ব্যর্থতা সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। "সত্যিকারের দেশসেবা করতে হলে, রাজনীতি, সমাজ-তত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যায় পারঙ্গম হওয়া আবশ্যক আর দেশের নানা সংস্কার-প্রচেষ্টায় অধীত বিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজন।" শিক্ষা-কালেই তাঁর মনে এ-ধরনের চিন্তা জাগে আর নিজের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কেও তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। শিক্ষাকালেই তিনি স্বাবলম্বী ছিলেন তাই সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নে তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রবল জ্ঞানস্পৃহা আর কেবল পাঠ্য-পুস্তকেই মনোনিবেশ নয়, সব রকম পড়াশুনাই ধ্যান-জ্ঞান করে স্বীয়ভাবে জ্ঞানোপসনাতেই তিনি লিপ্ত হলেন। জ্ঞানের গভীরে তিনি ডুব দিলেন। এদিক-ওদিক যা-কিছু পেলেন, সবই এক বুভুক্ষুর মতো আত্মসাৎ করতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা থেকে সমাজ-বিদ্যায় পি. এইচ.ডি. অর্জন করলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল হিস্ট্রি অব কাস্ট অর্থাৎ জাতিবর্ণের ইতিহাস। এ লেখায় পণ্ডিতমহলে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম বৃদ্ধি পেল। প্রতিভাসম্পন্ন এক নব্য ভারতীয় যুবক হিসেবেও কেত-

করের নাম সুপরিচিত হয়ে উঠল। আর শুধু তাই নয়, তিনি আমেরিকায় থেকে গেলে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবন যাপন করতে পারতেন তা উপেক্ষা করে যে-প্রেরণায় তিনি সে-দেশে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই একই প্রেরণাতেই উদ্‌বুদ্ধ হয়েই (সে সময়কার তাঁর রচিত এক কবিতা) 'রাষ্ট্র, ত্যাগ ও মোহ'-র বক্তব্য অনুযায়ী তিনি মাতৃভূমি অভিমুখে রওয়ানা হন। ভারতীয়দের কাছে ইংল্যাণ্ডের একটা অন্য মর্যাদা ছিল ; সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি ফেরার পথে অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করে সেখানে এক বছর থেকে যান। অবশেষে 1912 সালে তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন।

ফিরে আসার পর বেশ তাড়াতাড়ি তিনি কাজ-কর্ম শুরু করে দেন। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কোনদিনই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এই কারণেই বরোদা সরকারের চাকুরী তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উচ্চ বেতন, পদমর্যাদা ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের পরিবর্তে, তৎকালীন জনপ্রিয়তা উপেক্ষা করে, তিনি জীবন-ব্রত হিসাবে শিক্ষাদান শুরু করলেন। কিন্তু এভাবে অন্নসংস্থান বড় কষ্টকর। এটাও তিনি জানতেন। তবে এটা একটা বড় কাজ আর জ্ঞানচর্চা এতে সম্ভব এই আশায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-অধ্যাপক হিসাবে তিনি যোগদান করেন। কিন্তু তাঁর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা আর সত্য-সন্ধান-ব্রতের কারণে এক বৎসরের মধ্যেই সে চাকুরী হাতছাড়া হয়। তাঁর মত লোকের পক্ষে কোন চাকরী স্থায়ীভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

চাকুরী যাওয়ার ফলে কিন্তু তাঁর লোকশিক্ষার ব্রতে কোনও বাধা এল না, কিংবা কর্মসাধনা বন্ধ রইল না। বরং এ-সময়টায় তিনি সামাজিক নানা সমস্যা সম্পর্কে প্রচুর লেখা লিখতে লাগলেন। বিদেশে থাকার সময় নানা অনুভূতি ও চিন্তা মনের গভীরে যা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছিল, অবিরাম তা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেতে লাগল। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর,

মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ইত্যাদি অঞ্চল ঘুরে ও স্থানীয় সব সমস্যার পটে তিনি তাঁর শিক্ষাদান-কর্মসাধনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি প্রাচীন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ছিলেন। নিজের জ্ঞান ও উপলব্ধির আলোতে তিনি নতুন বক্তব্য রাখলেন। নানা প্রশ্ন বিচারের ব্যাপারে তিনি একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সব দেখতেন। শ্রোতাদের সামনে তিনি তা তুলে ধরতেন। তাঁর মতামত শুনে শ্রোতৃবৃন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠত। সমাজ-বিদ্যায় তাঁর দৃষ্টি সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল, তাই তাঁর স্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন ভাবে আলোচিত সামাজিক প্রশ্নাবলী, জনসাধারণকে নতুন চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ করত। আর এই সব-কিছুতেই একটা বিশেষ লক্ষ্যে তিনি চলতে চাইতেন। তা হল, "রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষা বিষয়ক ইত্যাকার সর্বপ্রকারভাবে রাষ্ট্রের সংস্কার প্রয়োজন আর তাই চাই অসংখ্যচক্রযুক্ত গাড়ীর দ্রুত বেগ।"

এবম্প্রকার শিক্ষাদান ও জ্ঞানার্জনকালে দূরপ্রবাসে 'অন্ধ্র বিজ্ঞান সর্বস্বম্' নামক তেলেগু ভাষায় এক বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজ তিনি কাছ থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেন। আর এইভাবে প্রত্যক্ষ কাজ কিছু করার এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষা তাঁর পিপাসু মনের কোণে উঁকি দিতে থাকে। তিনি চিন্তা করে বুঝলেন যে জ্ঞানব্রত-উদ্‌যাপনের একটা বিস্তারিত ও স্থায়ী ধরনের কাজ 'মহারাষ্ট্র জ্ঞানকোষ' প্রণয়ন প্রয়োজন।

ট্যাঁকে একটি কাণাকড়িও নেই। আর সে অবস্থায় এ-ধরনের কাজের চিন্তা আকাশছোঁয়ার মতোই একটা পাগলামি ছাড়া আর-কিছু ছিল না। তাঁর কিছু বন্ধুব্যক্তির মনে হল কাজে বাধা দিয়ে লাভ নেই। তাঁরা তাই অমত করলেন না। আর অধিকাংশের মনে হল এ-এক অসম্ভব কল্পনা। কিন্তু ডঃ কেতকরের স্বভাবটাই এমন ছিল যে কোনও চিন্তা মনে উঁকি দিলে, সাহস না হারিয়ে উল্টো আরও জোরের সঙ্গে সে-কাজে এগিয়ে যেতেন। তখনকার বুদ্ধিমান নব্য-

যুবকদের এমনই সাহস আর মনোবল ছিল যে তাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই রাজনীতিতে আত্মোৎসর্গ করেছিল। অনেকে আবার সমাজ-সংস্কার কর্মে জনমতের বিরুদ্ধতাও মেনে নিয়েছিল। ডঃ কেতকরের মনোভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল সাহিত্যে। তাই শারীরিক গ্লানি আর তাঁকে সইতে হয় নি।

জ্ঞান-কোষ প্রণয়নের উপযোগী প্রখর পাণ্ডিত্য আর যোগ্যতা দুই-ই ডঃ কেতকারের ছিল। সবরকমের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় আর সম্যক জ্ঞান তাঁর খুবই ছিল। অভিধান-কোষাদির সংকলন সম্পাদনের প্রয়োজনীয় দৃষ্টি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। পঠিতব্য বিষয় একত্রিত করার ধরনটাও তাঁর জানা ছিল। কিন্তু জ্ঞান-কোষ প্রণয়নের কাজ শুরু করার মতো আর্থিক সামর্থ্য বিশেষত লেখকদের সহযোগিতা লাভ করা, প্রয়োজনীয় শিক্ষণ-শৈলীর ব্যবস্থা এইসব নানা কঠিন বাধা ছিল তাঁর পথে। তবে ডঃ কেতকর এ-সবের সমন্বয়সাধন করে তাঁর সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিদেশে নতুন যা-কিছু দেখেছিলেন বা জেনেছিলেন, তা সবই এই কাজে তিনি যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করেন। কাজের লোক সব জুটিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এরকম বিরাট ব্যাপারে যে-সব দলাদলি বা কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়, তা সবই সামলে নিয়ে প্রচুর সাহস আর প্রয়োজনীয় সহযোগিতার দ্বারা বারো থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে তেইশ খণ্ডে তিনি সুপার রয়েল আকারের হাজার পৃষ্ঠার জ্ঞান-কোষ সম্পূর্ণ করলেন। আর মারাঠা-ভাষী জনসাধারণের হাতে এই গ্রন্থ তুলে দিয়ে অনুক্ষণ তাদের আলোকিত করে তুললেন।

জ্ঞান-কোষের প্রস্তাবনা খণ্ডটা বেশ বড়। সেটা তিনি নিজেই লিখেছেন। 1915 সালে কাজ শুরু করে অবিরাম পরিশ্রমের দ্বারা 1929 সালে এ-মহৎ কর্মটি তিনি সম্পন্ন করলেন। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যে এটি একটি অপূর্ব গ্রন্থ। কোষের জন্যই ডঃ কেতকরের নাম অমর হয়ে রইল।

1929 সালে জ্ঞানকোষ সম্পূর্ণ হল। তবে ডঃ কেতকরের কাজ কিন্তু শেষ হল না। কাজের ফাঁকে একটু অবসর হতে এবং কাজটা যাতে চালু থাকে, সে-উদ্দেশ্যে তিনি 'বিদ্যাসেবক' মাসিক পত্রিকা বার করলেন। জ্ঞান-কোষের পর আট-ন' বছর তিনি বিপুল উদ্যমে সাহিত্য-চর্চায় মেতে রইলেন। তবে মনের সুউচ্চ বিচরণ ও আবিষ্ট সাধনার ফলে শারীরিক দিক থেকে তিনি কাবু হয়ে পড়লেন। তাঁর বহুমূত্র রোগ ছিল। দিনে দিনে তা বেড়ে যেতে লাগল এবং শরীরটাকে একেবারে ঝাঁজরা করে দিল।

সে-সঙ্গে জ্ঞানকোষ প্রকাশের শেষ পর্যায়ে আর্থিক অনটনও মাথা চাড়া দিল। প্রতিবন্ধক উত্তরোত্তর আরও বড় আকার ধারণ করল। গ্রন্থ-প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-সংগ্রহের কাজেও তাঁকে মন দিতে হল। বই-বিক্রির ব্যাপারেও সব ব্যবস্থাদি তাঁকেই করতে হল। তবুও সতত আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ নিয়ে আশাবাদীর মন নিয়ে তিনি কাজ করে যেতেন। তাই রোদে পুড়ে ঘুরে ঘুরে বইও বেচতেন। যখনই কিছুটা সময় পেতেন, তা যেখানেই হোক, বাহিরের দুনিয়া ভুলে নিজের চিন্তা-ধারা লিপিবদ্ধ করে যেতেন। কখনও কখনও পারিবারিক দুরবস্থা ও অনটন তাঁর বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠত, কিন্তু কখনও নৈরাশ্যের কালো মেঘ তাঁকে ঘিরে ধরতে পারে নি। মুখে তাঁর সদাসর্বদাই স্মিত-হাস্য লেগে থাকত। এক স্থিতপ্রজ্ঞ বিদ্বানের মতোই মন স্থির রেখে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অবিরাম লিখে গেছেন। জীবদ্দশায় তিনি যে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তাই নয়, যে-সব প্রচুর পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর তা-ও অপ্রকাশিতই ছিল। তাঁর মহীয়সী পত্নী ছিলেন আদর্শ ভারত-ললনা। তাই বিরাট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু লেখা অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে।

শেষ দিকে একদিন এক মহিলা চিকিৎসকের ত্রুটি-বশত অল্পেতেই কাল হল। ক্ষত নিরাময় না হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হল। আর্থিক দুর্গতির দরুন চিকিৎসা-ব্যাপারে কিছু ত্রুটি ঘটে গেল। বহুমূত্রও সময় বুঝে আরও জাঁকিয়ে বসল। একদিন তিনি তাঁর স্নেহময় পরিবার-পরিজন ছেড়ে এই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন। অন্তিম ক্ষণ হঠাৎ ঘনিয়ে এলেও তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ মুখের হাসিটি অম্লান ছিল। হয় তো তাঁর এই হাসিটি ছিল জ্ঞানগভীর অন্তরের উৎস।

ডঃ কেতকরের সাহিত্য-রচনা

ডঃ কেতকরের সাহিত্য-কর্মকে ছয়ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-- (1) উপন্যাস ও রম্য রচনা, (2) ঐতিহাসিক গবেষণা, (3) সমাজ-নীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ, (4) জ্ঞান-কোষ সম্পাদন ও সংকলন, (5) সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ, (6) সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা।

(1) উপন্যাস ও রম্য রচনা

তাঁর উপন্যাস সাতটি— 1. গোণ্ড-বনের প্রিয়ম্বদা (1927), 2. পরাঙ্গদা (1926), 3. আশাবাদী (1927), 4. গ্রাম্য শ্বশ্রূমাতা (1930), 5. ব্রাহ্মণ-কন্যা (1930), 6. বিচক্ষণা (1937), 7. ভবঘুরে (আওয়ারা) (অসম্পূর্ণ) (1937), 8. অঙ্গীরসের সত্র (অসম্পূর্ণ-মহাকাব্য) 9. মহারাষ্ট্রীয় কাব্যবিচার।

(2) ঐতিহাসিক গবেষণা

10. কায়স্থ প্রভুজাতির ইতিহাস, 11. প্রাচীন কাহিনী, 12. প্রাচীন মহারাষ্ট্র (আদি পর্ব) (1931), মহারাষ্ট্র এবং মৌর্যসত্তা (1931), সাতবাহন পর্ব (1935), (এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব এখনও অপ্রকাশিত)।

(3) **সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ**

13. হিস্ট্রি অব কাস্ট্‌স (1909), 14. অ্যান এসে অন হিন্দুইজম্ — ইট্‌স্ ফর্মেশন অ্যাণ্ড ফিউচার, হিস্ট্রি অব কাস্টস (পার্ট 2) (1911), 15. অ্যান এসে অন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্‌স্ (1914), 16 হিন্দু ল অ্যাণ্ড দি মেথড্‌স অ্যাণ্ড প্রিন্সিপলস্ (1914)।

(4) **জ্ঞান-কোষ-সম্পাদনা ও সংকলিত সাহিত্য**

মারাঠী জ্ঞান-কোষ 23 খণ্ড, সূচীখণ্ড (1929-37) ; মারাঠিতে করার পর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও বিয়োজনান্তে ডঃ কেতকর জ্ঞান-কোষ হিন্দী, তামিল, কন্নড় ও গুজরাতীতে প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হন। 1927 সালে গুজরাতী জ্ঞান-কোষের কাজ শুরু করেন। 1929-এ প্রথম খণ্ড ও 1935-এ তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। সর্বসমেত 20 খণ্ড (অনুবাদ কোষ) প্রকাশের পর আর্থিক কারণে বিভিন্ন ভাষায় পণ্ডিতদের সহ-যোগিতার অভাবে সেই কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। তামিল, কন্নড় আর হিন্দীতেও তিনি কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাও অসমাপ্ত রয়ে যায়।

(5) **সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ**

এত বেশী ও বিভিন্ন ধরনের লিখেছেন যে তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন।

(6) **সংবাদপত্র**

মহারাষ্ট্র বাক্-বিলাস (1906), বিদ্যা-সেবক (1924-28), পুণা সমাচার (জ্ঞানকোষের পরবর্তীকালে)।

ঔপন্যাসিক ডঃ কেতকর

অমহারাষ্ট্রীয় পাঠকবর্গের হাতে ব্রাহ্মণ-কন্যার অনুবাদ তুলে দেওয়ার সময়, ঔপন্যাসিক ডঃ কেতকরের পরিচয় প্রদান অত্যাবশ্যক। ব্যক্তি-

পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে ডঃ কেতকর রম্যরচনাকার ছিলেন না। কারণ, তিনি যা লিখেছেন, তার অধিকাংশ লেখাই সামাজিক, আর্থিক তথা রাজনীতিক বিশ্লেষণাত্মক ও গবেষণাপ্রধান রচনা। জ্ঞানকোষের মতো পরিশ্রমসাপেক্ষ কার্যসম্পাদনের পর হয়তো নিছক মনের আনন্দের জন্যই উপন্যাসের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। তাঁর এক বন্ধু, এবং তিনি নিজেও ছিলেন ঔপন্যাসিক, অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরে তাঁকে বলেছিলেন, "ইচ্ছা হয় তো আপনি নিবন্ধাদি লিখুন, কিন্তু উপন্যাস রচনার ঝক্‌মারিতে যাবেন না।" এ-কথায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ-ভাবেই আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এ কাজে এগিয়ে গেলেন।

তাঁর আগে নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে আরেকজন শ্রেষ্ঠ ঔপ-ন্যাসিক হরিনারায়ণ আপ্টে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ডঃ কেতকর তা জানতেন। এর পর বামনমলহার যোশীর উপন্যাসেও বেশ বড় রকমের দার্শনিক তত্ত্বের উল্লেখ মেলে। এ-বিষয়েও ডঃ কেতকর জ্ঞাত ছিলেন। চোখের সামনে এ-সব উদাহরণ থাকায় উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন কিছু দেবার তাগিদে তাঁর একটি অর্ধ-সমাপ্ত উপন্যাসে আবার হাত দেন।

নিজে সমাজতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হওয়ার ফলে নানা সামাজিক সংস্থার কার্যকলাপ, ব্যক্তিজীবনের ওপর তার প্রভাব বা লক্ষণীয় সব পরিবর্তন তিনি খুঁটিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠী-জীবনের সংঘাতের ফলে মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়, হৃদয়ে কী ধ্বনি-প্রতিধ্বনি জাগে, সমাজের নানা স্তরের নানা ঘটনা-সংঘাত দেখে শুনে, তিনি এক সমাজ-পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি দিয়ে তার সারাৎসার বাছাইয়ের প্রচেষ্টা করতেন। জীবনের এ-সব চিত্র ও ঘটনাপ্রবাহ তিনি তাঁর উপন্যাসে বিধৃত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের ভাষাও সহজ নয়। শব্দ-চয়নেও দ্যুতি নেই। রচনার ধরণও ছাড়া-ছাড়া। কিন্তু জীবন-

বোধে তা এত পরিপূর্ণ যে নায়ক তাঁর ভারতবর্ষ বা আমেরিকা যেখানেই থাকুক, সদাসর্বদাই প্রাণোচ্ছল ও জীবন্ত। মারাঠী পাঠক তাঁর উপন্যাস মারফৎই হৃদয়ংগম করে যে জীবন কেবল (সদাশিবপেঠীর) ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক আর বাবু সমাজেই আবদ্ধ নয়। তিনিই তাঁর রচনায় ব্যক্ত করেছেন কত দূরবিস্তৃত আর বৈচিত্র্যময় সেই জীবন! দ্বিতীয়ত, তিনিই বলছেন যে জীবনের নানা প্রশ্নের সমাধান এককভাবে সম্ভব নয়। সামাজিক তথা আর্থিকভাবেও এ-সব একটা অন্যটার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

এই সূক্ষ্মদৃষ্টির কারণে তিনি সহজেই লিখতে পেরেছিলেন : "আপ্পা সাহেব শান্তাকে বিয়ে করলেন। তখন আরামকেদারায়-বসা সমাজ-সংস্কারকারীর দল বলতে লাগল যে এই বিয়ের ফলে জাতিভেদ প্রশ্নের সমাধান হল। কিন্তু কার্যত প্রশ্নের সমাধান নয়, বরং বলা চলে এখন এর সূত্রপাত ঘটল।" তাঁর উপন্যাসে উপদেশ নয়, নির্ভীক স্পষ্ট ভাষণে ভরপুর ; এতে আছে সামাজিক সমস্যার বিস্তারিত বিচার ও আলোচনা। এ-সব প্রসঙ্গে আচার-আচরণ নীতি-নিয়ম আর কল্পনার নিঃসরণও মেলে। স্পষ্ট ভাষণের দরুনই গোড়ায় মারাঠী সমালোচকেরা তাঁর নিন্দা করেছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা স্বাগতই জানান।

গোড়ায় সমালোচকের দল তো তাঁর উপন্যাসে দোষই খুঁজে পেয়েছিলেন। রচনা ঢিলে ঢালা। বলার ঢঙ চাতুর্যহীন আর নিয়মভঙ্গের দোষে দুষ্টও বটে। হোঁচট খাওয়া ভাষা। ইত্যাকার সব কথা। কিন্তু তাঁরা বিষয়-বক্তব্যের গুরুত্ব আর মৌলিকতা অস্বীকার করতে পারেন নি। "ড. কেতকরের উপন্যাসের ত্রুটি যেমন বৃহদাকার, আবার তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এর উপযোগিতা। সমাজে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা, আচার-আচরণ ইত্যাদির এত মৌলিক বিচার-বিশ্লেষণ অন্য কোনও সৃষ্টিধর্মী লেখক কেউ করেন নি।" এ-কথা তাঁর যথার্থ অগ্রজ লেখক

হরিনারায়ণ আপ্টের। আর দার্শনিক-ঔপন্যাসিক বামন মলহার যোশী একটা লেখা লিখেছিলেন, তার শিরোনামা ছিল 'ঔপন্যাসিক কেতকর'। তাতে তিনি ঔপন্যাসিকের সব রচনার তাৎপর্য খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করেন। সে-লেখা থেকে দীর্ঘ উদাহরণ তিনি দিয়েছিলেন :

"তাঁর উপন্যাসে একটা আকর্ষণী শক্তি ও চিন্তার খোরাক রয়েছে। চলিত রীতি-নীতি নিয়ে সমাজকে ভাবিয়ে তোলা বা তার পুনর্বিন্যাসে রত করাটাও তাঁর কাছে একটা কর্তব্য ছিল। ভাবনা-চিন্তা করে একটা সংকল্প-গ্রহণ বা সদ্‌ভাবনায় লোককে শুধু ভাবিয়ে তুললে হয় না। পাঠকবৃন্দ এ-কথা বিলক্ষণ জানলেও নায়ক-নায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মারফতেই এর স্ফুরণ সম্ভব।

"প্রারম্ভিক পর্যায়ে ড কেতকরের অধিকাংশ উপন্যাস সদাশিবপেঠী তথা সংকীর্ণ-পরিধিতে সীমিত ছিল। তাঁর দ্বারা উপন্যাসের ভৌগোলিক বিস্তার সম্ভব হয়েছে। 2. মানুষের প্রকৃতি বা চরিত্রগঠনে পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক রীতি পদ্ধতির একটা প্রভাব পরিলক্ষিত নয়, সে-কথা তাঁর উপন্যাসেই তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। নারী-পুরুষের অবচেতন মনেও যে নানা চিন্তার ঢেউ ওঠে সে-বিষয়ে তাঁর আগে কোনও ঔপ-ন্যাসিক ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ড. কেতকর করেছিলেন। 3. নিছক মনোরঞ্জন নয়, চিন্তা উদ্রেকের জন্য তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। আমি তো বলব যে এর দ্বারা সদ্‌ভাবনার বিস্তার হয়েছে।

"শিক্ষিত সমাজ ইংরেজী সাহিত্য থেকে এমন কোনও নীতির সন্ধান পান নি যা থেকে বলা চলে যে এমন কোনও নীতি আছে যা সদা-সর্বদা প্রযোজ্য। সমাজের কথা ভাবতে গেলে, সামগ্রিকভাবেই সেটা চিন্তা করতে হয়। শান্ত-শিষ্ট কিছু হাবভাব বিচার করলেই যথেষ্ট হয় না। এসব কথা তাঁর উপন্যাসে যত সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাঁর আগে কোনও উপন্যাসে তা হয় নি।

বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত সমাজে তার ধর্মচিন্তা, রীতি নীতি আর আচার-আচরণেও আশা-আকাঙ্ক্ষাও এক মিশ্র চেহারার রূপ নেয়। সামাজিক সমস্যাও এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে বাধ্য। তার মঙ্গলের জন্য ভাণ্ডারকর, আগরকর প্রভৃতি পূর্ববর্তী হিতাকাঙ্ক্ষীদের শুভবুদ্ধি ও প্রযত্ন সত্ত্বেও বহু কিছু অর্ধসমাপ্ত ও শাস্ত্রবিগর্হিত রয়ে গিয়েছিল। উদাহরণসহ তিনি তা পূরণ করেছিলেন। প্রাচীন ব্যবস্থার এত রকমারী এবং সামগ্রিক বিচার এতখানি ব্যাপক আকারে খুব কম লোকই করতে পেরেছেন।

কলা-আলোচনার নামে বিচার-বিভ্রান্তি গোপন করার চেষ্টার চেয়ে বরং সে-আলোচনায় ক্ষান্ত দিয়ে জনসাধারণকে এ-তুনিয়ার অদেখা অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টাই শ্রেয়।”

এই একজন শ্রেষ্ঠ মারাঠা ঔপন্যাসিকের এ-ধরনের খোলাখুলি অভি-মতের দরুন ডঃ কেতকারের উপন্যাসের প্রকৃত মূল্যায়ণ হয়েছে। তাঁর গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ সব কথার উল্লেখের ফলেই অন্য সব সমালোচনার ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে ড. কেতকারের উপন্যাস মারাঠী সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। ‘ব্রাহ্মণ-কন্যা’ তাঁর পঞ্চম উপন্যাস। অবৈধসম্পর্ক-জাত ব্রাহ্মণ সন্তানের ভবিষ্যৎ-ভাবনা এ-উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। এখন 1970-এ আমাদের শহরগুলিতে তথা-কথিত উচ্চ এবং নিম্নবিত্ত সমাজে শিথিলবদ্ধ পাশ্চাত্য দেশবাসীদের মতোই নতুন এক আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের আভাস সত্ত্বেও স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক তথা অন্য বহু ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে অনেকেই আজও সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। সে-কারণে আজও চল্লিশ বছরের আগেকার লেখা এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু এখনও পুরনো হয়ে যায় নি। এখনও সভ্য সমাজে অবৈধসম্বন্ধ-জাত কন্যার বিবাহ কঠিন ব্যাপার। ড. কেতকারের সেই বিশ্লেষণ আজও আমার কাছে

যথার্থ মনে হয়। তবে আগে থেকে সে-সব না বল্লে, অ-মারাঠী পাঠক-বৃন্দ নিজেরা পড়ে সম্যক অনুধাবন করে সে-বিচারে প্রবৃত্ত হলেই সেটা ঠিক হবে।

ব্রাহ্মণ-কন্যার এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি পাঠকের হাতে তুলে দেবার আগে উল্লেখ করা প্রায়োজন যে সাহিত্যগুণে এটি ড. কেতকারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে পরিগণিত। আর বেশি কী বলব? "ভাগ্যায়ত্ত মতঃ পরং ন খলু তৎ বাচ্যং বন্ধু বন্ধুভিঃ" এই বলেই আমি অ-মারাঠী পাঠক-পাঠিকাদের হাতে এ-বইখানা তুলে দিতে চাই।

কৃষ্ণাবাঈ মোটে

1

স্ত্রী-শিক্ষা-সমর্থকদের আপ্পাসাহেব ডগ্‌গের সেই কালিন্দী-কাহিনীটা শুনে বড় খারাপ লেগেছিল। এই ব্যাপারটায় মা-বাবার এত কষ্ট হয়েছিল যে তাদের মনে হয়েছিল ওর মুখদর্শনেও আর প্রয়োজন নেই। শহরের কিছু লোকেরও আলোচনা করার মতো একটা মুখরোচক গল্পের খোরাক এতে মিলে গেল।

কালিন্দী কী এমন পাপকর্ম করেছিল তা বলা প্রয়োজন। বি. এ. ক্লাসে পড়ত কালিন্দী। মা-বাবার আশা ছিল যে বি. এ. পাস করার পর কালিন্দীর সুনাম সুযশ হবে। খবরের কাগজে তার নাম বেরুবে, মাসিক পত্র-পত্রিকায় ফটোও ছাপা হবে। কিন্তু সব প্রতীক্ষা তাদের বিফলে গেল।

কলেজ ছেড়ে দিল কালিন্দী। আর শুধু তাই নয়, সে নিজের মা-বাবাকে ত্যাগ করে শিবশরণপ্পা নামে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যবসায়ীর রক্ষিতা হিবাসে বাস করতে শুরু করল।

কন্যা কালিন্দীর গৃহত্যাগ আর মা-বাবার রাগের ব্যাপারটা সম্যক্ অবগত হতে হলে কালিন্দীর দিদিমার সময়কার কিছু ঘটনা-

বৃত্তান্ত অবহিত হওয়া দরকার।

মঞ্জুলা মাস্টারণী ছিলেন শান্তাবাঈ অর্থাৎ কালিন্দীর মায়ের মা। তাঁর সম্বন্ধে কিছু দুর্নাম এখনও অনেক লোকেরই জানা থাকার কথা। তাঁকে তাঁর ছেলেবেলায় বা যৌবনকালে দেখেছে, এমন কয়েকটি লোক হয়ত এখনও জীবিত। এসব লোকের মতে জন্ম তার যে কুলেই হোক-না কেন মহিলা নিঃসন্দেহে একজন সুন্দরী ছিলেন। তবে ব্রাহ্মণ যে ছিলেন না, সেটা সকলেরই জানা ছিল। আর এ-ও সবার জানা ছিল যে ব্রাহ্মণ না হলেও চেহারা-ছবি, ধরণ-ধারণ আর কথাবার্তা থেকে তিনি যে ব্রাহ্মণ নন সেটা কারুর বলার ক্ষমতা ছিল না। কেউ কেউ তাঁকে ব্রাহ্মণ-শাখা-সম্ভূত সন্তান গণ্য করত।

বছর চার-পাঁচ বয়সে ছোটবেলাতেই মঞ্জুলার বিয়ে হয়েছিল। পরে অবশ্য মামার বাড়িতেই তিনি থাকতেন। সেখান থেকেই পড়াশুনা শুরু হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত উনি পড়েছিলেন। ধরণ-ধারণটা তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিমছাম গোছের। শিক্ষালব্ধ আচার-আচরণের দরুন বিশেষ একটা মনোবাসনা তাঁর জেগেছিল যে সভ্য-শিক্ষিত বলেই যেন সবাই তাঁকে গণ্য করে। আর এই কারণেই তিনি ব্রাহ্মণ-ভাবটা বজায় রাখতে বিশেষ চেষ্টা করতেন। যখন তাঁর বয়স পনের কি ষোলো তখনই তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ শুরু করেন। স্বামী থাকতেন দূরে, জুন্নর কিংবা তলেগাঁওয়ের দিকে কোথাও। যখন উনি শিক্ষয়িত্রীর কাজে বহাল হলেন, তার স্বামী সম্পর্কে তাঁর লজ্জা হতে শুরু হল। এমনিতেই গেঁয়ো, তার ওপর আবার স্বামীটি ছিলেন ধোপা বা তেলী, এমন ধরণের কোনও একটা অশিক্ষিত কুলোদ্ভব। তাই তাঁর কাছে যেতেও ইনি লজ্জিত বোধ করতেন। শুধু তা-ই নয়, এ-লোকের স্পর্শেও দোষ বর্তাবে,

এমন একটা ধারণাও তাঁর মোনের কোণে উঁকি দিল। কিন্তু স্বামীটির এসব মেনে নিতে আপত্তি ছিল। সে-লোককেও তার স্বামীত্বের দাবি খাটাতে সচেষ্ট দেখা গেল। এ-অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মহিলা নিজেই উকিলের শরণাপন্ন হলেন আর উকীলও চট্‌পট্‌ সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

মঞ্জুলাদের সমাজে এক পতি ছেড়ে দ্বিতীয় একজনকে গ্রহণের রীতি চালু ছিল আর তার ব্যাপক প্রচলনও শুরু হয়েছিল। তদনুযায়ী উকীল পরামর্শ দিলেন যে আপনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও বছর তিন-চার যাবৎ মামার বাড়ীতে। সেখানে থাকার খাই-খরচ বাবদ 500 টাকা হিসাবে অত বছরের টাকা দাবী করেন। আর সপ্তাহ-কালের মধ্যে টাকাটা না পেলে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করবেন একথাও জানিয়ে দিন। মঞ্জুলা উকীল-মারফৎ তাঁর নোটিশ পাঠালেন। স্বামী টাকা দিতে অক্ষম হওয়ায় সে-নাম-পদবী লুপ্ত করে মঞ্জুলা সর্ব বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন।

তাঁর ইচ্ছা হত যে শিক্ষিত সমাজে তিনি মেলামেশা করেন। তখন তিনি নবযুবতী আর সুন্দরী বলে কিছু লোক বাড়ীতে ছেলেমেয়ের টিউশনের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করতে প্রস্তুতও ছিল। কয়েকবার তো দেখা গেল 'টিউশন'টা প্রেমের ছলা-কলার একটা উপলক্ষ মাত্র। অনেকের সঙ্গেই মঞ্জুলার এই প্রেম-নিবেদনের ব্যাপারটা ঘটেছে। তবে শেষ অবধি ড. চিন্তোপন্তের প্রেমটাই ধোপে টিঁকেছিল। যে-কটি বাচ্চা তাঁর জন্মেছিল সবই ড. চিন্তো-পন্তেরই ঔরসজাত।

মঞ্জুলার গর্ভজাত সন্তান কটির মধ্যে একটি কন্যাও ছিল। সে-ই কালিন্দীর মা শান্তাবাঈ। কিভাবে শান্তাকে পাত্রস্থ করা যায় তা নিয়ে মঞ্জুলার খুবই দুশ্চিন্তা ছিল। তবে একটা বুদ্ধির

কাজ করেছিলেন মঞ্জুলা। নিজের মেয়েকে যথাসম্ভব লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। একান্ত যদি বিয়ে নাও হয় এ মেয়ে তবুও নিজের পেটটা চালিয়ে নিতে পারবে, সেটা ভেবেই তিনি শান্তাবাঈকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। স্কুলে গিয়ে শান্তার অন্ন-সংস্থানের যোগ্যতা অর্জনটা সম্ভব হয় নি। তবে অন্যভাবে ফল হয়েছিল। বিয়ে হয়ে গেল শান্তার। সে বিয়েটা হল এক ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে। আপ্পা সাহেব ডগ্‌গে নামে একজন তরুণ আইনজীবী ছিলেন। খুবই অল্পবয়স্ক কোনও মেয়েকে বিয়ে করার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। একটু লেখাপড়া জানা মেয়েই তিনি চাইছিলেন। আর তিনি মনে করতেন যে জাতিভেদ একটি অনাবশ্যক প্রথা ও গৌণ ব্যাপার এবং এ ব্যবস্থার অবলুপ্তি প্রয়োজন। আর তাই এ-ছেলের সঙ্গে শান্তার বিয়ে হয়ে গেল।

2

আরামকেদারায় বসে সমাজসংস্কারের তত্ত্বালোচনায় যারা রত, তারা শান্তার বিয়ের পর বলতে লাগল—একটা সামাজিক প্রশ্নের সুরাহা হল। তবে প্রশ্নটার সুসমাধান হল না, বরং বলা চলে, প্রশ্নটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

পরে শান্তার যে কন্যা সন্তান হল তার নাম রাখা হল কালিন্দী। কালিন্দী যত বড় হতে লাগল ততই শান্তার দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। আরও ভাই-বোন ছিল কালিন্দীর।

যখন কালিন্দীর 17/18 বছর বয়স, তখন যেন সে লোকের দৃষ্টি

আরও বেশী আকর্ষণ করতে লাগল। ওর কিভাবে বিয়ে হবে এ-দুশ্চিন্তা তার মা-বাবার চেয়ে তার পাড়া-পড়শীরই যেন বেশী। বাপের কিন্তু খুব একটা দুশ্চিন্তা কখনই হয় নি। তাঁর মনে হত আমি যেমন এক রক্ষিতার মেয়েকে বিয়ে করেছি, তেমনই রূপ আর গুণে আকৃষ্ট হয়ে আমার মেয়েকে কোনও নব্যযুবক নিজেই এগিয়ে এসে বিয়ের প্রস্তাব জানাবে। বিবাহেচ্ছুক প্রেমাভিলাষী কোনও যুবকের কাছ থেকে পত্র আসবে, বাবা যেন তারই অপেক্ষায় ছিলেন। সে চিঠির ধরণ কি হবে তা-ও তিনি মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলেন। যুবক সে-পত্রে লিখবে যে মেয়ে আপনার দেবীর মতো আর এ-মেয়েকে কামনা করার মতো কোনও যোগ্যতাই আমার নেই। আর আমিও সেই পত্রের জবাবে সানন্দে সম্মতি জানাব ইত্যাদি। কল্পনার এই ছবিটা তাঁর মনে অনবরত ঘুরপাক খেত। তবে শেষ অবধি এ-ধরণের কোনও ঘটনা ঘটে নি। বস্তুত তাঁর মনোমত কোনও চিঠিই আসে নি। চিঠি একটা এল বটে তবে তাতে আনন্দের চেয়ে রাগই হল বেশী। কাবণ যে সমাজের ছেলের চিঠি আশা করা হচ্ছিল এ যুবক সে সমাজের নয়। শিক্ষিত আর চালাক চতুর হলেও, এ ছিল একটি বেশ্যার ছেলে। কালিন্দীর নামে লেখা ওর চিঠিটি দেখে আপ্পা সাহেব তো রেগে টং।

তিনি চিঠিখানা কালিন্দী ও তার মাকে দেখালেন। এ-ছেলে আমাদের নিজের সমান মনে করে, এই ঔদ্ধত্যের উল্লেখ করে শান্তাবাঈয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের বিয়ের উচ্চাদর্শের ব্যাখ্যা করলেন। শান্তাবাঈ এত সব কথার উত্তর দিলেন না, কারণ তাঁর পতি তাঁকে বিয়ে করে যে উদারতা দেখিয়েছিলেন, তা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। তবে মেয়ে কালিন্দী বলল, "ঔদার্য দেখিয়ে বিয়ে করেছিলেন, না, কীর্তির লোভে করেছিলেন, সে বিচার কে করবে?

আপনি ? আপনার উচ্চাদর্শের জোরেই কি আপনার সন্ততিবর্গের পদবী পরিচয় লুপ্ত করতে পারেন ? যে উদারতা আপনি দেখিয়েছেন তাতে নিজের চেয়ে সন্তানদের কি বেশী ক্ষতি হচ্ছে না ? আপনি তো এখনও ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমাদের কি ব্রাহ্মণ বলা চলে ?" সোজাসুজি প্রশ্নটা করে বসল কালিন্দী। তা শুনে হাসতে শুরু করল ছোট ভাই-বোনেরা। বাচ্চাদের হাসতে দেখে রাগ চড়ে গেল আপ্পা সাহেবের। তিনি বললেন, "তা হলে কি তুই ওকে বিয়ে করবি ?" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কালিন্দী, "আমি তো বিয়ের কথা এখনও ভাবি নি।" আপ্পা সাহেব সেই পত্রের উত্তরে তাই আপত্তি জানিয়ে লিখে দিলেন। বাড়ী বয়ে প্রস্তাব এল, কিন্তু তা অপছন্দের হওয়ার বুঝে-শুনেই বাবা তাতে বাগড়া দিলেন। বিস্তারিত কিছু বলেন নি, বুঝে নিয়েছেন আমার আপত্তি আছে, অথচ সেটা ওঁর নিছক অনুমান ; এসব ভাবনা কালিন্দীর মনে ক্রমে বেড়েই চলল। বাবার সঙ্গে মতান্তরের ব্যাপারটা তার মনে গেঁথে রইল। ফল দাঁড়াল যে বাবার সুবুদ্ধি আর সদ্‌ভাবনার ব্যাপারেও তার সন্দেহ জাগতে লাগল।

3

আপ্পা সাহেব ডগ্‌গে আর শান্তার জীবন কিছুকাল পর্যন্ত খুব আনন্দেই কেটেছিল। যে সৎসাহসের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা নিয়ে কিছুদিন পর্যন্ত একটা আত্মাভিমান ছিল তাঁর মনে। অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর এই মনোবলের প্রশংসা চলল। পরে বছর দেড়েকের মাথায় সেটা শেষ হয়ে গেল।

স্ব-কুল-জাতদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপ্পাসাহেব আশাবাদী ছিলেন। তাঁর মনে হত যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর বংশজরাও ব্রাহ্মণ পরিগণিত হবে। অসবর্ণ বিবাহ করলেও চাল-চলনে যাতে ব্রাহ্মণ-ধারা বজায় থাকে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি ছিল আপ্পা সাহেবের। তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাদের তাঁর শাশুড়ীর কাছে যাতয়াত মানা করার এ-ও ছিল অন্যতম কারণ।

নিজের সমাজের বাইরে বিয়ে করেছিলেন আপ্পা সাহেব। তবুও জাত্যাভিমান তাঁর কম ছিল না। আর নিজের পরিবারের ভবিষ্যৎ ভেবে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন। তবে শান্তাবাঈয়ের মনে কিন্তু সংশয় ছিল। ব্যাপারটা তাঁর জীবনে একটা বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট অন্যান্য ব্যাপারেও মতান্তর হচ্ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। আর কখনও কখনও "হে ভগবান, আমার শুভানুধ্যায়ীর হাত থেকে আমায় বাঁচাও" এরকম কথা বলার ঘটনাও তাঁর জীবনে ঘটেছিল। সময়ে সময়ে পত্র-পত্রিকাওয়ালারা সমাজ-হিতৈষীর দল যখন আপ্পা সাহেবের উদারতার প্রশংসা করত, তখন শান্তাবাঈয়ের মনে হত এরা সব আমার উপর চাবুক চালাচ্ছে।

শুধু স্বামী স্ত্রী দুজন যখন ছিল, তখন কেউ কোনও কিছু বললেও, কখনও শান্তাবাঈয়ের বিশেষ চিন্তার কারণ ঘটে নি। সন্তান হওয়ার পর তাঁর ধরণ-ধারণ সব বদলে গেল। যখন মেয়ে হল, তখন তাঁর মনে হল যেন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন প্রাণী জন্ম নিল। তাঁর নিজের কুল-শীলের কথা পুণার সব লোকই জানত। সেকারণে এ-শহর ছেড়ে যাবার চিন্তাটাও তাঁর মনের কোণে উঁকি মেরেছিল। তবে শেষ অবধি তা আর হয়ে ওঠে নি। যখন সত্যব্রত নামে তাঁর ছেলে হল, তখন আনন্দে অধীর হয়ে শান্তাবাঈ

বলেছিলেন, "এ ছেলে বড় হয়ে পুরুষ বলেই সমাজের নানা বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুঝতে পারবে।"

কখনও কখনও পুণা ছাড়ার চিন্তাটা মনে উদয় হলেও শেষ অবধি মনে হত যে যেখানেই এরা যাবে, এদের সঙ্গে সঙ্গে এদের কুল-বৃত্তান্তও ধাওয়া করবে। বিয়ের খবরটা সংবাদপত্রে ভাল রকমই প্রচারিত হয়েছে। আর ড. চিন্তোপন্তকে চেনে এমন লোকজন মহারাষ্ট্রে সর্বত্রই। এসব ভেবেই স্থান ত্যাগের চিন্তাটা শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হয়।

4

আপ্পাসাহেব আর শান্তার বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই ড. চিন্তোপন্ত মারা যান। আরো বারো বছর মঞ্জুলাবাঈ জীবিত ছিলেন।

মঞ্জুবাঈয়ের মৃত্যুর আগে অসুস্থতার সময়ে আপ্পাসাহেব শান্তাবাঈকে তাঁর কাছে যেতে দিয়েছিলেন। সে সময় শান্তাবাঈয়ের ভাইও এসেছিল। মঞ্জুলাবাঈ মারা গেলে তাঁর দানপত্র অনুযায়ী ড. চিন্তোপন্তের সূত্রে প্রাপ্ত গয়না ইত্যাদি বিক্রি করে যে নগদ টাকা পাওয়া গেল, তা শান্তাবাঈ ও তাঁর ভাই সমানভাগে ভাগ করেনিলেন। এতে আপ্পাসাহেবের খুব রাগ হল মঞ্জুলাবাঈয়ের ওপর। যৌবনে তাঁর খুব পয়সার ভাবনা ছিল। কিন্তু সন্তান হওয়ার পর মনে সে ধরণের চিন্তা আর রইল না। তা ছাড়া মায়ের সঞ্চিত টাকাপয়সা সম্পর্কেও একটা অতিরঞ্জিত কল্পনা ছিল তাঁর। ভাবতেন, হয়ত মায়ের কাছে অন্ততঃপক্ষে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকবে। শেষে দেখা গেল তা নয়। গয়না বিক্রি করে

তিন হাজার টাকা পাওয়া গেল। তা থেকে শান্তাবাঈ পেলেন মাত্র এক হাজার টাকা। গবত্যা গোমাজীর বাসা নামে মায়ের বসতবাটীটা তাঁর মৃত্যুর পরেও কিছু করা গেল না। ড. চিন্তোপন্ত গোড়ায় একবার বাড়ীটা তাঁর নামে লিখে দেবার কথা ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মঞ্জুলাবাঈয়ের মনে হল যে বেশী আগ্রহ দেখানোর ফলে সব বিগড়ে যেতে পারে। মঞ্জুলাবাঈয়ের উত্তর-যৌবনে ড. চিন্তোপন্তের সঙ্গে সম্পর্কও ক্ষীণ হয়ে এল। তাঁকে বা তাঁর সন্তানদের ভালবেসে যতদূর যা দেবার তিনি দেবেন'খন। তার এটাই মনে হল, অকারণ আগ্রহ প্রকাশ করা অর্থহীন। এর বেশী চিন্তা ড. চিন্তোপন্তের ছেলেই যদি করে তবে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে বা বকুনি দিয়ে জামাই-র অর্থই বা কেমন করে নেওয়া যায় —এ-সবই তাঁর মনে হল।

মঞ্জুলাবাঈ মেয়ের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন সেটা ছিল এ-ধরণের ঃ

গবত্যা গোমাজীর বাসা
শনিবার পেঠ

কল্যাণীয়াসু,

শান্তা, তুমি একথা জানো যে তোমার বিয়ের পর আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে একটা পরিবর্তন এসেছে। আর এই পরিবর্তন হেতু তুমি আমার কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকছ। তুমি একজন শিষ্ট সভ্যলোকের গৃহিণী আর আমি এক গৃহস্থের দাসী-বাঁদী। তোমার-আমার মধ্যে পার্থক্যটা এখানেই। তুমি আমার কাছে আসো না—এজন্য তোমায় আমি দোষ দেব না বা অকৃতজ্ঞও বলব না। কারণ আমি পুরোপুরি ভাবেই বিশ্বাস করি যে যা কিছু তুমি করছ তা তুমি তোমার নিজের ও বাচ্চাদের মঙ্গল চিন্তা করেই

করছ। মাতৃ-হৃদয় সতত মেয়ের প্রতি ধাবিত হচ্ছে আর মেয়ে যদিও মাকে চূড়ান্ত অপমান করছে, কিন্তু এ-সত্ত্বেও মা ভেবে নিয়েছে যে দুঃখের ব্যাপার হলেও এতেই মেয়ের মঙ্গল। এ-কারণে মা আর মেয়ের দোষ দেখছে না। আমার সঙ্গে যে ব্যবহার তুমি করেছ, সেটা নিজের ভাল ভেবেই তুমি করেছ—একথাই আমি তোমায় বলব। আমি কেবল এইটুকুই কামনা করব যে তুমি সুখি হও।

"...যা-ই হোক,আমারসন্তানেরভবিষ্যৎআমার কাছেঅন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। একজন প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত গৃহস্থের সঙ্গে তোমার বিয়ে হল, কিন্তু এটা খুব আনন্দের ব্যাপার নয়। একথাটাই আমার বার বার মনে হচ্ছে। চিন্তোপন্তের মতো এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে না হয়ে বিবাহটা যদি তোমার মতো কোনও পূর্ব-ইতিহাস-সম্বলিত এক যুবকের সঙ্গে হ'ত তবে সেটা তোমার দিক্ থেকে ভাল হত। আমার অন্ততঃ সেরকমই মনে হচ্ছে। সে ধরণের ব্যাপার হলে তুমি আমার কাছ থেকে এত দূরে সরে যেতে না আর তোমার স্বামীরও তোমায় আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার এমন একটা ইচ্ছা হত না। তবুও এসব আমি স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে বলছি না। উঁচু সমাজের ছেলের কাছে তোমায় বিয়ে দিয়ে আমি তোমায় আর তোমার সন্ততিবর্গকে একটা ভীতি আর সংশয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছি। বিনা বিবাহে যেসব মেয়েলোকের সন্তান হয়, তাদের ব্যাপারে বিবাহজাত সন্তানের মতো ব্যবহার অনুচিত— এটাই বুদ্ধিমানের কথা। তা না হলে পরে অনুতাপের কারণ ঘটে। সদ্‌বংশে বিবাহ-ব্যাপারে যে চেষ্টা দেখা যায় তাই আবার জাতি-পরিচয় বিলুপ্ত করে বর্ণ-সংকর জাতির উৎপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যারা এমন বিবাহে অগ্রসর হয় তারা উভয়পক্ষেরই মমোবেদনার কারণ ঘটাচ্ছে।

"তোমার স্বামীর কুলে তোমার বা তোমার সন্ততিবর্গের প্রবেশ

কখনই সম্ভব নয়। শুধু তা-ই নয়, কায়স্থ, স্বর্ণকার, প্রভু ইত্যাদি জাতির মধ্যেও স্থান মিলবে না।

"তোমায় যেমন একজন পুরুষ এসে আহ্বান জানিয়েছিল, তেমনি ঘটেছে কালিন্দীর বেলায়। কিন্তু তোমার স্বামী এতে রাগ করেছে আর তা সে উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন শুনে আমার খুব দুঃখ হয়েছে।

"আমার ধারণা তোমার পরিবারের যে ভবিষ্যৎ অবধারিত তার কথা ভেবে ও বুঝে তুমি যন্ত্রণা-কাতর হচ্ছ। আপন অহংকারে মত্ত হয়ে তা অস্বীকারে প্রবৃত্ত হচ্ছ। যতদিন এমন একটা আপত্তি করার ভাব বর্তমান থাকছে ততদিন পারিবারিক কোনও বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হওয়া সম্ভব নয়। যে সমাজে তুমি মেলামেশা করতে চাইছ তোমায় তারা কখনই আপন করে নেবে না। আর যে সমাজ তোমায় আপন বলে মানতে চায়, তাকে তুমি ছোট মনে করে এড়িয়ে যেতে চাইছ। কারণ হিসাবে বলতে চাইছ যে তোমাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রি করে হয়েছে।

"তবে তোমায় আমি এটুকু বলছি যে মেয়ের বিয়ের সময় তোমার নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত তুমি কখনই চেপে যেতে চেয়ো না। সে খবর চেপে গেলেও কিন্তু তোমার সন্ততিবর্গের ব্রাহ্মণ সমাজে ঠাঁই হবে না। বিদুর, অক্করমাস আর কড়ু মারাঠা—এই তিন শ্রেণীই উদার। এরা স্বীকৃতি দেবে তোমার সন্তানদের। সেই শ্রেণীভুক্ত হতেই বলো ওদের। তোমায় এটুকুই আমার বলার ছিল।

"আশীর্বাদ জেনো।

তোমার মা

মঞ্জুলা"

একথা বলা অনাবশ্যক যে কালিন্দীর সুপথ-ত্যাগের ব্যাপারে এ চিঠিখানির গুরুত্ব সমধিক।

5

শিবশরণপ্পার আপ্পাসাহেবদের সঙ্গে পরিচয়টা দুপুরুষের, কারণ তার বাবার আমল থেকেই এরা অন্যজনের মক্কেল। তাই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট যাওয়া-আসা।

আপ্পা সাহেবের চিন্তাধারাটা সাবেকী হিন্দু পিতার মতোই। তাই সমান বয়সী নবযুবকের সঙ্গে কালিন্দীর কথাবার্তা বলার ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হয় নি। তবে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় ছেলেটি কালিন্দীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইলে তাঁর তরফে আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। মুসলমানের সঙ্গে কথাবার্তা বলাতেও তাঁর কোনই আপত্তি ছিল না।

তরুণী কন্যা কার সঙ্গে কতটা আলাপ-পরিচয় করবে বা মিশবে সে বিষয়ে বিচিত্র সব নিয়মের দরুন শিবশরণপ্পা আর কালিন্দীর মেলামেশাটা অবাধে বেড়ে চলেছিল। শিবশরণপ্পা তার মোটরে কালিন্দী, ঊষা আর শান্তাবাঈকে বেড়াতে নিয়ে যেতে। কলেজ যাওয়াও সময়ে ওখানে থাকলেও, কখনও কখনও আপ্পাসাহেবের সম্মতি পেত শিবশরণ। পয়সাওয়ালা হলেও অশিক্ষিত এই শিবশরণকে মনে হত আপ্পাসাহেবের ভৃত্য। তাকে কোনও সময় কালিন্দী সমগোত্রীয় মনে করবে, এরকম চিন্তা তাঁর কল্পনাতেও স্থান পেত না। বাপ-মায়ের আশা ছিল যে লেখাপড়ার পর মেয়ের জন্য আই. সি. এস. জামাতা মিলবে। আপ্পাসাহেবও এরকমই আশা করতেন। ভালবেসে এক দরিদ্রকে পতিরূপে বরণ করে শেষে তাঁর

মেয়ে জীবন ধুলোয় লুটিয়ে দিক একথাটা ভাবতে তিনিও অন্য অনেক বাপের মতন ভয় পেতেন। এদিকে এসে তাঁর চিন্তাধারারও পরিবর্তন হচ্ছিল। জামাতা সম্পত্তিবান হোক কি ব্রাহ্মণ হোক, এবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিবিচার আর আগের মতো ছিল না। কালিন্দীকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করে যে ছেলে চিঠি লিখেছিল, যদি সে যুবক ইংলণ্ডে গিয়ে পড়াশুনা ক'রে এসে মোটা টাকার সরকারী চাকুরি শুরু করে, তবে তার সেই আগ্রহের জন্য আপ্পা সাহেবের এখন অত রাগ হত না। কারণ সমাজে এ ধরণের অসবর্ণ বিবাহ যত চালু হবে, সংমিশ্রণের ফলে ততই সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হবে। এ-ই ছিল এদের যুক্তি। যদি আই· সি· এস. বা ব্যারিস্টার না-ই বা মেলে তবে পাত্র অন্ততঃ ব্রাহ্মণ হতেই হবে। কারণ তাঁর যৌবনকালে যে আদর্শ তিনি আঁকড়ে ছিলেন, এর ফলে তা আরও পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। এটাই ছিল তাঁর অভিমত।

কালিন্দীর গৃহত্যাগের পর তার ও শিবশরণপ্পার প্রেমটা কিভাবে এগিয়েছিল আর ব্যাপারটা কি ভাবেই বা সবার নজর এড়িয়ে গেল এবং বুদ্ধির অগম্য রইল ইত্যাদি যাবতীয় কথা কালিন্দীর ভাই সত্যব্রত মনে মনে ভাবতে লাগল। তাদের বাড়ীতে বাপ মা আর ছেলেমেয়ের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব ছিল। আপ্পাসাহেব কখনও তাঁর ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা বলেন নি। স্ত্রী-শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর নিজের বেলায় তিনি শাস্তাবাঈয়ের শিক্ষাটাই বড় করে দেখেছিলেন, বংশের দিকে তাকান নি। তাঁর আশা ছিল তাঁর নিজের ধরণের কোন যুবকের সাক্ষাৎ আবার পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-ও ভাবতেন যে উচ্চশিক্ষার ফলে বিয়ের বাজারে তাঁর মেয়ের দামও বেড়ে যাবে। তাঁর জানা ছিল না ব্রাহ্মণ প্রভু (কায়স্থ)-দের

মতো প্রতি সুশিক্ষিত সমাজেই লেখাপড়া জানা মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে আর বিয়ের বাজারে তাদের দর নামতে আরম্ভ করেছে। বাবা তাঁর ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আলোচনা না করলেও সত্যব্রত আর কালিন্দী ভাইবোন হিসাবে পরস্পরের চিন্তা-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হতে যে শুরু করেছিল, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শিবশরণপ্পা আর কালিন্দী যে মনের দিক থেকে কাছাকাছি হতে পারল তাতে সত্যব্রত আশ্চর্য বোধ করছিল। তাঁর কল্পনায় কিন্তু হিসাবটা মিলছিল না। সত্যব্রতের মনে হতে লাগল তার ওপর কালিন্দীর আর আস্থা নেই। যখন সব ঘটনা ঘটছিল তখন সে চারমাসের টার্মের অজুহাতে দূরে বোম্বাইয়ে কলেজে সরে গেল। গরমের ছুটিতে সে বেরিয়ে পড়ল প্রবাস-যাপনের জন্য।

বোম্বাই চলে যাওয়ার আগে ভাইয়ের সম্পর্কে কালিন্দীর আস্থা হারানোর কারণ কিছু ঘটেছিল। পুণার জনৈক সারস্বত ব্রাহ্মণ এক বিধবাকে বিয়ে করেছিল। তাদের যে মেয়ে জন্মেছিল তার আবার বিয়ে হয়েছিল একজন মুসলমানের সঙ্গে। এব্যাপারে সত্যব্রত আর কালিন্দীর মধ্যে তীব্র বাক্-বিতণ্ডা হয়। সত্যব্রতের মতে এ-বিয়ের চেয়ে মেয়ে অবিবাহিত থাকলেও ভাল হত। কিন্তু কালিন্দীর মত ছিল ভিন্ন। মুসলমান মেয়ে যদি হিন্দুকে বিয়ে করে সেটা খারাপ নয়। কারণ তাহলে হিন্দু সমাজেরই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, সেকথাই সত্যব্রত বলেছিল। আর এ নিয়েই ভাইবোনের মধ্যে বাদানুবাদ। কালিন্দী সার যা বুঝেছিল তা হল যে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েরা অনেকখানি স্বাধীনতা নিয়ে থাকে। মতভেদটা ঘটেছিল সে-প্রশ্নেই। নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করাটা নিতান্তই প্রয়োজন আর ভাইয়ের মতামতের প্রশ্নটা এক্ষেত্রে নিছকই অর্থহীন। এমন করাটা

কালিন্দীর পক্ষে খুব আশ্চর্যেরও কিছু ছিল না।

গৃহত্যাগের একমাস পর থেকে কালিন্দী একটু একটু বাইরে বেরুতে শুরু করল। একদিন শিবশরণপ্পার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেল সে লক্ষ্মী সিনেমায়। অবস্থার যোগাযোগে তার ভাই সত্যব্রত বসেছিল ঠিক পেছনটায়। একজন আরেকজনকে দেখলেও কালিন্দী আর সত্যব্রত কথাবার্তা তখনও কিছু বলে নি। তবুও ভাইয়ের দৃষ্টি থেকে মনে হল সে যেন বলতে চায়, "আমি কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে আর তোমার সঙ্গে মতান্তরও আমার কিছু নেই।" শিবশরণপ্পাকে "একটু আসছি" বলে সে সত্যব্রতকে বাইরে আসার ইঙ্গিত করল।

বেরিয়ে এল সত্যব্রত। নিজে মোটরে উঠে আর সত্যব্রতকে ভেতরে আসতে বলে কালিন্দী তার ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল শঙ্কর শেঠ রোড ধরে গাড়ী চালানোর জন্য। ড্রাইভারের মনে একটু সন্দেহ উঁকি দিল। সে কখনও এর আগে সত্যব্রতকে দেখে নি। সে জিজ্ঞাসা করল, "শেঠজী এলেন না কেন?" গাড়ীতে তেল পর্যাপ্ত আছে কি-না সেটা দেখার ভাণ করে মাপকাঠি নিয়ে সে মাপামাপি শুরু করল। কিছুটা সময় সে এভাবে কাটিয়ে দিল। ইতিমধ্যে শিবশরণপ্পাও বাইরে এল। গাড়ীর কাছে এসে ড্রাইভারকে খোলা হাওয়ায় মেমসাহেবকে একটু ঘুরিয়ে আধা পৌনে ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বলল। কালিন্দীকে বলল আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসতে। কারণ নাটকের পরের অংশটুকু নাকি খুবই উপভোগ্য।

তখন গাড়ী চলতে শুরু করল। সবারগেট থেকে খড়কভাসলা যাওয়ার রাস্তায় পৌঁছে কালিন্দী "সত্যব্রতর জন্য সিগারেট নিয়ে এসো" এই ছুতোয় ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিল। আর এ-ও বলল

যে তার চা খেতে ইচ্ছা করলে তাও সে আরাম করে সেরে আসতে পারে। ড্রাইভার বুঝল সবই। সে চলে গেল।

কালিন্দী বা সত্যব্রত কেউই কিছুক্ষণ কথা বলল না। বলবেই বা কি? অথচ দুজনের মনেই তখন যাবতীয় বক্তব্য ঘুরপাক খাচ্ছে। শেষে কালিন্দীই নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করল, "মা-বাবা ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ, ভালই সব" জবাব দিল সত্যব্রত।

"বাড়ীতে সবাই বোধহয় আমায় খুব গালাগালী করছে, না?"

"না, বকাবকি করছে বোধহয় বলা চলে না। তবে তুমি বিচার-বুদ্ধিহীন যে ধরণের ব্যবহার করেছ, তাতে সবাই দুঃখিত।"

"যত দোষারোপই কর-না কেন, আমার বলার কিছু নেই। তবে তুমি তো জান, আমি বিচারবুদ্ধিহীন নই। রাতের পর রাত জেগে বিছানায় শুয়ে সব ভেবেছি। জেগে যে রয়েছি এটা বোধহয় তুমিও সময় সময় অনুমান করেছ। আর তুমিই কিনা আমায় বিচার-বুদ্ধিহীন বলছ? আমি নীতিভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারি তবে বিচারবোধ নিশ্চয়ই বিসর্জন দিই নি।"

"আমি বিচারবুদ্ধিহীন কথাটা ব্যবহার করেছি কারণ নীতিভ্রষ্ট শব্দটা উচ্চারণে বাধছিল। মনে মনে অবশ্য তা-ই বলতে চেয়েছি। তবে নিজের বোন সম্পর্কে কথাটা প্রয়োগ করা কঠিন মনে হচ্ছিল। তুমি দৈনন্দিন আচার-আচরণে বড় বেশী মাপা-জোকা ভাবে চলতে চাও। অন্যের ব্যবহার সহৃদয়তার সঙ্গে না দেখে আরও কত কঠোর বিচারে তুমি প্রবৃত্ত হও। এজন্য গোড়া থেকেই তোমার প্রতি আমার মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে। আর তাই আমার বোধ হচ্ছে যে একটা ভাবালুতা বা ক্ষ্যাপামির ফলেই হয়ত তুমি এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পড়েছ।"

"ভাই, তুমি কি আমায় পাগল মনে কর ?"

"আমি তোমায় নীতিহীন প্রবৃত্তির দাস বলব না। তোমার দ্বারা নীতিহীন ভাবে যতটুকু যা হয়েছে, তাকে পাগলামির চেয়ে বেশী কিছু বলাই উচিত। তবে তা বেশী স্পষ্ট করে বলা অনুচিত। তাই আমি তোমায় পাগলই মনে করছি।"

"তুমি কি আমায় তা হলে সাময়িক ভাবে পাগল মনে করছ ? উন্মত্ততার লক্ষণ ছাড়া আরও কিছু প্রকাশ পাচ্ছে কি ?"

"আমার চোখে তো তেমন কিছু পড়ছে না।"

"আমি তো বলব তুমি অন্ধ। আর কেবল তা-ই নয়, একেবারেই ভুলো মন তোমার। দুর্বলতা আর পাগলামিতে ছেয়ে গেছে তোমার মনটা।"

"সেটা কি রকম ?"

"তুমি কি তোমার সেই পুরানো বিচার-বুদ্ধি ভুলে যেতে বসেছ ?"

"কোনগুলো ?"

"মঞ্জুলা দিদিমার চিঠি পাওয়ার পর একবার আমাদের কথা-বার্তা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, সে সময় তোমার মত ছিল যে ব্রাহ্মণ-সমাজেই আমাদের স্থান করে নিতে হবে।"

"তা, সেসময় সে ধারণাই ছিল বটে, তবে এখন আর সেটা নেই।"

"কেন ?"

"ব্রাহ্মণ-সমাজ আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তবুও আমরা সে-সমাজে প্রবেশের জন্য আজন্ম সংগ্রাম করছি। তাই উদার-চিত্ত কোনও ব্রাহ্মণকে দেখে তার জীবন অতিষ্ঠ করার চেষ্টা করি।

নিজের ভালর জন্য অন্যের ক্ষতি করে, নৈতিক এক অধঃপতনকে মেনে নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভিড়বার কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাই না।"

"অর্থ নেই, তা ঠিকই।"

"তাহলে যে জাতকে অন্য সবাই তুচ্ছ বলে গণ্য করে, তাদের দিকেই আমাদের যাওয়া উচিত। আমার বিচারে তাই অসবর্ণ বিবাহের অর্থ অক্করমাস বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ, বিদুর কভু, মারাঠী ইত্যাদির মিশ্র হিসাবে একটি জাতির অন্তরভুক্ত হওয়া। জাতি বা বর্ণ বিভেদ যারা মানে না, তাদের শেষ পরিণতি গোড়াতেই স্থির হয়ে গেছে। এই ভবিষ্যৎটা প্রত্যেকেই বোঝে, তাই কেউ কুলের বাহিরে বিয়ে-থা করে না। যারা জাতিভেদ দূর হোক বলে, 'ভোলার' দল তাদের উদারমতাবলম্বী ও প্রগতিশীল বলে মনে করে। সে কারণে জাতিভেদ দূর হোক বলাটা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতি বর্ণ বিলোপে যারা সত্যিকারের উৎসাহী তাদের আর অসবর্ণ বিবাহ-সম্ভূত অক্করমাস— এদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। মঞ্জুলা দিদিমা যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"

"তা হলে জাতি-বর্ণ-উচ্ছেদকামী সংস্কারকদের ভবিষ্যৎ কি?"

"আমি এসব সংস্কারকদের অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। তবে এই জাতি-বর্ণ-উচ্ছেদকারী আর বর্ণসংস্কার সেবকদের রাস্তা আলাদা আলাদা বলে আমার মনে হয় না। আর তা হলেও, ভবিষ্যৎ উভয়ের একই।"

"তা হলে এটা আক্ষেপের কথা।"

"কেন?"

"এ ধরণের ভবিষ্যৎ আমার কাম্য নয়।"

তবে এ ভবিতব্যেরও অদল-বদল সম্ভব নয়। বেশ্যা ব্রাহ্মণ-বিধবার কন্যা ভিন্ন অন্য কোনও মেয়ে তোমার জুটবে এমন ভরসা করলে সেটা নিতান্ত মিথ্যা আশা পোষণ করা হবে।"

"নিজের বাড়ীতে কটু-তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে হয়ত বা রাগের বশেই তুমি এমন কথা বলছ। জাতিবর্ণ উচ্ছেদকামী লোক কি তাহলে এ পৃথিবীতে একেবারেই নেই?"

"জাতিভেদ দূর হোক এরকম সদিচ্ছা বা তত্ত্ব উচ্চারণ করার মতো লোকের অস্তিত্ব রয়েছে বৈকি। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তা চাইবার মতো কেউ-ই নেই। নীতিগত সমর্থকের দল আজকের অসবর্ণ বিবাহের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে খাঁটি কথা বলতে অপারগ। জাতিভেদ লোপের কথা যারা বলছে, তাদের এটুকু জিজ্ঞাসা করো, একাজটা যারা করছে তাদের ভবিষ্যৎ কি, আর সেই কুলে প্রবেশের ইচ্ছা তাদের রয়েছে কি না।"

"ভেদবিলুপ্তিকামীদের কাছে ভবিষ্যৎ প্রশ্নটা স্পষ্ট হয়ে গেলে আন্দোলনটা ঠাণ্ডা মেরে যাবে না?"

এই আন্দোলন ঠাণ্ডা মেরে যাওয়ার আগে জোরেই বা চলছে কোথায়? উচ্চজাতির সব স্ত্রী-পুরুষই বেশ ভাল জানে যে মিশ্র-বিবাহোদ্ভূত সন্তানের ভবিষ্যৎটা কি। সংস্কারকদলও তা জানে, তবে বলে না। কিংবা সত্যি কথাটা বোঝার হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। তাদের জাতিভেদ বিলুপ্তির চেষ্টাটা নিতান্তই পাগল ছেলে-ছোকরাদের ধরে তাদের জীবনটা বরবাদ করার অপচেষ্টা।

'ভেদ দূর কর', বলিয়েদের সমাজ-সংস্কারবাদী খল নেতাদের ঘোষণার ফলে পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে এক-আধজন ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ত বা ছলনায় ভুলেছে। কিন্তু এখন আর ছলনা চলবে না।

"তাহলে তোমার অভিমত হল নিজেদের মধ্যেই যে বর্ণসঙ্কর

রয়েছে জাতিবর্ণ-সংস্কারাগ্রাহীদের গোড়ায় সেটা ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে। আর একথাটা বেশ উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞাপিত হওয়া প্রয়োজন।"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মত। এ সত্য মাথায় একবার প্রবেশ করলে খাঁটি জাতিভেদ সংস্কারাকাঙ্খীর মনের মিথ্যা মোহটা দূর হয়ে যাবে। যারা বলে জাতিভেদ দূর কর তাদের একবার জিজ্ঞাসা করে জবাব চাও বর্ণ-সঙ্করকে জাতে উঠতে দিতে তারা প্রস্তুত কি-না। আমার মনে হয় সরাসরি জবাব তারা দেবে না। একদিকে বলবে জাতিভেদ বিলুপ্ত হওয়া দরকার, অন্যদিকে সে-বেড়া যারা ভেঙেছে তাদের মন্দ বলবে। এই বদমাইসীটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই সংস্কারকদের গোড়ায় বর্ণসংঙ্করদের মেনে নিতে হবে আর তা-ই নয়, সহায়তাও নিতে হবে তাদের কাছ থেকে।"

"বর্ণসঙ্করকে সমাজে স্থান দিতে হবে এ-ই যদি তোমার বক্তব্য হয় তবে আমিও বলব যে কথাটা ঠিক। তোমায় এক বর্ণসঙ্কর কামনা করেছিল আর বাবা সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। এটা তার অন্যায় ও ভুল হয়েছে এও মানছি আমি। কিন্তু বিবাহ না করে একজনের সঙ্গে তুমি আছ বা থাকবে একথাটা আমি কখনই ভাল বলব না। তোমার উচিত ছিল কোনও অবিবাহিত বর্ণসঙ্করকে বিয়ে করা। তুমি সুশিক্ষিত। কিন্তু লোকে বলছে যে স্ত্রী-শিক্ষার খারাপটা তোমার মধ্যে বর্তেছে।"

"যারা বলছে আমার দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা কলঙ্কিত হয়েছে, তাদের কথায় আমি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিই না। এদের এরকম বলার অর্থ হল লেখাপড়া শিখে বয়স্থা মেয়েরা আমারই মতো কারুর সঙ্গে বেরিয়ে যাবে বা যেতে পারে। লোকেদের এরকমই ধারণা।

আর তার ফলে বিয়ের বাজারে লেখাপড়া জানা মেয়েদের দাম কমে যাবে। এই ভয়েও লোকেরা এসব বলে। শিক্ষার গুরুত্ব দেবার জন্য বলে না। এরা শিক্ষা ব্যাপারে যথার্থ গুরুত্ব যদি আরোপ করত, তবে আমার দুসিঁড়ি আগেকার বংশগত স্বেচ্ছায় লিপ্ত না হয়ে আমায় ঘরের বউ করে নিত। যে-সব লোক আমার কথা চিন্তা করছে না, আমি কেন তাদের মেয়েদের ব্যাপারে চিন্তিত বোধ করব ?"

"দিদি, সারা দুনিয়ার প্রতি তোমার মন এতটা তিক্ত হয়ে উঠেছে কেন ?"

"এক সময় সমগ্র বিশ্বসংসারের প্রতি বিদ্বেষে আমার মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আজ আর মনে বিন্দুমাত্রও তিক্ততা নেই। বরং এ-দুনিয়া আর ভবিষ্যতের দিকে সানন্দে আমি তাকিয়ে আছি।"

"তোমার আনন্দিত বোধ করার কারণ কি ?"

"কৃত্রিম একটা বন্ধন কাটাতে পারলে যে রকম আনন্দ হয়, আমার তা-ই হচ্ছে। যারা নিজেদের ভব্য-সভ্য মনে করে তাদের সঙ্গে মেশার ইচ্ছাটা আজ একেবারে নেই। এতেই আমার মনে আজ অপার আনন্দ।"

"তাহলে কি বৈধ বিবাহের কোনও গুরুত্ব দিতে তুমি রাজি নও ?"

"আমি কি গুরুত্ব দেব ?"

"কেন দিতে ইচ্ছা হয় না ? আইনসিদ্ধ বিবাহের কোনও আবশ্যকতা তুমি বোধ কর ?" সত্যব্রত আবেগ ভরে জানতে চাইল।

জবাবে কেবল একটু হাসল কালিন্দী।

সত্যব্রত আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে সিগারেট নিয়ে ড্রাইভার ফিরে এল। তাই কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল আর গাড়ী থিয়েটারের দিকে ফিরে চলল।

6

খড়কভাসলার রাস্তায় সত্যব্রত আর কালিন্দীর সেই কথাবার্তার পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সন্তান হয়েছে কালিন্দীর। গিয়ে নাতি দেখে আসার জন্য কালিন্দীর মায়ের মনে সাধ জাগল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা না করেই তিনি গিয়েছিলেন দেখতে। মেয়ে যা কিছু করছিল সব কিছুই শান্তাবাঈয়ের খুব খারাপ লেগেছিল। আর তা এতই খারাপ যে বলাও যায় না। তবে মায়ের প্রাণ তাই মেয়ের জন্য সহানুভূতিটুকুও ছিল। বিবাহিত স্ত্রী না হলেও কত যত্ন-আদরে কালিন্দীকে রাখা হয়েছে তিনি দেখলেন। তাঁর বিচারে লোকটি উদারই মনে হল। রক্ষিতাকে মানুষ কত যত্নে রাখে। বিয়েটা করে নিলে তো পার্থক্যের ছিটেফোঁটাটুকুও বোঝা যেত না। তবে অধিকারিণী স্ত্রী ত আবার নানাভাবে বাঁধাও বটে। স্ত্রীর মতো রক্ষিতা কোনও বাঁধাবাঁধি নেই। মায়ের মনে হল, "বিবাহিত স্ত্রী অপেক্ষা বিবাহ না করে আপন ইচ্ছায় যে মেয়ে রয়েছে, তার স্থিতি অধিক।" "নীতি আর সত্য আচরণের চিন্তায় স্ত্রীদের অকারণ চিন্তিত হতে হয় আর মিথ্যা আচরণের কথা ভেবে দুঃখে দিন কাটাতে হয়।" মেয়ের সামনেও কথাগুলি তিনি এভাবেই বললেন। যদিও মেয়ে যা করেছে, নৈতিকভাবে সব সন্তোষজনক মনে হয়নি ; কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এগুলো খুব খারাপ কাজ নয়। এ ধরণের চিন্তা তাঁর মনে এল। প্রসব ব্যাপারে সহায়ক হিসাবে মেয়ের জন্য একজন য়ুরোপীয় নার্স নিযুক্ত করা হয়েছিল। বাইরে যাওয়ার জন্য গাড়ী ছিল। রকমারি কাট আর ডিজাইনের ব্লাউজ আর এক আলমারী বোঝাই জুতো ছিল। সবই

তো দেখা যাচ্ছিল। যে আরামে মেয়ে রয়েছে সে সব দেখার পর মায়ের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বললে বোধ হয় মিথ্যা বলা হবে না।

মার কথা শুনে একটু হাসল কালিন্দী। সে সময় নিজের মনের ভেতরকার ভাবটা মাকে সে বুঝতে দিল না। বরং খুব আনন্দে আছে এরকম ভাব সে দেখাল। তবুও মনটা তার স্থির ছিল না। যা-কিছু করেছি, অনুচিত কর্ম করেছি, এ মনোভাবটা সন্তানজন্মের পর থেকেই কালিন্দীর মধ্যে বেড়ে চলেছিল। বিয়ে না করে মেয়েরা যদি প্রিয়তমের সঙ্গেও থাকে, তবে সেটা উচিত কি-না, সে সম্পর্কে তার মনের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হতে আরম্ভ হয়েছিল।

বিগত বছরে যে কালিন্দী আর শিবশরণাপ্পার মধ্যে মতান্তর হয় নি, তা নয়; কিছু কিছু ব্যাপারে মতভেদ শুরু হচ্ছে মনে হল দুজনের।

শিবশরণের মনে হল তার সুশিক্ষিতা উপপত্নী অনেকখানি নাগালের বাইরে। তার বোধ হল কালিন্দী বড় বেশী দামী খেলনা। আরও মনে হল কালিন্দীই এ ধরণের নীতিবিহীন পথে আমায় এনে ফেলেছে। সে ভাবল এখন আমায় মিতব্যয়ী হতে হবে। ব্যবসায়ে এবারে লাভ তেমন হয় নি। তার মনে হল কথাটা বিবাহিতা স্ত্রী যেমন বুঝবে, কালিন্দীকে তেমনভাবে বলা বা বোঝানো সম্ভব নয়। এসব কারণে তার চোখে কালিন্দীর দামটা পড়ে গেল।

পক্ষান্তরে কালিন্দীর মনে হল শিবশরণ আমায় ঠিক মতো বিশ্বাস করে না। ভোগের জন্য অবশ্য আমায় স্ত্রী বলে মনে করে। কিন্তু মন খুলে যার সঙ্গে কথা বলা যায় এ সে নয়। এই কারণে

পতি-পত্নীর যথার্থ বন্ধুত্বটুকু তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারল না।

সব মিলিয়ে শিবশরণ ও কালিন্দীর মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরিবর্তনের যে ভাবটা এল, সন্তান জন্মের পর যেন সেটা আরও তীব্র আকারে অনুভূত হতে শুরু হল। কিন্তু এর সূত্রপাতটা কালিন্দীর গৃহ-ত্যাগের দু'তিন মাসের মধ্যেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সে সময় কালিন্দীর জন্য মাস-খরচা ছিল আড়াই শ' টাকা। বাচ্চার কোনও খরচ তখন না থাকায় বাড়তি অঙ্কটা শিবশরণের মনে খোঁচা দিতে লাগল। এবছর এরকম চলে তো তিন হাজার টাকা হাওয়া হয়ে যাবে। প্রসবের দরুনও চারশ' টাকা খরচ হল। ব্যবসায়ী শিবশরণের মনে কথাগুলো বার বার এসে উদয় হতে থাকল। সাড়ে তিন হাজার তো গেল। আর সে টাকার সুদের অংশটুকুও চিরকালের জন্য বরবাদ হয়ে গেল। মনে তার অহরহ এসব হিসাব আর প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। কালিন্দীর মনেরও পরিবর্তন হল তবে তার কারণ ভিন্ন। কালিন্দীর ধারণা হল কেবল ব্যবসায়ীই নয়, শিবশরণ রাজনীতিবিদ্‌দের মতোই বাক্যবাগীশ একজন সাধারণ লোক মাত্র। একত্র থাকার ফলে, কালিন্দীর নিজের শিক্ষাগত সব গুণ প্রতীয়মান হতে লাগল আর শিবশরণের যে লেখাপড়ার বালাই বিশেষ নেই তাও স্পষ্ট প্রতিভাত হল। শিবশরণের প্রতি তার স্নেহ-ভালবাসা ক্রমে যত কমতে লাগল ঠিক তদনুপাতেই সে বুঝতে শুরু করল যে নিতান্ত পয়সার কারণেই এখনও সে কামড় খেয়ে পড়ে আছে। নিজে যে রক্ষিতা, এই বোধটা বড় দুঃখদায়ক মনে হল তার কাছে।

তার মনে হল বিবাহ প্রথার প্রধান উপযোগিতা এই যে এর ফলে পুরুষ স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারে না। এটা কম কথা নয়। কেবল সৌন্দর্যের আকর্ষণটুকু অটুট রেখে নিজের

স্থান বজায় রাখাটা খুব কাজের কথা নয়। আইন, অধিকার তথা ধর্ম বা লৌকিক বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োজন। এসব কথা ঘুরে ফিরে মনে হত কালিন্দীর।

একটা বেশ্যার যে ধরণের সাজসজ্জার প্রয়োজন, আমারও তাই করতে হয়। আমার ভাল না লাগলেও, পাছে শিবশরণ হাতছাড়া হয়ে যায় আমার কাছ থেকে, তাই শারীরিক ক্লেশ চেপে রেখে আমায় সহাস্যবদন হতে হয়। না না, কুলবধূরও কি এমন করতে হয় ; বোধ হয় নয়।

বাইরে যদি যাই আর আমায় রক্ষিতা হিসাবে যদি কেউ আমন্ত্রণ জানায় তো আমার অপমান হয়— এমন কথা কেউ বলবে না। যদি সে নিয়ে আমি নালিশও জানাই, তাতে কেউ কর্ণপাত করবে না। কারণ লোকে একথাই বলবে একে ঘরে ঠাঁই দেয় নি, তাই অন্যের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে এ নিজের আত্মপ্রচার চাইছে।

ভবিষ্যৎ ভেবে মন যখন নিরাশায় ভরে উঠত তখন সে তা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করত। যে বিবাহ-ব্যবস্থার ফলে বর্ণসঙ্কর আর বৈধ সন্তানের একটা মিথ্যা বিভেদ আর আড়াল সৃষ্টি হয় আর সে-ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়াই যদি আমার কর্তব্য হয়, তাহলে বিবাহোত্তর জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কটাকে সফল করে দেখানোটা আরও বেশী বড় কর্তব্য। এই বলেই সে মনকে সান্ত্বনা দিত। কিন্তু মনের যোগ হিসাবে সম্পর্কটাই যে ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক, সেখানে সেই সম্পর্ক টিঁকবে কি করে? তাই সেটা টেঁকে নি। আইন-অসিদ্ধ এই বন্ধনটা কেটে গেল আর কালিন্দীর জীবনও অন্যপথে মোড় নিল।

শিবশরণাপ্পার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ভবানীপেটে তাকে কেউকেটা মনে করা হত। কিন্তু তার অনিষ্ট চিন্তা করার

লোকও ছিল। লোকজনের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে গেল। সে মাত্রাহীনভাবে পয়সা খরচ করে এমন একটা ধারণার ফলে তার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা হাত গুটিয়ে নিল। সে কেবল রক্ষিতাই রাখে না, তার হাতে নানা খাদ্য-অখাদ্য খাওয়া-দাওয়া করে— এরকম বদনামও হল। সমাজ দৃষ্টিতে যে-কোনও মেয়েছেলেকে রক্ষিতা করা যায়। মুসলমান রক্ষিতাও রাখা চলে। কিন্তু তার হাতে খাওয়া চলে না। এটাই ছিল জাতি-পাঁতির মত।

তার আচার-ব্যবহার সম্পর্কে বিচারের জন্য আলোচনাকারীদের তরফে পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা হল আর তাকে ডেকে পাঠানো হল। কিন্তু শিবশরণপ্পার সেটা ভাল লাগে নি এবং পঞ্চায়েতের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সে প্রস্তুতও হল না। পঞ্চায়েৎ কিন্তু বসল আর তার অনুপস্থিতিতেই তার বিপক্ষে রায় দিল। এর পর অনেক ব্যবসায়ীই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ভীত হল। এসব কারণে তার আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হল। তার ফল কালিন্দীর জীবনে ফলতে শুরু করল। সে যে বাংলোয় থাকল কিছু দিন বাদে সেটা ভাড়া দিয়ে শুক্রবারপেটে একটা ঘর নিয়ে তাকে রাখা হল। তার আগে শিবশরণাপ্পা কালিন্দীকে গয়নাগাঁটি যা দিয়েছিল তা সে অনেক কড়া কথা বলে ফেরৎ নিয়ে নিয়েছিল। সব গয়না গেল, মোটর নেই, বাংলো গেল আর শুক্রবারপেটের এক গরীব বস্তির ঘরে আমায় থকেতে হচ্ছে— এসব কথা কালিন্দীর মনে বার বার উঁকি দিতে লাগল। সে ভাবল বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনকারী অন্য আর-একটা মেয়ে আর আমার মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। আরও আফশোষের কথা কালিন্দীকে মাসিক দেয় যে ২৫০ টাকা খরচ বাবদ স্থির ছিল, তাও দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে মেলামেশার ব্যাপারেও শিবশরণ পেছপা হতে লাগল। মাসে সে

চার-পাঁচ বার যেত। যদি কালিন্দী নিজে থেকেই বলে যে আমায় ছেড়ে দাও আর সেই অজুহাতে ছেড়ে দিতে পারলে বেশ ভাল হয়। এরকম ভেবে শিবশরণ বেশ কিছু সময় বাদ দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলত। কখনও কখনও ভরসা দিয়ে বলত, যদি এখন থিয়েটারের দলে যাও তবে ভাল মাইনে-কড়ি মিলতে পারে। কখনও বা বলত "দেখ না গিয়ে, সিনেমায় লেখাপড়া জানা অভিনেত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। এসবের পর কালিন্দী খুব আর্থিক দুর্গতিতে পড়ল আর ভাবল যে শিবশরণাপ্পার কাছে যে দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি সেটা শিবশরণ স্পষ্টই অনুভব করছে। তবুও তার মনে হয় অবস্থা যা-ই দাঁড়াক না কেন, শিবশরণকে ছাড়ব না বরং তার মনটা ফেরানোর চেষ্টা করব। আমি তো লেখাপড়া জানা মেয়ে। আমার প্রেমিক টাকাপয়সার টানাটানিতে পড়েছে। নিছক সে-কারণে আমার তাকে ত্যাগ করাটা নারীত্বের উপযুক্ত কর্ম নয়। বিবাহ ছাড়া নিছক প্রেমও নিরপেক্ষ নয় ইত্যাদি পুরাতন চিন্তাও তার মন থেকে বিলুপ্ত হল না। তা ছাড়া শিবশরণের অবস্থার উন্নতির জন্য সহায়তাও প্রয়োজন। একারণে ঝঞ্ঝাট বাঞ্ছনীয় নয়। এসব চিন্তাও আসতে লাগল তার মনে। নিজেই সে স্থির করল শিবশরণকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু শিবশরণ এই মনোভাবটা যথার্থ বুঝতে পারে নি। দারিদ্র্য বরণ করে আনন্দে থাকার যে লক্ষণ কালিন্দীর মধ্যে সে দেখল সেটা যে একটা সদ্‌গুণ তা শিবশরণের কিন্তু মনে হল না। বরং তার মনে হল কষ্টের চাপে এমনটি হওয়ার কারণ এই যে আমি তাকে যেমন রাখব তেমনই সে থাকবে। এটাই সে চুপচাপ সহ্য করে নিয়েছে। কালক্রমে সে কালিন্দীর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিল। তারপর তার দোকানে গিয়ে দেখা করতেও কালিন্দীর দ্বিধা হত। যেই তাকে দোকানের

দিকে আসতে দেখত, ভিতরের দিকে চলে যেত শিবশরণ। মুন্সী জানিয়ে দিত যে শিবশরণ দোকানে নেই। এ-ই শুধু নয়, তার আর শিবশরণাপ্পার মধ্যে দূরত্বের খবরটা যখন অন্য সবাই জানল তখন কালিন্দীর খোঁজখবর আর তার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ গেল। এ খবর শিবশরণের কানে গেল। এর সুবিধা নিয়ে সে কালিন্দীকে বলতে শুরু করল "তুই বেইমানী করেছিস"। এখন কালিন্দীর মনে হতে লাগল, যার জন্য সব ত্যাগ করেছি, আইনসিদ্ধ বিবাহের প্রয়োজন বোধ করি নি, যার অবস্থা ফেরানোর কথা ভেবে চলেছি, সেই লোক আমার একেবারেই যোগ্য নয়। যা-কিছুই ঘটুক এ-লোককে ছেড়ে যেতে হবে। নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই গড়ে নিতে হবে। মনে মনে সে এই রকমই সংকল্প করল। কিন্তু হঠাৎ করে শিবশরণের আশ্রয় ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না।

তার প্রতি স্নেহের টান কার বেশী একথা ভাবতে গিয়ে মা-বাবার চেয়ে ভাই-ই বেশী মনে হল। আবার মনে হল যে আত্মহত্যা ছাড়া আর কি ভবিষ্যৎ আমার? ভাই কী করতে পারে আমার জন্য? আর সত্যি যদি আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু না-ই থাকে, তবে সাহায্য চেয়ে ভাইকে অনর্থক গোলমালে ফেলি কেন? শেষে স্থির করল যে ভাইয়ের সহায়তাও নেব না আর ভাইকে লেখা চিঠিও ছিঁড়ে ফেলল। কেবল একটা পোস্টকার্ড ছাড়ল যে, 'তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হচ্ছে আমার।'

সত্যব্রতকে লেখা কার্ডখানা বাড়ীতেই পড়ে রইল। সে ঠিকানায় সত্যব্রত ছিল না। আর তাকে এই কার্ড পাঠানোর অর্থই বা কি, ভাবলেন আপ্পা সাহেব। তাই সে কার্ড সেখানেই পড়ে রইল। কার্ডখানা থেকে পরিবারের সবাই জানল কালিন্দী শুক্রবারপেটে

এসে গেছে। সেই মহল্লার একটা ঘরের ঠিকানা দেখে সান্তাবাঈ আর আপ্পা সাহেব বুঝলেন যে আরও দুর্গতিতে পড়েছে কালিন্দী।

আপ্পাসাহেব তাঁর স্ত্রীকে বললেন এই বোকা মেয়েটা এবারে খুবই অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে।

এ দুনিয়ার কাব্য-রূপটা কালিন্দীর জানা ছিল। তবে শুক্রবারপেঠে আসার পর সংসারের সত্যিকারের চেহারাটা সে জানল। মা-বাবার আস্থা সে হারিয়েছিল। তাঁদের ভালবাসার চেহারা তার জানা ছিল। যে মেয়ের জন্য এ সংসারে বাপকে বদনাম কুড়াতে হয় সে মেয়ের আর প্রয়োজন থাকে না। মেয়ে বিগড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও মা-বাপের ভাবনাটা সীমাবদ্ধ ছিল। শুক্রবারপেঠের বস্তিতে যাওয়ার ভরসা তাদের হল না। ভাই হয়ত দেখা করতে আসত কিন্তু সেই বা এল না কেন, ভাবতে বসল কালিন্দী। সে মনে করল 'সময় পায় নি, এই বোধ হয় না আসার যথেষ্ট কারণ নয়। তবুও কালিন্দীর এই বিপদের দিনে তার কাছে কউ এল না, এ-সত্যই প্রকট হল।

ছেড়ে যদি যেতেই হয়, তবে আর শিবশরণাপ্পার পয়সায় দিনযাপন করি কেন? আমি কেবল তার আশ্রয়েই আছি। আর যে পয়সা সে আমায় দিচ্ছে, সেটা কষ্ট করে দেওয়া। এমতাবস্থায় বেশী দিন থাকা চলে না। নীতিবহির্গত জীবনধারায়ও তার সঙ্গে নৈতিক একটা তারতম্য সৃষ্টি হচ্ছে, বেড়ে চলেছে। কারণ, নীতি-বহির্ভূত তার জীবনে নীতিহীনতার পরিবর্তে নীতিচিন্তার প্রতি বিদ্রোহেরই প্রকাশ ছিল। আর সে কারণেই সে মনের দিক দিয়ে একেবারে ভেঙে পড়ে নি। নীতিবিধি-বর্জনকারী কোনও মেয়ের মতো তার দিকে আঙুল দেখালে সে চলে যেতে পারত। কিন্তু পয়সা দিয়ে রাখা মেয়ের মতো পদ সে চায় নি। কালিন্দীকে

শুক্রবার (পেঠে) আর দেখা গেল না। রাস্তার পেঠে এস্থার কিল্লেকর নামে এক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সে থাকতে শুরু করল। সেখানে সে সুখের সন্ধান পেল। কারণ, কালিন্দীর কেচ্ছা কাহিনী সারা পুণা সহরেই রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। তবে সেকথা রাস্তার পেঠের ইহুদীদের মধ্যে প্রচারিত হয় নি।

7

সত্যব্রত আর কখনও দেখা করতে এল না কেন কথাটা ভেবে খুবই আশ্চর্য হয়েছিল কালিন্দী। এধরণের ব্যবহারের ফলে তার মনে হল তার নিজের সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই, ভাই হলেও সে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না। তবে সত্য বলে সে যা মনে করেছিল, তা কিন্তু ঠিক নয়।

সামাজিক নানা বিষয়ে সাধারণ লোকের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সত্যব্রতের ওরফে 'আমার' হয়েছিল। সৎকর্ম বা দুষ্কর্মের পশ্চাতে সদিচ্ছা বা বদ্ অভিপ্রায় যা-ই কারণ হোক-না কেন, মানুষের মধ্যে এজিনিষটা আদৌ আসে কেন? যদি সব কাজের কার্য-কারণ সূত্র লক্ষ্য করা যায়, তবে সব কাজেরই একটা স্পষ্ট চেহারা ধরা পড়ে। তা থেকে, সাধারণে যাকে খারাপ বলে সেটা অনেক সময় ক্ষমাই আর যে কাজ শ্রেয় বলে প্রতিভাত হয় সেটা কম বাঞ্ছনীয় বলে পরিগণিত হয়।

এ ধরণের মতামতের দরুন আপ্পার মনে যে উদারতা জন্মেছিল সে ধারণা কালিন্দীরও ছিল আর তাই তার মনে হয়েছিল যে যা-ই ঘটুক-না কেন, নিজের ভাইয়ের কাছে তো নিশ্চয়ই ফিরে যেতে পারব।

কালিন্দী আর আপ্পার মধ্যে যে সব সময়ই বনত তা নয়। কারণ, তার এই উদারতা কালিন্দীর কখনও কখনও বড় যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হত। আশেপাশের সংস্কারপন্থীরা লুচ্চা-বদ্‌মাইশ এমনই কালিন্দীর মনে হত। পক্ষান্তরে আবার ধারণা ছিল যে এসব লোক পুরাণো আর নয়া ধারার পরস্পরবিরোধী ধাঁধায় পড়ে গেছে। তাই আশেপাশের লোকজনের ওপর কালিন্দীর রাগ হলেও তাতে আবার সায়ও ছিল না। এতে সে খুব নৈরাশ্য বোধ করত।

একদিন কালিন্দীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাড়ী ফেরার পর একটা ভিন্ন ধরণের যুক্তিচিন্তার উদয় হল আবার মনে। সে নিজেকে বলতে লাগল যে যদি জাতিভেদ দূর করতেই হয়, তবে সমাজের অতি উচ্চকুল আর বেশ্যার সন্তানের মধ্যে কড়ীর মতো আর এক শ্রেণী থাকা প্রয়োজন। তাই নয় কি? সেরকম হওয়াটা অন্ততঃ দরকার। আর আমরাই তো সেই শ্রেণী। কি করল দিদিমা? যে শ্রেণী থেকে মা পালাতে চাইল, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ উচ্চকোটিতে স্থান লাভের আগে নীচের দলকে হয়রাণি করার চেষ্টাটা যে নিতান্তই অর্থহীন, সেটা এরা দেখিয়ে দিয়েছে। দিদির মনে অবিশ্বাস জন্মেছে উচ্চবর্ণভুক্ত হওয়ার এই প্রচেষ্টায়। কৌলীন্যের মিথ্যা দম্ভপ্রকাশ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যদি পরিবর্তনের কোনও চেষ্টা করেও থাকি তবে যে শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য উন্মুখ হচ্ছি সেখানে অহরহ অপমানিত না হয়ে থাকা যাবে না। এ সব প্রশ্নই নিজেকে করে চলেছিল।

কালিন্দী স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছিল আর তার ব্যবহারেও নিন্দনীয় কিছু ছিল না। তবু ও তার মনে হল এ ধরণের ব্যবহারে অনুকম্পা প্রকাশ করা উচিত। স্বার্থত্যাগ, ক্রোধ আর 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' গোছের যে ব্যাপার এ-সবের মধ্যে পার্থক্যটা খুব সূক্ষ্ম। আর

ব্যক্তিবিশেষের আচরণ এই তিনেরই যৌথ পরিণতি। বহু স্বার্থ-ত্যাগের পেছনেই রয়েছে কোনওপ্রকার হতাশা। এক ঘণ্টা খুব গভীরভাবে তার মনে অনুপ্রবেশ করেছিল। কালিন্দীর এই ত্যাগের ব্যাপারেও হয়ত বা একটা নৈরাশ্যের ঘটনা রয়েছে।

কালিন্দীর এই নিরাশার কারণটা কি? প্রথা-বিরুদ্ধ বিবাহের সন্ততি পিতৃসমাজে ঠাঁই পায় না। কেবল এটুকুই কি রাগ করার কারণ হিসাবে যথেষ্ট?

কালিন্দীর মনে ক্রোধ আর ত্যাগের যোগাযোগে যে চিন্তাধারাটা বাসা বেঁধেছিল, তার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎটাও ছিল অন্যতম একটা প্রশ্ন। আর তা-ই নয়, আকাঙ্খিত কোনও যুবকের প্রেম না পাওয়ার দরুনই হয়ত কালিন্দী আত্ম-হননের এই পথটা মেনে নিয়েছিল। সে সম্ভবত ভাবল যে জীবনটা যদি নষ্টই হয়ে গিয়ে থাকে, তবে হোক-না আর-একটু। সত্যব্রতের মনে হল যে কালিন্দী নিতান্তই ভাবুক, ঠিক যুক্তিবাদী নয়।

আবার দিদির এই রাগটা হঠাৎ পড়ে এল কেন, সেই রহস্যের কোনও হদিস সে করতে পারল না। মেনেই যদি নেওয়া যায় যে ভবিষ্যতে সমাজে ঠাঁই মিলবে না, তা হলে একেবারে রক্ষিতা হয়ে যাওয়ারও কোনও প্রয়োজনও ছিল না। হতে পারে প্রেমের ব্যাপারে সে হতাশ হয়েছে। সাজানো গোছানো জীবনযাত্রায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সম্ভবত আত্মপীড়নের পথ হিসাবে এটা সে বেছে নিয়েছে। নাকি অন্যকার সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল? কিংবা ওই লোকটিই নিরাশ করেছে? পুরাতন ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে সত্যব্রত সব কথা চিন্তা করতে লাগল। কালিন্দীর আচার-আচরণের মনোমত রহস্যের কিনারা এখনও পাওয়া গেল না। অন্ততঃ সেরকমই মনে হল আমার।

কিছুদিন বাদে হঠাৎ একটা জিনিষ তার হাতে এসে ঠেকল। কালিন্দীর একটা পুরানো বই উল্টোবার সময় একটা কার্ড তার নজরে এল। শান্তারাম গুপ্তে নামধেয় এক ব্যক্তির সেটা ছিল বিবাহ-পত্র। তার ওপর কালিন্দীর নিজ হস্তাক্ষরে লেখা ছিল 'য়্যু স্কাউণ্ড্রেল' অর্থাৎ, ওরে বদমাইস্।

শান্তারামের বিবাহ-পত্র আর তাতে দিদির টিপ্পনী দেখে তার মনে হল যে দিদির হয়ত শান্তারামের সঙ্গে ভালবাসা ছিল। হয়ত আশাও ছিল তারই সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। হতে পারে শান্তারাম এ ধরণের আশা-পোষণের মতো ব্যবহারও করেছিল। পরে অন্যভাবে কোথাও সে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলে। তখন কালিন্দীর বোধ হল যে কেবল ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ তরুণও আমায় তুচ্ছ জ্ঞান করে। ব্রাহ্মণেতর সমাজেও মেলামেশা তার সম্ভব নয় একথা ভেবেই হয়ত তার মনে হীনমন্যতার উদ্ভব হল।

সত্যব্রতর কদিন ধরেই মনে হল যে কেবল ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণেতর জাতিও হেয় জ্ঞান করে, এদিকে প্রেমেও নৈরাশ্য যাবতীয় সব কারণে এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়েই কালিন্দী সুপথ পরিত্যাগের কথাটা ভেবেছিল। পরে আরও একটা শঙ্কা জাগল তার মনে। উচিত না হলেও শঙ্কাটা ছিল খুব স্বাভাবিক। সে সময় পত্রিকায় এক পতিতার কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকেই এই কথাটা তার মনে উঁকি দিয়েছিল।

৪

এস্থারের কাছে কালিন্দী কি ভাবে এল গোড়ায় সে কথাটা বলা দরকার। যদিও শিবশরণাপ্পার বাড়ী ছেড়ে চলে আসা সম্পর্কে

সে সিদ্ধান্ত একটা নিয়েছিল, তবুও কার্যত তা করতে কিছুটা সময় লাগছিল। এর পর সে কি করবে তা-ও পুরোপুরি চিন্তা করে নি। আমি মূর্খামি করেছি আর ভাগ্য আমায় যেদিকে টেনে নিয়ে যায় সেদিকেই যেতে হবে। ভাগ্যে যা লেখা আছে, তা ভুগতেই হবে। মনে মনে সে এভাবেই চিন্তা করেছিল। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র একটা ট্রাঙ্কে ভরে আর সেটা একটা কুলীর মাথায় চাপিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে সে বোম্বাইগামী বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে চলল। বাস সার্ভিসের একটা গাড়ীতে সে চড়ে বসল। কোথায় সে বাস যাচ্ছে তাও সে লক্ষ্য করে নি। টিকিট কণ্ডাক্টার যখন জিজ্ঞাসা করল—'যাবেন কোথায়? ডোণজা?' তখন সে হ্যাঁ বলল। ডোণজে কোথায় তা-ও সে জানে না। বাস ছাড়ল। আধ ঘণ্টা বাদে সেটা খড়ক-বাসলার দীঘির ধারে এসে দাঁড়াল। তখন সেখানেই সে নেমে পড়ল। নানা সব চিন্তা যখন মাথায় ভিড় করে এল, তখন সে একটা গাছতলায় বসে শান্ত মনে ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবতে শুরু করল।

খড়কবাসলার দীঘিটার ধারেই কিন্তু তার আত্মহত্যার চিন্তাটা বেশী করে মনে উদয় হতে লাগল। এখানে একটা নৌকা নিয়ে কিছুটা দূরে চলে যাওয়া যাওয়া দরকার আর গলায় একটা পাথর ঝুলিয়ে নিজের ও বাচ্চাটার জীবনান্ত করাই বাঞ্ছনীয়। এধরণের চিন্তাই তার মাথায় এল। এসময় মনে তার এ ভাবনা জাগল যে বিশেষ যে কারণে সে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছে, সেটা সবারই জানা আবশ্যক। তাতে শিবশরণ আপ্পার দুর্নামটা ভাল রটবে। আপন মূর্খতাহেতু আমায় আত্মহত্যা করতে হচ্ছে। কিন্তু যে ধরণের লোক শিবশরণ আপ্পা, আমার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধী হয়েও সে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এসব কথাই তার মনে হল। নিজের পায়ে

নিজেই কুড়াল মেরেছি, ছুনিয়াকে দোষারোপ কব্বার কি আছে? এধরনের কথা তার মনে হল। যে কারণে আমি সুপথ ত্যাগে বাধ্য হয়েছি, তা লোকে জানে। সংসারের ওপর রাগ করে বিবাহ-প্রথার যে নিন্দা করেছি, তাও ভুল ছিল। আমার মতো সঙ্কটাপন্ন মেয়েদের কথাটা জানা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে মনে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চজাতীয় কন্যা বিবাহের কথাটাও এল। যদিও স্ত্রী-স্বীকৃতি-দানে উপকার করার চেষ্টাটা বর্তমান, তবুও মূক প্রজার এতে উপকার হয় না। ইত্যাকার কথা সংসারের দৃষ্টিগোচর করার উদ্দেশ্যে একটা চিঠি সে লিখতে শুরু করল। এসময় পুরানো সব কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তার মন শোকাভিভূত হয়ে উঠল।

বিকেল চারটা নাগাদ সেখানে অনেক জনসমাগম হতে আরম্ভ হল। সম্মুন হাসপাতালের একজন নার্সও সেখানে এসেছিল। আর বহু য়ুরোপীয়ও নিজ নিজ গাড়ীতে এসেছিল সেখানে। একটা মোটরে কিছু বেনে ইস্রায়েলীও এসেছিল। তাদের মধ্যে এক মহিলার দৃষ্টি গেল কালিন্দীর প্রতি। উনি চট্ করে 'কালিন্দী' বলে হাঁক দিলেন। কালিন্দী মুখ ঘোরাল তাঁর দিকে। তখন সে চিনতে পারল যে এ তার পরিচিত এস্থার। কালিন্দী চিঠি লেখার প্যাডটা বন্ধ করল।

এস্থারকে দেখে এত আনন্দ হল কালিন্দীর মনে যেন সে বহুদিনের পরিচিত এক সখীকে দেখল। আত্মহত্যার চিন্তাটা তার পাল্টে গেল। পূর্বেকার সম্পর্কটাই ছুজনের মধ্যে এরকম ছিল। বয়সটা ছুজনের এক ছিল না। এস্থার ছিল কালিন্দীর চেয়ে ছু-তিন বছরের বড়, তবে খুব ভাব ছিল ছুজনের মধ্যে। ঠিক একই ক্লাসে না হলেও হুজুরপাসা স্কুলেই ছুজনে পড়ত। কালিন্দীর মনে পড়ল কি রকম হৈচৈ তারা করত। এভাবেই একবার স্কুলে এক

শিক্ষকের সঙ্গে আর এক শিক্ষয়িত্রীর প্রেম কেমন চলছে সে অপবাদ রটনা আর পুনর্বিবাহের খবরটা চালু করা ব্যাপারে এই দুজনই হাত মিলিয়েছিল। আর কলেজ জিমখানার নির্বাচনে কমিটিতে মেয়েদের না নেওয়ার দরুন এরা একত্রে গোলমাল পাকিয়েছিল।

কালিন্দীর মনে থেকে থেকে দুঃখের ভাব উঁকি দিলেও একে দেখে সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

এস্থার তাকে জিজ্ঞাসা করল, "একাই এসেছিস বুঝি বাচ্চা নিয়ে?" কালিন্দী বলল, "হ্যাঁ।" "তোর বিয়ের খবরটা জানালি না। আর বাচ্চা যে হল তাও টের পাই নি", জিজ্ঞাসা করল এস্থার।

কালিন্দী কোনও জবাব দিল না। আগত দলের সবাইকে দূরে চলে যেতে দেখে কিছুক্ষণ বাদে সে বলল, "তোর কাছে এসে কিছুদিন কি আমি থাকতে পারি?" এস্থার জিজ্ঞাসা করল, "বাড়ীতে কারুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে বুঝি?" কালিন্দী জবাব দিল, "বাড়ীই নেই আমার।" এস্থার হতচকিতভাবে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

কালিন্দী প্রশ্ন করল, "তুই কিছুই জানিস না?" এস্থার বলল, "উত্তর ভারতে এক মেয়েস্কুলে এক বছর ধরে রয়েছি আমি। কালই কেবল পুণায় ফিরেছি।" কালিন্দী তখন ওকে বলল, "সব কথাই পরে তোকে ধীরে ধীরে বলব।"

এস্থার অনুমান করে নিল যে কালিন্দী বড় কষ্টে আছে আর তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বাদে সে বলল, "আমার কাছে থাকতে চাস তো নিশ্চয়ই চলে আয়। কিন্তু তোর বাবার মতো আমার পয়সাকড়ি নেই তবুও আমার কাছে থাকতে ভাল লাগে তো কদিন এসে থাকার জন্য তোকে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

দু-চার দিন এস্থারের গৃহে কাটানোর পর কালিন্দীর সব ব্যাপারটাই ওর কাছে খোলসা হয়ে গেল। এস্থারের মনে নীতি-প্রশ্ন না জেগে একটা আর্দ্র সহৃদয়তার উন্মেষ হল। তার মনে হল কালিন্দীর জন্য কাউকে একটু বলা দরকার। শিক্ষা-অধিকর্তার সঙ্গে সে দেখা করল আর উনিও কথা দিলেন যে তিনি অবশ্যই কালিন্দীর জন্য কিছু করবেন। তবে তাঁর নিজের অধীনে স্কুল-বিভাগে তাকে চাকুরিতে নিযুক্ত করতে তাঁর ভরসা হল না। জনসাধারণের ধারণা হবে যে-স্ত্রীলোকের পূর্ব ইতিহাস এরকম সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণা হবে না। আর যদি তাকে কাজে নিয়োগ করাও হয়, তবে স্কুল কর্তৃপক্ষও বিষয়টা নিয়ে তীব্র বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হবেন এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। শ্রমিকদের কাছ থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, মিলে সমাজ-কল্যাণ বিভাগের কাজ, ভিজিলেন্স সোসাইটিতে গিয়ে মেয়েদের দুর্নীতিমুক্ত করা ইত্যাদি ধরনের কাজ এই মেয়েটির দ্বারা সম্ভব। ইত্যাকার সব কথা বলে শিক্ষা-অধিকর্তা আশ্বাস দিলেন। এই সময়টায় লেবার অফিসের তরফে শ্রমিক বস্তীতে মেয়েদের মধ্যে কাজ করার জন্য মহিলা কর্মী আবশ্যক জানিয়ে একটা চিঠি এল এই অধিকর্তার কাছে। এই চিঠির কথাটা উল্লেখ করতে কালিন্দীর মনে হল তার হয়তো একটা ভবিষ্যৎ ভরসা রয়েছে। কালিন্দী স্থির করল কাজটা সে গ্রহণ করবে।

9

অনেকদিন কেটে গেল এস্থারের বাড়ীতে। বম্বেতে যে চাকুরিটা কালিন্দীর হওয়ার কথা ছিল, তার জন্য চিঠিপত্রের আদান-প্রদান তখন চলছিল। এসময় একদিন যখন দুই সখী পরস্পরের মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা বলছিল তখন এস্থার কালিন্দীকে জিজ্ঞাসা করল, "বাড়ীঘর ছেড়ে একজন বিবাহিত বেনিয়ার সঙ্গে থাকার ইচ্ছাটা তোর কেমন করে হল ?" কালিন্দী উঠে একটা নীল প্যাড খুলে ধরল। তাতে ফাউন্টেন পেনে লেখা বিশ-পঁচিশটা পাতা ছিল। সে এস্থারের হাতে সেগুলো দিয়ে বলল, "আমার আচরণের যৌক্তিকতা এতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।" খুব ঔৎসুক্য সহকারে কাগজগুলো নিল এস্থার। তার কাছে কালিন্দীর ব্যবহার নীতি-বিগর্হিত বলে মনে হয়েছিল। নীতিবিহীন কোনও কাজ একটু সাহস ভরে করলে তাতে যেমন একটা চট্পটে সপ্রতিভ ভাব আনার চেষ্টা থাকে, তার মনে হল, কালিন্দীর আচরণটাও সে-ধরনের। খুব উৎসাহ সহকারে এস্থার কাগজের তাড়াটা পড়তে শুরু করল।

প্রথমে সে জিজ্ঞাসা করল, "এ চিঠি কাকে লিখেছিস তুই ?"

"ভাইকে লিখেছি। তবে আসলে এটা সমগ্র সমাজকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।"

"তা হলে, এচিঠি প্রকাশ করাই তোর উদ্দেশ্য ছিল ?"

"হ্যাঁ, ইচ্ছাটা ছিল যে আমি মারা যাওয়ার পর চিঠিটা যেন প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হচ্ছে এই ধারণাই ছিল।"

"তার মানেটা কি ? তবে কি তুই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলি ?"

"হ্যাঁ, সেদিন খড়কবাসলায় সে উদ্দেশ্যেই নেমেছিলাম।"

"তা হলে সঙ্গে ট্রাঙ্ক নিয়েছিলি কেন ?"

"গাড়ীতে যখন চড়ি তখন আত্মহত্যার কথাটা মাথায় আসে নি। আমি ডোণজার টিকিট কেটেছিলাম। পরে খড়কবাসলার দীঘির ধারে নেমে পড়ি।"

"তা হলে মৃত্যুর আগে লিখছিস মনে করেই এ চিঠি লিখেছিলি?"

"হ্যাঁ, কথাটা তাই।"

"তবে তো বড় সময়ে গিয়ে পৌঁছেছিলাম আর অজ্ঞাতে অনেক-খানি পুণ্য অর্জন করেছি।"

"আমিও তো তাই বলছি।"

"আর এ-চিঠি নিশ্চয়ই তুই মন খুলে লিখেছিস ?"

"হ্যাঁ, একেবারে মনের কথা।"

পড়তে লাগল এস্থার :

"ভাই, এ-চিঠি যখন তুমি পাবে তখন, আমি কালিন্দী, এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছি। তোমার কাছে কোনও অপরাধ যদি করে থাকি ক্ষমা চাইছি সেজন্য। তুমি তা করবে সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সংসারের কাছে আমি অন্যায় কিছুই করি নি, কিন্তু সংসার আমায় মন্দ বলেই মনে করে। আমি চিঠিখানা লিখছি কারণ বিশ্বসংসারকে আমায় সব কথা শোনাতে হবে। এ চিঠি প্রকাশ করে, জনসাধারণ অধঃপতিত বলে যাকে মনে করে সেই কালিন্দী তার মনের কথা খোলাখুলি ব্যক্ত করছে। জীবিত অবস্থায় যেসব পরিচিতবর্গ তাকে তিরস্কার করেছে এবং মনে করেছে যে তার উপযুক্ত সাজাই হয়েছে, তারা সবাই যেন আর গালমন্দ না করে, এ-চিঠি লেখার সেটাই অন্যতম কারণ। কালিন্দীর বক্তব্যটুকু শান্তমনে পড়বে।

যে পরিচিতবৃন্দ কালিন্দীকে মন্দই বলেছে, সেসব অসংখ্য ব্যক্তি এ-চিঠিটা যেন পড়ে আর আমার কাছে বিশেষভাবে সত্য এ-দুনিয়াটাকে যেন ঠিক ভাবে বুঝতে পারে। সেজন্য আমার অনুরোধ এ চিঠিটা যেন প্রকাশ করা হয়।

"জীবনের ঠিক যতটুকু কালিন্দীর স্ব-ইচ্ছায় হয়েছে সেটুকু দোষই কেবল তাকে দেওয়া চলে, কিন্তু যে ব্যাপারে তার ইচ্ছা বলে কিছু ছিল না বা সে-দরুন যেভাবে তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাতে তাকে দোষারোপ করে কি লাভ? আমার নিন্দুকেরা কিন্তু গোড়াতেই এধরনের বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

"যদি সে বেশ্যার মেয়ে হত তবে কালিন্দীর এ-ধরনের আচরণে আমরা তাকে দোষারোপ করতাম না। উপযুক্ত আচরণ অর্থাৎ স্বীয় বিচারানুযায়ী আচরণ সে করে নি। এ-ধরনের দোষারোপের যথার্থ কারণ হল যে কালিন্দী 'ব্রাহ্মণ-কন্যা'।

"কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যা হলেও, সাধারণভাবে ব্রাহ্মণের কোনও মেয়ের যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা মেলে সেটা কালিন্দীর কখনও মেলে নি। কিন্তু বেশ্যার মেয়ের আচার-আচরণও তার মধ্যে পাওয়া যায় নি। সাধারণ ব্রাহ্মণের মেয়ে সে ছিল না, তবে জাতিভেদের বালাই না রেখে বিয়ে করা এক ব্রাহ্মণেরই মেয়ে ছিল সে।

"জাতি-ভেদ-প্রথা লুপ্ত হোক যে-সব লোকেরা বলে, তারা সবাই হয় লুচ্চা-বদমাইস নতুবা মূর্খ। এরা বইয়ের ভাষায় সাজানো-গোছানো সব কথা বলে; প্রার্থনা সমাজ আর সংস্কারপন্থী বলে খ্যাত সব নেতারাই বদমাইস। নিজেদের জীবনে এরা জাতিভেদ দূর করার জন্য কিছুই করে নি। নিজেরা উপদেশ দান ক'রে কেবল ধোঁকা দিতে চায় সবাইকে।

"পৃথিবীতে অত্যন্ত সৎ ও সরল লোকও রয়েছে। এরাই

ধোঁকা খায়। যারা মিথ্যাচারী তারা সময় বুঝে ধরন-ধারণ বদলে নেয় আর সুবিধাবাদীর মতো কথাবার্তা বলে। আমার মনে হয় এ পৃথিবীটা এ-সব বদমাইসদের জন্যই। আমার বাবার মতো যারা বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য লোক, তাদেরই স্বীয় পরিবারের দুর্গতি প্রত্যক্ষ করতে হয়। আমি জাতিভেদ দূরীকরণ সম্পর্কে এটুকুই কেবল বলব যে এ ঝঞ্ঝাটে যেন আর কেউ এসে জড়িয়ে না পড়ে। স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কারুরই বিয়ে করা উচিত নয়। বিয়ের ব্যাপারে স্বার্থত্যাগের অধিকার কারুরই নেই। কারণ এর ফলে একজন কেবল নিজেরই ক্ষতি করছে না, অন্যদেরও করছে। স্বার্থ যারা বিসর্জন দিচ্ছে, তারা প্রশংসা পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার বংশধরদের বিড়ম্বনা ভোগ করতে হচ্ছে। ঝুড়ি-ঝুড়ি প্রশংসা যাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, তাদের এ কথাটা খুবই খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

"যারা জাতিভেদ বিলোপ করাটা নিশ্চিতরূপে হিতকারী বলে থাকে আর আমায় যারা ব্যাভিচারিনী মেয়ে বলে ধরে নিয়েছে, আমার বংশ-ইতিহাস আর মনের ধ্যান-ধারণাটা তাদের একটু সদয়ভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

"দুঃখী পুরুষকে আনন্দ দিতে আমি সবসময় ব্যাকুল হয়ে উঠতাম। সর্বদাই দুঃখী পুরুষ খুঁজে বেড়াতাম। যখন শিব-শরণাপ্পা আমায় নিজের মোটরে কলেজে পৌঁছে দিতে শুরু করল, তখন মনে হল গাড়ীর ব্যাপারে হয়তো কিছু জানা হবে। সে ভেবেই তার সঙ্গে গিয়ে বসতাম। কখনও গাড়ীর যান্ত্রিক ব্যাপার নিয়ে কখনও বা তার বাড়ীর সব কথা হত। শিবশরণের আর্থিক অবস্থার কথাটা সেসময় আমার ঠিক জানা ছিল না। তখন তাকে যতটুকু যা দেখেছি তাতে আমার ধারণানুযায়ী তাকে দুঃখী লোক বলেই মনে হয়েছিল।"

এপর্যন্ত পড়ার পর এস্থার বলল, "তোর চিন্তাধারাটা অনেক মেয়েই বুঝতে পারবে, তবে পুরুষ যে কতখানি এর গ্রহণ করবে তাতে আমার সন্দেহ রয়েছে। পুরুষেরা সব সময়ই মনে করে যে তাদের গুণাবলী আর টাকা-পয়সাতেই মেয়েরা আকৃষ্ট হয়। ভালবাসার ব্যাপারে তো এ-ই সত্য যে মন আমার যে কারণেই আকাঙ্ক্ষা করুক, সামান্য স্নেহ বা সহানুভূতি—তা যাই হোক, আসলে এই নম্রভাবটা জাগছে কেবল কোনও লোকের প্রতি আমাদের করুণা বা মমত্ববোধ একটা রয়েছে বলেই।" কালিন্দীর এটুকু জেনে অপার আনন্দ হল যে এস্থার তার মনোভাবটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। এই খুশিতেই সে এস্থারের গলা জড়িয়ে ধরল আর এস্থার তাকে দুহাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল।

দুই সখী অতঃপর মেয়েদের প্রেম, বিশেষত এস্থারের জীবনে প্রেম নিয়ে হাসি-মস্করা চালাল। এরপর আবার পড়তে শুরু করল এস্থার: "শিবশরণাপ্পার স্ত্রী লেখাপড়া জানত না, তাই তার কাছে মারাঠি গল্পের বইটই নিয়ে যাওয়া যেত না। তার স্ত্রী ছিল ঈর্ষাকাতর, সহানুভূতির লেশমাত্রও তার মনে ছিল না আর স্বামীর সুখে-দুঃখে কোনও ভাবেই সে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যেত না। আমার মনে হয়েছিল যে খুব অল্প বয়সেই শিবশরণাপ্পার বাবা তার বিয়ে দিয়েছিল, তাই সামাজিক কুপ্রথা বালবিবাহের সে বলি হয়েছিল। আমার মনে হয় এই কুপ্রথার শিকার হিসাবে আরও সাহস সহকারে তার বিদ্রোহ করা উচিত ছিল। আর কুপ্রথার বিবিধ দায়-দায়িত্বের প্রশ্নেও তার বিরোধিতা করার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনীয় সাহসটুকু যার ছিল না, তার মধ্যে সেটুকু জাগানোই আমার কর্তব্য ছিল। কারণটা তার এই যে শিবশরণ বার বার আমায় তার স্ত্রীর একগুঁয়েমিজনিত

কান্নাকাটির কথা বলত। আমার মনে হত যেন কোনও রাক্ষসীর ফাঁদে গিয়ে পড়েছে শিবশরণ।"

এস্থার জিজ্ঞাসা করল, "তুই দেখিস নি কখনও ওর বৌটাকে?" কালিন্দী জবাব দিল, "চিঠিটা আগে সবটা পড়ে-নে।"

"শিবশরণের সঙ্গে তায়ম্মাকে কোথাও বেড়াতে যেতে দেখি নি আমি। তা-ই বা কেন, আমি তাকে আদৌ কখনও দেখি নি। মা-ও তাকে দেখে নি কখনও। যখন তার বিষয়ে মা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তখন শিবশরণ বলেছিল যে ও সাবেকী ধরনের। বাইরে বেরুতে তার ভাল লাগে না। মার কাছে এ-জবাবটুকুই যথেষ্ট ছিল। তার ইচ্ছা ছিল না যে শিবশরণের স্ত্রীও মোটরে ওর সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। স্রেফ এটুকুই, নয়তো মারও সে মেয়ের সঙ্গে চেনা-পরিচয় করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। বাড়ীতে আমাদের গাড়ী ছিল না। আর গাড়ী-মালিকানী সামনে বসে জাঁক দেখাবে, এটাও ঠিক নয়। আসলে ব্যাপার এই যে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরুত না শিবশরণ তার কারণটা ছিল মহিলার পর্দানশীনতা নয়, তার কুরূপ।

"সে ছিল কালো, মুখময় বসন্তের দাগ। তাই শিবশরণের মনে হত লোকের সামনে একে কি করে বার করে। যদি তায়ম্মা ভাল শাড়ী-গয়না পেত, তবে হয়তো তাকে এত বিশ্রী আর কুরূপা দেখাত না। কিন্তু সে ময়লা—আগোছালোভাবেই থাকত আর উপেক্ষার কারণেই সে আরও সেভাবে থাকতে চাইত। শিব-শরণের মনে হত সুন্দরী আর চটকদার মেয়েদের দেখায় পাঁচ-জনকে। এজন্য সে মা উষা আর আমায় সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করত। শিবশরণের অন্তরের সত্যিকারের ইচ্ছাটা আমার জানা ছিল না। পত্নীর প্রতি সত্যি সত্যি অসন্তুষ্ট

হয়ে থাকলে সে তাদের সমাজে প্রচলিত বিবাহ-বিচ্ছেদ-রীতির আশ্রয় নিয়ে কাজ গোছাতে পারত। কিন্তু সে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে নি। তার অর্থ এই যে স্ত্রী একেবারে পরিত্যাজ্যও ছিল না। স্ত্রীর প্রয়োজনটা তার কাছে ছিল দাসী হিসাবে। এটুকুই তার সঙ্গে ছিল ভালবাসার সম্পর্ক। এত সব কথায় যদি আমার খেয়াল থাকত, তবে নিশ্চয়ই বাড়ীঘর ছেড়ে তার সঙ্গে যেতাম না। আমি সম্পত্তির লোভে শিবশরণের সঙ্গে যাই নি। তবে কষ্টে রয়েছে, লোকটা দুঃখী, তাই সহানুভূতির সঙ্গে তার কষ্ট লাঘবের চিন্তা করেই আমি গিয়েছিলাম। বিবাহের আইন-কানুন আমার জানা ছিল না। আর হয়তো তাতে আমি সেই গুরুত্ব প্রদানে সম্মতও ছিলাম না। আইনের দৃষ্টিতে যে আমি হিন্দু, তাও আমার ঠিক জানা ছিল না। হিন্দু হলেও সে-সমাজে আমার নির্দিষ্ট স্থান নেই সেটা বার বার মনে হত আমার। মাহার যেরকম ছোঁয়াছুঁয়িটা বাড়িয়ে দেয়, সেরকম অবশ্য আমায় নিয়ে হত না। মন্দিরে গেলেও সেখানে প্রবেশের কোনও বাধা ছিল না। এসব কারণেই লোকে আমাদের হিন্দু মনে করত, অন্ততঃ সেরকমই ধরে নিত। যত চীৎকার করেই একজন হিন্দু বলুক-না কেন যে আমি হিন্দু নই, তাতেও আমার হিন্দুত্বের বিন্দুমাত্র উনিশ-বিশ হবে না। বস্তুত আমার হিন্দুত্বও খোয়া যাবে না। আইনত হিন্দুর যে-কোনও বর্গেই আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব কারণ আইনের দৃষ্টিতে আমি বিশেষ কোনও বর্গের নই। হিন্দুর বিয়ে বর্ণ-বিচার করেই হয়ে থাকে। অনুলোম-বিবাহ অবশ্য আইনসিদ্ধ। তবে এভাবে খুঁটিয়ে বিচার করতে গেলে অবশ্য আমার নিজের স্থান সম্পর্কে নিজেরই ঠিক কিছু জানা ছিল না। আমি ব্রাহ্মণের রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহজাত সন্তান। এ কারণে শূদ্র জাতির নিয়মও সব আমার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় এবং—

এপর্যন্ত চিঠিটা পড়ে এস্থার আবার জিজ্ঞাসা করল, "আর কি লিখতে চাইছিলি ?"

"আমার তা মনে নেই। অনেক কিছুই লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বেদনাপ্লুত হৃদয়ে আর লিখতে পারি নি। আর মনেও নেই সব কথা।"

"কি, মন তোর আজ এতই বদলে গেছে যে পুরানো সেসব চিন্তা ভুলেই গেলি ?"

"পুরানো কথা তো সব ভুলতে পারি না। কিন্তু চাকুরি না মিললে এর পর আমার কি হবে বলতে পারি না।"

"চাকুরি তোর নিশ্চয়ই হবে।"

"কি ভাবে ?"

"এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিস না। আমার স্থির বিশ্বাস যে কাজটা তুই পাবি আর ততদিন পর্যন্ত আরাম করে কাটা তুই এখানে।"

"কিন্তু এস্থার, একটা কথা আমায় সত্যি করে বল। তুই যে আমার মতো মেয়েকে নিজের কাছে রেখেছিস তাতে তোর মান-ইজ্জতে ঘা লাগছে না ?"

"যদি বা কিছু আসে যায়, সেটা পরে চিন্তা করা যাবে। ঠিক করে বল সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটা আসছে কেন— প্রথমত, চাকুরিটা যাতে না চলে যায় আর দ্বিতীয় কারণ, ভবিষ্যতে বিবাহ-ব্যাপারে কোনও বাধা পড়ে।"

"আচ্ছা।"

"চাকুরির ব্যাপারে বাধা হবে না। কারণ অধিকর্তাকে জানানো হয়েছে যে তুই এখানে আছিস আর উনিও তোকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে খোঁজ-খবর করছেন। তাই তোকে কাছে রাখলে কী আর

আমার হবে ?”

“কিন্তু বিয়ে-থার ব্যাপারে—”

“সে কথা ভাবছিস কেন ? আমার বিরুদ্ধে তো এ পর্যন্ত কিছু কথা ছিল না, কিন্তু বিয়ের বাজারে দাম আমার বেশী হলে ভয়ের কথা ছিল। তা এখন সেটা কমেরই দিকে।”

“কি, তোর কোনও দাম নেই ?”

“হবে, কিছু কানাকড়ি। তা থেকে আধা কড়ি কমলেই বা কি এসে যায় ?”

“এস্থার, নিজের বন্ধুর জন্য যে স্বার্থত্যাগ তুই করলি তার গুরুত্বটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টাতেই বলছিস যে বিয়ের বাজারে তোর বেশী দাম নেই। কিন্তু তুই যেরকম সুন্দরী আর সুশিক্ষিত, তা কি রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে ?”

“কালিন্দী, শুধু-শুধু তুই উদারভাবে আমার ওপর গুণ আরোপ করছিস। আমার তা নেই। সনাতনী নীতিবাদী ব্রাহ্মণেরা যেখানে থাকেন, সেই সদাশিবপেটে স্বার্থত্যাগ ইত্যাকার শব্দ প্রযুক্ত হয়, রাস্তাপেট মহল্লায় ওসব কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বন্ধু তার কর্তব্য করেছে। এইটুকুই বলতে হয় তো বল।”

“এস্থার, কত সুন্দর তুই। তোর মত মেয়ে অবিবাহিত পড়ে রয়েছে আর এর মানে এই যে তোর সমাজের ছেলেরা সব কাণা, চোখে দেখে না।”

“অমন চক্ষুষ্মান ছেলে কেউ তোর জানা থাকলে সে যদি আমার সমাজের বাইরেরও হয়, তবু তাকে তুই নিশ্চয়ই এখানে নিয়ে আয়, আজই রাতে। তা'হলে এখানে তাকে খেতেও বলিস।”

“তবে সত্যি বলছি তোকে গত বছর-দু-তিনের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে আমার চেনাজানা বিশেষ হয় নি। কিন্তু তুই বল তো এস্থার

তোর মনটা পুরুষ থেকে দূরে পালাতে চায় কেন• আর সে-ও তো তোর সেই বছর তেরো বয়স থেকেই। কি, সে সময় হিন্দীভাষী ও পত্রপত্রিকা বিক্রেতা একটি ছেলের প্রতি তোর মন বসে নি? নাকি যথেষ্টভাবে আকৃষ্ট করার মতো আদর্শ পুরুষ কেউ এতাবৎ তোর নজরে পড়ে নি?"

"মেলে নি কে বলল?"

"তবে বল তোর নিজের গল্প।"

"কত পুরুষই যে আমার হৃদয়-মন টেনেছে, তার কোনও গোণা-গাঁথা নেই।"

"তার মানেটা কি?"

"কেন, রাস্তায় চলতে ফিরতে সুন্দর, মনোরম সাজ-পোষাকে সজ্জিত পুরুষ তথা তরুণ যুবার দল কি অসংখ্য নজরে আসে না?"

"দেখা তো যায়, তাতে কি?"

"এমন তরুণ দেখলে মন তো আনচান করে, তা সেই সঠিক হিসাবটা রাখি কেমন করে?"

"তুই পুরুষই বা কাকে আর তরুণ যুবাই বা বলছিস কাকে?"

"নিজের বয়স ছাড়িয়ে যে চলেছে সে পুরুষ আর তা থেকে ছোট যে তাকেই তরুণ বলছি..."

"কি, তোর মন তবে বয়েসের ছোটর প্রতি সমধিক আসক্ত?"

"কালিন্দী, মনের এই খেলার সঙ্গে কি তোর পরিচয় নেই?"

"দেখ এস্থার, একে তো বয়সে তোর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট আমি..."

"হ্যাঁ, সদাশিবপেঠের তোর বাড়ী থেকে হুজুরপানা যতটা দূর, আমি রাস্তারপেঠের বাসিন্দা তার চেয়ে তিন গুণ দূরত্বের পথ পেরিয়ে হুজুরপানা রোজ যাই। তাই পথিবীটা সম্পর্কে আমার

অভিজ্ঞতা তোর 'চেয়ে তিনগুণ বেশী। কি, সত্যি না কথাটা ?"

"হ্যাঁ, কথাটার গুরুত্ব কম নয়। আমায় বল আমার চেয়ে কম-বয়স্ক কেউ বা হয়তো তোর নজরে পড়েছে।"

"তাই সত্যি কালিন্দী। তবে নিজের মনের গভীরে খুঁজে দেখে বল যে আজ অবধি বিশ-পঁচিশ বছরের কোনও তরুণ যুবকের প্রতি তোর মন পড়ে নি।"

"হয়তো বা গেছে, তবে সেটাই কি প্রেম ?"

"কেন নয় ? প্রেমের ব্যাপারে সেরকম প্রত্যুত্তর এলে তবে সেটা প্রেম। আর যে ক্ষেত্রে তা নয়, তাকে তো প্রেম বলা চলে না। তাই নয় কি ?"

"এস্থার, তা এই বাদ-বিতণ্ডাই বা কেন ? আমি তোর জীবনের তথ্য সব জানতে চাই— এসব সাইকেলওয়ালা, দর্জি— ছাড়ান দে ওদের কথা। কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত আর মধ্যবয়স্ক, তা নয়— সমান বয়সটাও প্রয়োজনীয় শর্ত নয়— চার-পাঁচ বছরের বড় হলেও চলে— এধরনের তরুণের সঙ্গে তোর কখনও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি ?"

"সে ছেলের বয়স বেশী তা-ই কেন ধরে নিচ্ছিস ? বয়েসে কিছু কম হলেও প্রেম হয় তা তুই মানতে রাজী না ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনি তো তার গল্প আগে।"

"তখন আমি বি. এ পাস করেছি। গিয়েছিলাম একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে। আমার বোধ হচ্ছে সেসময় তুইও গিয়েছিলি সেখানে। স্পোর্টস্ কোট পরিহিত এক নব্য যুবকও সেখানে এসেছিল। তাকে মনে হল যেন একেবারে সুকোমল, স্বচ্ছ আর নিষ্পাপ বলে। সে হাসলে টোল পড়ত তার গালে। তাকে দেখে মনে হল গাল দুটো ধরে খানিকটা টিপে দি আর পালাই কোথাও ওকে নিয়ে—

"কে ওই ছেলেটা ?"

"জানি না সে কে ? ধারেকাছের সবছেলেরা 'আবা' বলে ডাকছিল।"

"কী, আবা— আর তার গায়ে ছিল স্পোর্টস্ কোট ?"

"হ্যাঁ, কেন রে ?"

"আমার ভাইয়ের নাম সত্যব্রত। তবে আমি তাকে ডাকি আবা বলে। আর সে হাসলেও তার গালে টোল পড়ে। সেই খেলাটা পী. ওয়াই. সি.র মাঠে হয়েছিল। তাই না ?"

"হ্যাঁ, তোরও কি মনে পড়ছে সেদিনের কথা ?"

"হ্যাঁ, বেশ ভাল রকম। তোর আর আমার মধ্যে কি কোনও কথাবার্তা হয়েছিল সেদিন ?"

"আমাদের মধ্যে কথা হয় নি। তবে আমার রুমালটা নীচে পড়ে গিয়েছিল। সে উঠিয়ে দিয়েছিল সেটা। আর আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।"

"সত্যি কি রুমালটা পড়েছিল নীচে ? না সে যাতে উঠিয়ে দেয় সেজন্য বুঝেশুনেই তুই সেটা ফেলে দিয়েছিলি ?"

"কালিন্দী, কেন জানতে চাইছিস এ-সব ? বড় গোলমেলে মেয়ে তো তুই। কথাটা বলেই আমি গণ্ডগোল করেছি। যার গালটা টিপতে ইচ্ছা করেছিল, সে যে তোরই ভাই, তা তো কল্পনাও করি নি।"

"আমার ভাই তো তাতে ক্ষতি কি ?"

সত্যব্রত ওরফে আবা খড়কবাসলার রাস্তায় বোনের সঙ্গে সেই কথাবার্তা বলার পর প্রায় এক বছর পুণাতেই ছিল।

বম্বেতে থাকতেই ভাল লাগত সত্যব্রতের, তবুও সে পুণা ছেড়ে যেতে খুব একটা রাজী ছিল না। সেখানে কালিন্দীর সেই বান্ধবীর

কাছে যেতেও তার ইচ্ছা জাগত মাঝে মাঝে। কালিন্দীর দৌলতে ওর দু-চার জন লেখাপড়া-জানা মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বম্বেতে কিন্তু সমবয়স্ক কোনও মেয়ের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটে নি। তাই মেয়েদের সঙ্গে গাল-গল্পের তার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল আর সে-কারণে পুণায় একটা বছর কাটানো স্থির করেছিল। তা ছাড়া তার নিজেরও মনে হয়েছিল যে অনেক মেয়েই তার সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য উন্মুখ। কালিন্দী-সংক্রান্ত কারণে বাবার সঙ্গে তার নিজের ঝগড়া ও বাদানুবাদ যা হয়েছিল তার খবরটা ঊষা মারফত হুজুর-পানার কিছু কিছু মেয়ে আর শিক্ষয়িত্রীরা জানতে পেরেছিল। যা-কিছু কালিন্দী করেছিল তার সবই মন্দ ছিল না, কারণ এ-মেয়ে ছিল গুণবতী। কথাটা যখন সত্যব্রত জোরের সঙ্গে বলেছিল তখন কালিন্দীর আচরণ সম্পর্কে মিথ্যা রটনাটা দূর করার উদ্দেশ্যে আরও কথাবার্তার প্রয়োজন এটা অনেক মেয়েরই মনে হয়েছিল। তাই সত্যব্রতের সঙ্গে কালিন্দীর যাবতীয় আলোচনা আদ্যন্ত জানলে ভাল হয়, এ-ও ওই মেয়েদের মনে হয়েছিল। তার সঙ্গে কথা বলার ঔৎসুক্যও দেখিয়েছিল কয়েকটি মেয়ে। সত্যব্রত যখন কারুর বাড়ীতে যেত তখন মনে হত কালিন্দীর ব্যাপারে লোকের ঔৎসুক্য যতদিন ছিল ততদিন ওরা ওকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাত। আরেক বার যখন সে গিয়েছিল তখন কিন্তু মেয়েরা 'কাজে ব্যস্ত রয়েছি' বাহানা করে আর দেখাই করে নি ওর সঙ্গে। কোনও কোনও বাড়ীতে ঝি-চাকরের হাতে চা পাঠিয়ে ভাব করল যেন ওকে আর কথা বলার বিশেষ সুযোগ দিতে ওরা রাজী নয়। তাই শেষ পর্যন্ত পুণায় এক বছরের বেশী আর না কাটানোই আবা স্থির করল।

আবা নিরন্তর দিদির মনোভাবটা আপন মনে বিচারের চেষ্টা

করত। তার হিসাবে শান্তারাম গুপ্তের বিয়ের চিঠিটায় এক বছর আগেকার তারিখ ছিল। তার থেকে আবার ধারণা হয়েছিল যে সে-সময়টায় কালিন্দীর মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছিল। কালিন্দীর সঙ্গে আমার কী কথাবার্তা হয়েছিল তা জানার জন্য তার ব্রাহ্মণ বান্ধবীটি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। আবার দ্বিতীয় দফায় যাওয়ার পর আমায় সে এড়িয়ে গিয়েছিল। কথাটা সত্যব্রতের মনে এল এবং খুব খারাপ লাগল ব্যাপারটায়। শান্তারাম গুপ্তের বিয়ের চিঠিতে কালিন্দী যে মনে কতটা আঘাত পেয়েছিল সেটা সে সহজেই অনুমান করতে পেরেছিল।

কার্ডটা দেখার পর কয়েক মাস চলে গেল। তার পর একদিন শান্তারামের হাতে 'চন্দ্রিকা' মাসিক পত্রের একটা সংখ্যা তার নজরে এল। সচিত্র এক কাহিনী সেটাতে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিকে আবার দৃষ্টি গেল। আর তা-ই নয়, গল্পটা বেশ মশলাদার এ কথাটা কলেজে যুবমহলে খুব উঠেছিল। তাই আবার মনটা সেদিকেই ধাবিত হয়েছিল।

গল্পটা পড়ার সময় আবার সন্দেহ হল এটা কালিন্দী লেখে নি তো? কখনও কখনও কালিন্দীর ঘরে এলে তাকে দেখা যেত কোনও গল্প বা কবিতা লেখায় সে ব্যস্ত। আবার দৃষ্টিতে সে-সব যেন না পড়ে, সেজন্য সে লুকিয়ে ফেলত সব চট করে। আবার ধারণা ছিল যে সব কবি বা লেখকরাই এ ধরনের লুকিয়ে চুরিয়ে কাজ করায় অভ্যস্ত।

আবা যে গল্পটা পড়েছিল তার প্রথম পঙ্‌ক্তিটা ছিল সুপরিচিত। সমস্ত ব্যাপারটা তার ভালরকম জানা ছিল। গোড়ায় যখন এরকম সহজভাবে লেখা কিছুতে দৃষ্টি পড়ত তখন কালিন্দী গল্প বা নিবন্ধ লিখছে সে বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগত। তার মানে হল যে কিছু

হয়তো কালিন্দী কল্পনা করে লিখেছে কিন্তু নিশ্চয়ভাবে কিছু খাড়া করে উঠতে পারে নি।

যখন আবা লেখাটা দেখল তখন তাতে কোনও শিরোনামা ছিল না। প্রকাশিত লেখাটার শিরোনামা ও প্রথম অনুচ্ছেদটা এরকম :

একটি প্রশ্ন

"কলঙ্কিনী !! কি করবে ? কৃত অপকর্মের জন্য আপনার জীবন ধীরে ধীরে হোমাগ্নির মত ক্ষয় করে দেবে, না জীবনপাত করবে ? স্বীয় সব অনাচার গোপন করে নিজেকে পবিত্র বলে জাহির করে ছলে কৌশলে বিয়ে করবে কোনও নব্যযুবককে, নাকি অল্পবয়সে কোনও গর্হিত কর্ম করে ছিলে ? তা-ই জীবনভর চালিয়ে যাবে ? হে পাঠক, এই প্রশ্নটির খুব বাস্তবানুগ জবাব দেবার সাহস কি আপনার আছে ?"

আবা এ পর্যন্ত পড়েছিল। এ কি কোনও নিবন্ধ কিংবা গল্পের ভূমিকা তা সে ভেবে উঠতে পারে নি। কিন্তু আজ কিনারা হয়েছে এ রহস্যের। একটা গল্পেরই প্রথম অনুচ্ছেদ এটা। পরের অংশটা ছিল এরকম :

"আমার প্রশ্নের জবাব দেবার কোনও চেষ্টা আপনি আদৌ করছেন কি ? তা হলে স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিন। উত্তরটা যাতে আপনি দিতে পারেন আর এ-সংসারের একটা খাঁটি ছবি আপনার সামনে তুলে ধরা যায় সেই উদ্দেশ্যে একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ আপনাদের সামনে রাখছি।

"আমার বান্ধবী উপেন্দ্রবজ্রা খুব দুঃখে কালাতিপাত করছিল। এই দুঃখের সত্যি কারণটা ছিল নিতান্তই বাস্তব, তা নইলে আমার পরিচিত অনেক যুবতীই পূর্ব-জীবন এ ধরনের হওয়া সত্ত্বেও যেমন

আনন্দে দিনাতিপাত করছে, এ বন্ধুটিও তেমনই করতে পারত। এই উপেন্দ্রবজ্রার অবস্থা বা পূর্ব-জীবনের কাহিনী কী আর বলব? তার ডায়েরির অংশবিশেষ এবং কিছু পত্র-বিনিময় পাঠকের সামনে তুলে ধরছি। কাহিনীর সবটাই এ থেকে বোঝা যাবে।"

এপর্যন্ত ছিল ভূমিকা। ডায়েরির উদ্‌ধৃতাংশ ক্রমাঙ্ক অনুযায়ী সাজানো আর নীচে 'নয়দেব ভগনি' বলে স্বাক্ষর রয়েছে। নামটা শ্লেষাত্মক। ন্যায়-প্রার্থী দুর্ভাগিনী কোনও রমণীরই নাম বলা যায় এটাকে। 'নয়দেব' যমেরই এক নাম। যমের কোন যমুনা অর্থাৎ কালিন্দী সেটা হল এর অন্য অর্থ।

কাহিনীটার পুরোপুরি উদ্‌ধৃতি সম্ভব নয়, তবুও কিছু কিছু অংশ দেওয়া গেল।

(1)

(11 জুন 1925 তারিখের ডায়েরির অংশ)

আজ যে চিঠিটা এল তার মানেটা কি? তবে কি মেয়েদের কাছেও ওরকম চিঠি আসে?

ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের হয় বৈকি। তবে ছাত্ররা সাহস করে না। যারা করে তাদের মন্দ ভাবা হয়। কিন্তু কেন সেটা? আজ যে চিঠিটা এল তার কী জবাব দেব? না কি আরও কাউকে দেখাব এ-চিঠি?

ইচ্ছা হচ্ছে দেখাতে, কিন্তু বাড়ীতে বয়স্ক কারুর নজরে যদি পড়ে এ-চিঠি, তবে তারা এর কদর্থ করবে। বাবা বলবে যে আমিই হয়তো সে ছেলেকে প্ররোচনা দিয়েছি, তা নইলে এ-পত্র আসে কি করে? চিঠিটা দেখানো যায় এমন কোনও বন্ধু বা বোন কেউ নেই, এটা অত্যন্ত আক্ষেপের কথা।

(2)

13 জুন 1925

সশ্রদ্ধ নিবেদন,

আপনার চিঠিটা পেলাম। আপনি আমায় পত্র লিখেছেন, এ ব্যাপারে আমার মোটেই আপত্তি নেই। আমাদের সমাজে যদি সমবয়স্ক শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করানোর রীতি এতাবৎ চালু না হয়ে থাকে, তবে তারা নিজেরাই পরস্পর পরিচিত হবার চেষ্টা করুক। এ ব্যাপারে শুরুটা তো একভাবে না একভাবে করতেই হবে। মেয়েরা এগিয়ে এসে পরিচয় করার চেয়ে পুরুষই সেটা করে, তাই শ্রেয় মনে হয়। মেয়েরা ছেলেদের বা ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টাটা এখনও সমাজে গর্হিত কর্ম বলে গণ্য। এমন অবস্থায় যুবক-যুবতীদের পুরাতন ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রয়োজন আর তাতে নেতৃত্বদান করতে হবে পুরুষদেরই।

কোনও মেয়ের সঙ্গে ছেলে কেউ পরিচয়ের চেষ্টা করলে বদনাম বা হানি তার যা হয়, তার চেয়ে মেয়েরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-কারণে শুরুটা পুরুষদেরই করা উচিত। সেদিক থেকে দেখলে আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে-চেষ্টা আপনি করেছেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। লাইব্রেরিতে যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকেন, তবে এ-পরিচয় বৃদ্ধি পাবে নিশ্চয়ই।

আপনি কারণ দর্শিয়েছেন যে মেয়েদের ভাবনা-চিন্তা আপনার জানার বাসনা এবং সে-কারণেই পরিচয়টা আরও গভীর হওয়ার আপনি পক্ষপাতী। কিন্তু এ-কথাটা আমার কাছে 'অ্যাপোলজেটিক'

(কৈফিয়ৎ বা মাপ চাওয়ার মতো) মনে হচ্ছে। মেয়েদের সঙ্গে যদি পরিচয় গভীরতর করতে হয় তার জন্য এত 'অ্যাপোলজি' (সঙ্কোচ) কেন ? যদি অনুচিত কিছু বলেন তা হলে তা স্পষ্ট করার বৃথা প্রয়োজনের কথাটা আসে। ব্যাবহারিক ভাবে ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় নিষ্প্রয়োজন এরকম ভেবেই হয়তো একটা কারণ খাড়া করার চিন্তাটা আপনার মনে এসেছে। সম্ভবত পারিপার্শ্বিকেরই প্রভাব এটা। মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা তাদের স্নেহ পাওয়ার জন্য ব্যাবহারিক কারণের কি আদৌ প্রয়োজন রয়েছে ? একই ধরনের কর্মে লিপ্ত সমবয়স্ক ছেলে আর মেয়ের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অধিকার এমনিতেই রয়েছে বলে আমার ধারণা।

আমি যা কিছু বলছি, জানি বেশী বয়সের নারী-পুরুষের কাছে তা গ্রহণীয় হবে না। তবুও সমান বয়সের ছেলেমেয়ের একে অন্যকে জানার অধিকার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আগেকার সিঁড়িতে পুরানো চিন্তাই রয়ে গেছে। পরবর্তী দলের মধ্যে নবীনত্বের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন চিন্তা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু আগের সিঁড়ির প্রাচীনের দল যে-ধরনের অবস্থায় এগিয়ে গেছে আর যে-হিসেবে রীতিনীতি তৈরি করে গেছে, নতুনের দলকেও সেভাবেই সুসংবদ্ধ করতে চাইছি। নবীনকে এই সংঘর্ষে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। এই বিদ্রোহে পুরুষকেও যোগ দিতে আর স্বীয় কর্তব্য পালন করতে হবে।

আপনাদের

উপেন্দ্রবজ্রা

3

23.6.25

প্রিয় ভগিনী উপেন্দ্রবজ্রা,

ইণ্টার কলেজিয়েট ক্রিকেট-টিমে আমার নির্বাচনে আমায় আপনি যে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তা পড়ে আমি খুব আনন্দ বোধ করেছি। আমরা যা করি কেউ যদি তা সোৎসাহে পর্যবেক্ষণ করে তবে তা আরও ভাল করে করার উৎসাহ আমাদের মেলে।

আপনার নামটার কথা ভাবছিলাম। এটার মধ্যে একটা ছন্দ রয়েছে। ইন্দ্রের বজ্র তো পুরাণ-প্রসিদ্ধ। কিন্তু উপেন্দ্র অর্থাৎ বিষ্ণুর বজ্রের বর্ণনা তো কোনও পুরাণেই নেই!

পুরাণে উপেন্দ্রের বজ্রের বর্ণনা নেই তাই বলে উপেন্দ্রবজ্রা (ছন্দ) কম মধুর (শ্রুতিতে) তা তো নয়।

আপনাদের
নানাভাই

4

(24.6.25 তারিখের ডায়েরি থেকে)

—উপেন্দ্রবজ্রা কম মধুর নয় এ-কথা লিখেছে নানাভাই। একি সত্যি যে কেবল ছন্দেরই ব্যাপার এটা?

5

1.7.25

প্রিয় নানাভাই,

উপেন্দ্রবজ্রার নাম নিয়ে ঈষৎ শ্লেষ-সূচক চিঠিখানা পেয়েছি। চিঠিতে আপনি আমায় বোন সম্বোধন করেছেন, তাতে অভিমান হওয়াই উচিত, তবে আপনি উদারতা সহকারে আমায় ভগিনী-পদ দান করলেন আর নামটা আপনার নানাভাই— অর্থাৎ, নানা পুরুষ ও রমণীর ভাই, তাই আর অভিমানটা শেষ অবধি ততটা হল না। যে পুরুষ অনেক নারীরই ভাই হয়, তিনি বিশেষ একজন নারীকে ভগিনী বললেই সেই যোগাযোগকে এই নারী কি অভিনন্দিত করবে? আর সেটাই বা কতটা অবধি? জানি না আপনার কজন এমন মুখের ডাকের বোন রয়েছে! এটা জানালে আপনার এই বোন ডাকের জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রফেসর শঙ্খে আজ নতুন পাগড়ী পড়ে ক্লাসে এসেছিলেন। চারদিন পূর্বেই কেবল মেয়েরা তাঁর পাগড়ী নিয়ে আলোচনা করেছিল, ওরকমই শুনছি। মেয়েদের এই আলোচনা প্রফেসরের কানে পৌঁছয় আর বয়স্ক এই প্রফেসর নিজেকে মেয়েদের চোখে ভাল লাগে ভাবেন। আমার এরকমই অন্ততঃ মনে হয়।

আপনার

উপেন্দ্রবজ্রা

6

25.8.25

প্রিয় উপেন্দ্রবজ্রা,

আমাদের ফাইন্যাল ম্যাচটা বম্বেতে হবে। যদি সেটা দেখতে আসো, তবে বড় আনন্দ হবে আমার। চেষ্টা করে অবশ্যই বোম্বাই চলে এসো।

—নানাভাই

আমি নিশ্চয়ই যাবার চেষ্টা করব।

—উপেন্দ্রবজ্রা

7

30.8.25

প্রিয় উপেন্দ্রবজ্রা,

তুমি এ-ক্রিকেটম্যাচটা দেখতে বম্বে এলে না, এতে আমার খুব দুঃখ হয়েছে। এ খেলায় ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল তাই ছ'টা বাউণ্ডারী মেরেছি। প্রতি মারেই সে কি হাততালি! তোমার তালিটাই শুনতে পেলাম না। তাই আমার সমস্ত পরাক্রমটাই যেন ব্যর্থ হল মনে হচ্ছে। এবার কবে দেখা করবে?

সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছি। কী, আসব একদিন তোমাদের বাড়ী?

সাক্ষাতাকাঙ্ক্ষী
নানাভাই

৪

1.9.25

প্রিয় নানাভাই,

শীগগিরই আমি দেখা করব। তোমার ক্রিকেট পারদর্শিতা ও বিজয় অবলোকনের জন্য আমি বম্বে যাওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম। কিন্তু বাবা আমায় যেতে দিল না। আমি হতাশ হলাম। যদি নেহাতই কলেজের খেলা দেখার ব্যাপার হত তবে বাবা আমায় যেতে দিত। পরে যখন তাকে বললাম যে আমার একজন বিশেষ যুবক বন্ধুর খেলা দেখার জন্যই যেতে চাই বম্বে, তখন আর অনুমতি দিল না। কতখানি যে নিরাশ হয়েছি তা আর বুঝিয়ে বলতে পারব না। বাবা থেকে থেকে এই যুবকটি কে, তার বাবা কি করে বা আয় কত ইত্যাকার গোটা কয়েক প্রশ্ন করল। আমি বললাম যে তোমার বাবা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না আর জানার কোনও বাসনাও নেই। তখন বাবা বলল, "আরে পাগলী মেয়ে, ছেলেটি চালাক চতুর আর ভাল এ-ই যথেষ্ট নয়। ছেলের ভবিষ্যৎ তার বিলাত-গমন ও পড়াশুনার উপর নির্ভর করে। আর বিলাতে লেখাপড়ার ব্যাপারটা তার বাবার টাকা-পয়সার সঙ্গে সম্পৃক্ত।" আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার ভাবনা কেন? কেউ নিঃসম্বল বলে কি তার প্রতি স্নেহ-ভালবাসা জন্মানো উচিত নয়? বাবা বলল, "গরীবের সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক রাখা অনুচিত, কথাটা তা নয়। মেয়ের সঙ্গে কোনও ছেলের স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার আগে ছেলের আর্থিক অবস্থার খবর ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জেনে রাখা পিতার কর্তব্য। সব না জেনে মিশতে দেওয়াটা অনুচিত!"

আমার বাবার এই বস্তুবাদী চিন্তাটা কিন্তু আমার একেবারেই পছন্দ নয়, তবে এটুকু বেশ বুঝছি যে বাড়ীতে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে তুমি আসো, তবে সম্বর্ধনাটা বিশেষ সুবিধাজনক হবে না। বাইরেই বরং আমাদের দেখা সাক্ষাৎ চলতে থাকুক। লাইব্রেরিটা সাক্ষাৎকারের পক্ষে উপযুক্ত স্থান।

পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও
আপনার সঙ্গে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী
উপেন্দ্রবজ্রা

পুনঃ

বাবা কাল থেকে আমার সব চিঠিপত্র দেখতে আরম্ভ করেছে। তাই আমার চিঠি 'অবধায়ক, পোস্টমাস্টার, ডেকান জিমখানা' ঠিকানায় পাঠাতে থাকো। আমি ডাকঘরে গিয়ে সব নিয়ে আসব।

9

2.9.25

প্রিয় উপেন্দ্রবজ্রা,

তোমার চিঠিটা পড়ে একদিকে আমার যেমন খারাপ লাগল, আবার অন্যভাবে আনন্দও হল। তোমার আমার স্নেহ-ভালবাসার ব্যাপারে তোমার বাবার আক্ষেপ আমার পক্ষে দুঃখদায়ক। কিন্তু পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেও তুমি আমার প্রতি স্নেহশীল জেনে আমার কি আনন্দ হবে না? তোমার এই নিষ্ঠায় আমি আরও বেশী আনন্দিত বোধ করেছি।

আমাদের সাক্ষাৎকারের প্রশস্ত স্থান লাইব্রেরি—এই যুক্তি আমার কাছে যথাযোগ্য মনে হয় নি। এক, এই সর্বজন-অধ্যুষিত

জায়গায় মন খুলে কতটা কথাবার্তা আমরা বলতে পারব ? তা ছাড়া, কথাবার্তা যা বলব তা অনেকটা ফর্মাল অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়বে। লাইব্রেরিতে কথা বলার সময় অনেকেই লুকিয়ে চুরিয়ে আর ঈর্ষাসহকারে আড়ি পাতবে, কারণ ছাত্রীদের কৃপাদৃষ্টিলাভ বা তাদের সঙ্গে পরিচয়-প্রসার সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তোমার বাবার যদি অনিচ্ছাই থাকে যে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হোক, তবে লাইব্রেরীতে খোলাখুলি কথা বললে তোমার বাবার কানে খবরটা সহজেই পৌঁছে যাবে। তার জন্য আমার মতে, বাইরে কোথাও সাক্ষাৎ করা আর একটু ঘুরে বেড়ানোই সমীচীন।

তোমার সান্নিধ্যতৃষিত
নানাভাই

10

11.9.25

প্রিয় ইনানাভা,

আমার সঙ্গে বেড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছ, আবার জানতে চেয়েছ কোথায় দেখা হবে ? আমার বেড়াতে যাবার একটাই জায়গা সেটা খাল-পার। কখনও কখনও আমি 'আশাস্থান' বাংলো পর্যন্ত হাঁটতে যাই আবার ফিরে আসি সেপথেই। সময় সময় ভারত সেবক সমাজের কাছে পাহাড়ী চড়াই পর্যন্ত বেড়াতে যাই। লাইব্রেরিতে দেখা করতে বা কথা বলতে তোমার ভাল লাগে না কারণ তাতে আমার ওপর অনেকের দৃষ্টি এসে পড়বে এটা পড়ে আমার খুব আনন্দ হল। ছেলেদের সঙ্গে প্রাণোচ্ছলভাবে কথা

যদি কোনও মেয়ে বলে তবে সেটা অন্যদের গল্প করার বিষয় হয়ে ওঠে আর মেয়েদের সঙ্গে কথা-বলা ছেলে একটা মজার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এসব জেনে বেশ মজা লাগছে।

ছাত্রীদের নিয়ে হাসি-মস্করা কোনও কাজের কথা নয়। ছেলেরা যে তাদের মধ্যে কেউ মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে বা প্রেম-ভাল-বাসার সম্পর্ক পাতালে ঈর্ষান্বিত হয় একথা জেনে পুলকিত বোধ করছি। ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করছি যেন এরকম ঈর্ষা আরও বেড়ে যায় ছাত্রদের মধ্যে। কিছু কিছু মেয়ের ধারণা যে প্রেমের ব্যাপারটা লুকিয়ে চুরিয়েই করতে হয় আর যার সঙ্গেই তা হোক, সেটাও ক্ষণিক আনন্দের জন্যই। আর বাবা যার সঙ্গে স্থির করবেন, বিয়েটা হবে সে-ছেলের সঙ্গে। কোনও কোনও ছাত্রী আবার ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে অগ্রসর হতে সোৎসুক নয়, কারণ তাদের ধারণা প্রথম পরিচয়ের পর ছেলে প্রেম নিবেদন করবে আর তারপরেই জানাবে বিয়ের প্রস্তাব। অন্য মেয়েরা পরিচয় করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কেবল ক্ষণিক মনোরঞ্জনের জন্যই। নাটকে ধরনে এদের ভালবাসার কথা বলতে বা শুনতে আনন্দ হয়। এখনও অনেক মেয়ে তাদের আই. সি. এস. স্বামী হবে এ-চিন্তায় বিভোর। এ সত্ত্বেও জানাই যে, ভারত সেবক সমাজের পোলটার ওপরে দেখা করব। সেখানেই এসে বোসো। সেখান থেকে ঘুরতে যাব।

তোমার বন্ধু
উপেন্দ্রবজ্রা

11

15.11.25

প্রিয় নানাভাই,

তুমি দেওয়ালীর ছুটিতে বাইরে চলে যাওয়ায় আমার সে সময়টা খুব নীরস ও নিঃসঙ্গ কেটেছে। তোমার সহাস্য সম্ভাষণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে যেদিনই তোমার সঙ্গে দেখা না হয়, সেদিনটাই আমার বড় নীরস মনে হয়। তুমি সঙ্গে থাকলে আনন্দে কাটে সময়টা। আমরা যে ঘুরে বেড়াই সেটা কারুর কারুর অপছন্দ আর বাবার কাছে তাই বেনামী চিঠি আসছে। বাবা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করেছে আমি জবাব দিয়েছি যে গেছি দু-একবার নানাভাইয়ের সঙ্গে ঘুরতে। তারপর বাবা তোমার সঙ্গে বেড়াতে আমায় মানা করে দিয়েছে। তাই রোজ আর বেড়াতে যেতে পারি না। তবে কখনও কখনও যেতে পারব।

তোমার সংবাদাকাঙ্ক্ষী
উপেন্দ্রবজ্রা

12

12.12.25

আর তুমি আমায় চিঠি লিখো না। আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি কতখানি নীচ। একটি কুমারী মেয়ের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠ হয়ে কুমারীত্ব নাশে তৎপর হলে, এই নীচতাটা যদি আগে অনুমান করতে পারতাম তবে তোমার সঙ্গে কখনও বেড়াতে যেতাম

না। আমার ধারণা ছিল যে তুমি ভব্য সজ্জন। এখন আমার ভুলটা ভেঙেছে। যখন তুমি চুম্বনের জন্য আমার সমীপবর্তী হলে সেটা আমি মেনে নিয়েছিলাম। তখন তোমায় মানাও করেছিলাম, কিন্তু তবু আবার পাগলীর মতো সব ভুলে তোমার সঙ্গে বেড়াতেও গেছি। আমার মনে হয়েছিল যে শারীরিক নৈকট্যে চুম্বনের অধিক তুমি অগ্রসর হবে না! ঈশ্বরের অসীম কৃপা তিনি তাকিয়েছিলেন আমার প্রতি, তাই অন্য লোক এসে গিয়েছিল সেখানে—তারপর আমার আর তোমার সঙ্গে যাওয়া উচিত হয় নি। না, আমি আর একা কোনও পুরুষের সঙ্গে বেড়াতে যাব না। তোমার মতো নীচ পুরুষের সঙ্গে আর পরিচয় রাখার প্রয়োজন নেই। আর কখনও আমায় চিঠি লিখো না। তুমি একটি মনুষ্যরূপী পশু বিশেষ।

উপেন্দ্রবজ্রা

13

14.12.25

প্রিয় উপেন্দ্রবজ্রা,

আমি তোমার কাছে পুরোপুরি অপরাধী তবে তুমি আমায় যতটা খারাপ মনে করছ, ততটা আমি নই। যখন আমি তোমার চুমু খেলাম, তখন আমার কাছ থেকে ছিটকে সরে গিয়ে তুমি রাগ প্রকাশ করলে আর আমিও স্থির করলাম যে এমন ব্যবহার আমি কখনই আর করব না। চুমু খাওয়ার আগে আমি নিজেকে কতখানি সংযত রেখেছিলাম, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এইটুকুই বলব যে ঔচিত্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার

জন্য আমায় তুমি ক্ষমা করো। মাত্রা ছাড়িয়েছি কেবল তোমার প্রতি আমার অন্তহীন প্রেমের কারণেই। তোমায়-আমায় পার্থক্য বিশেষ নেই। আমরা এক, সততই ভাবনাটা বেড়ে চলুক। আমি মনে করি, পরস্পরকে ভিন্ন ভাবার এই চিন্তাটা আমাদের শেষ হোক। তুমি আমায় নীচ ভাবো বা গালমন্দ করো, তাতে আমার ভালবাসাটা কিন্তু কমবে না। কথাটা এই যে আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি। আর প্রেমের ব্যাপারে মাত্রা ঠিক রাখার জন্য আত্ম-সংযম প্রয়োজন। আমার চেয়ে সেটা তোমার মধ্যে বেশী রয়েছে। আমি স্বীকার করছি যে এ-বিষয়ে আমার চেয়ে তুমি অনেক উঁচুতে। এরকম মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ভাবতেই অহংকার জাগে আমার মনে। সংযম আমার মধ্যে কম বলেই যে আমি নীচ এ-কথা আমি মানি না। সংযম বেশী বলে তোমার প্রতি আমার ভালবাসাটা দ্বিগুণ হয়েছে। দেখা হোক আর না-ই হোক, মনে আমার তোমার জন্য প্রেম নিরন্তর থাকবে। এমনকি, এ-ও আমি বলব যে মাত্রা ছাড়ানোর কারণ এই যে তোমার চেয়ে আমার মধ্যে প্রেমাবেগ অনেক বেশী। এটুকু তোমায় বলব যে এর পর তোমার সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক-ব্যবহারই করব। আমার নীচতা সম্পর্কে তোমার মনে যে ধারণা জন্মেছে সেটা দূর করো। তোমার সঙ্গে একত্র সময়-যাপনে আমার মন উচ্চ ভাবনায় ভরে ওঠে। তুমিই আমার সংস্কারিকা। যখন তোমার ভালোবাসা আর উচ্চ ভাবনা আমি সদাসর্বদাই পাব, তখনই হবে আমার সুদিন। ইতি—

অত্যন্ত প্রেমপূর্বক
নানাভাই

(14)

20.12.52

উপেন্দ্রবজ্রা,

এখনও কি তোমার রাগ কমে নি? সত্যি কি তুমি মনে করছ যে আমি একটা দুশ্চরিত্র? প্রেমের কারণেই যে আমি ঔচিত্যের মাত্রা ছাড়িয়েছিলাম সে-কথা তোমায় জানিয়েছি। কলেজে এসে বা আমায় দেখেও তুমি কেন আমার সঙ্গে অপরিচিতের মতো ব্যবহার করো? না, তুমি আমার অস্তিত্ব স্বীকারেই নারাজ! আমার তবে প্রেমে সিদ্ধি কি করে হবে? পূর্ণতায় পৌঁছানোর মতো মহাপুরুষ আমি নই। সব মানুষই দুর্বল। আমিও তাই। আমার মানবিক সব দুর্বলতার কারণে আমায় বাতিল করে দেবে তুমি? হতে পারে আচরণের সম্পর্কটা চিড় খেয়েছে, কিন্তু আমি তো সেজন্য অন্য কোনও রমণীর সঙ্গে প্রেম বা পরিচয়ে অগ্রসর হই নি। মর্যাদা-ক্ষুণ্ণকারী হতে পারি, তবে আমি একনিষ্ঠ। উপেন্দ্রবজ্রা, তুমি খালি তিরস্কারই আমায় কোরো না। আমায় যদি পাপী বলে ত্যাগ করো, তবে তুমি যে আমার চেয়ে অধিকতর সংযমী আর শুদ্ধচিত্ত আর-একজন যুবক খুঁজে পাবে, তার স্থিরতা কোথায়? আমার ধারণা, যে দোষ আমার রয়েছে, তা অন্য অনেকেরই আছে। তাই বলি, আমায় তুমি ক্ষমা করো আর আগেকার সেই সপ্রেমদৃষ্টিতে তাকাও।

তোমার ক্ষমাভিক্ষু
নানাভাই

(15)

27.12.20

প্রিয় উপেন্দ্রবজ্রা,

আমার চিঠির জবাব দিচ্ছ না কেন? আমার একটু ভুলের জন্য এতটা নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন? তোমার কি তবে ধারণা যে আমার মনে ভালো কিছুই নেই? যদি তা-ই তোমার মনে হয় তবে আমি উপায়ান্তরবিহীন। তাই যতক্ষণ-না তুমি মত পরিবর্তন করছ ততদিন আমায় পথ দেখতে হবে। তবে তোমার যদি মনে হয় যে শুভ-চিন্তা কিছু আমার মধ্যে রয়েছে— অবশ্য শরীরে সংযমের অভাব এবং যদি ভয় জাগে মনে, তবে আমরা একলা চলাফেরা না-হয় একেবারেই বন্ধ করে দিই। আবার লাইব্রেরির মতো কোনও প্রকাশ্য স্থানেই দেখাসাক্ষাৎ করব আমরা। সবার সামনে যে-সব কথা বলা চলবে না, সেগুলো পত্র মারফৎ সারা যাবে। কিন্তু তোমার ক্রোধ তুমি ত্যাগ করো। আবার আমরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকি আর প্রেমিকযুগলের মতো না হলেও, বন্ধুর মতো আচার-আচরণে কি তোমার আপত্তি? অন্ততঃ আমার এই ইচ্ছাটা তো মেনে নাও। এখন আমি হৃদয়ংগম করছি যে তোমার সান্নিধ্য-বাসনাটা আমার কতখানি প্রবল। একান্ত মিলনাকাঙ্ক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আমার অন্তরের উৎকটতাটুকু জানা। এটুকু জানার পর গোপন মিলনের প্রয়োজনটা কম এখন। যতক্ষণ না জানাচ্ছ যে তোমার রাগটা পড়েছে, ততদিন পর্যন্ত আমার দুঃখটা থাকবেই।

তোমার ক্ষমাভিক্ষু
নানাভাই

(16)

1.1.26

প্রিয় নানাভাই,

সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাভিক্ষা করে লেখা তোমার পত্র পেয়েছি। তাতেই তোমার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে এল আমার। তবুও তোমায় কোনও উত্তর পাঠাই নি, কারণ নিজেরই আমার এ-ব্যাপারে সংশয় ছিল। অনুচিত ব্যাপারে প্রতিকারের ক্ষমতা আমার খুবই কম। আমার সেরকমই মনে হচ্ছিল। নীরব থাকা ও পরিচয়ের ব্যাপারে ইতস্তত-ভাব হয়তো এর কারণ। যখন আমরা একা আর শুধু নিজেরাই কেবল, তখন নৈকট্য-সুখে আমার এ চিন্তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার সংযম বা রুখবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসছে, আমার মনে হচ্ছিল। তোমার সঙ্গে একা বেড়ানোটা আগেই আমার বন্ধ করা উচিত ছিল। তবে আমি তোমার উদারতা, আত্ম-সংযম আর নারীর প্রতি উচিত আচরণের উপর আস্থা রেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে যে-রকম ব্যবহারের ফলে আমার স্ব-নির্ভরতা কমে যাবে, সেরকম কিছুই তুমি করবে না। কিন্তু গত পরশুর ঘটনায় সে বিশ্বাস আমার টুটে গেছে। আমি জেনে গেছি যে আমার মতো তুমিও সংযম হারিয়ে ফেল। তুমি সে কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছ। এক হিসেবে ভালোই হয়েছে যে যদি আমার চেয়ে তোমার মনের জোর আর স্বীয় ভাবনা-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বেশি, সেই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে থাকতাম, তা হলে এরকম ঘটনা থেকে তোমার ব্যবহারের একটাই অর্থ হত যে আমায় নিরিবিলি পেয়ে পেয়ে তুমি আমার কুমারীত্ব নাশের চেষ্টায় মেতেছ। কিংবা

সে ধরনের সুযোগ তুমি খুঁজছ। তোমার দুর্বলতার কথাটা আমার জানা ছিল না। আর সেই অনুমানেই তোমায় অনুকম্পা মিশ্রিত চিঠিটা লিখেছি। আমার দয়া-অনুমানটা মিথ্যা ভেবে নিয়ে ক্ষমা করো আমায়।

আমাদের দুজনের মনের দুর্বলতা জেনে নিয়ে ভালো পথই তুমি খুঁজে নিয়েছ। সকলের সামনেই আমাদের সাক্ষাৎ, কি একান্তেই থাকি আমরা, এটা স্থির ধরে নিতে পারো যে পত্র-বিনিময় আর দেখা-সাক্ষাতে আপত্তির কিছু নেই।

আজ বছরের পয়লা। নতুন করে সব স্থির করার উপযুক্ত দিন।

উপেন্দ্রবজ্রা

17

14.2.26

প্রিয় উপেন্দ্রবজ্রা,

আমার নিজের মন আমার বেশ ভালো জানা আছে। তোমার ব্যাপারে কখনও কোনও মাত্রা লঙ্ঘন যতটা না হয়েছে, পরিচয়টা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের মধ্যে আর কেউ না আসুক, জীবন আমাদের এক হয়ে যাক। এর জন্য হয়তো কামদেবই এভাবে স্থির করেছেন— কথাটা সেভাবে গ্রহণ করছ না কেন? কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আমিও মনস্থির করি নি এখনও। আমার সংসারের অবস্থা তোমার জানা আছে। বি. এ. পাস করে তবেই আমি বিয়ে করব। আমার ভয় হয় যে এখনই করলে হয়ত বা বি. এ.তে আমি ফেল করব। গুজরাতীদের মধ্যে

আগে বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়া আর বছর কয়েক বাদে বিয়ে হওয়ার রীতিটা আমার ভালো লাগে না। এই কারণেই তোমায় কোনও বাঁধনে বেঁধে রাখতে চাই না। আমার ভালোবাসা তোমার প্রতিই— এ কথা সত্যি। কিন্তু কী কারণে তা জানি না, এখনই মগ্‌নী বা গ্রহণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ-এর ইচ্ছা আমার হচ্ছে না। আমার মতো গরিবের পক্ষে এ ধরনের ইচ্ছা বিশেষ রকম দায়-দায়িত্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

শিক্ষিত মেয়ের দায়িত্ব গ্রহণে ভীত
নানাভাই

(18)

1.9.28

প্রিয় উপেন্দ্রবজ্রা,

আমাদের এই অফিসে অনেক রহস্যেরই কূল-কিনারা পাওয়া যায়। অনেক মজার মজার গল্প শুনি আমি। একজন পার্সীর স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করার জন্য আমাদের মক্কেল হয়েছেন। স্বামী বিশ্বাসঘাতক ব্যভিচারী প্রমাণের উদ্দেশ্যে তিনি বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ জড়ো করেছেন। তবুও তা প্রমাণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রমাণ স্বরূপ, তিনি উল্লেখ করেছেন যে সন্ধ্যার পর তাঁর স্বামীটি অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে বেড়াতে যায়। দুজনের মেলা-মেশার একটা খুব সুন্দর জায়গা তারা বেছে নিয়েছে। নেপিয়ান সী রোডে অনেক বাংলো খালি পড়ে রয়েছে। মালীই এ-সবের পাহারাদার, আর কেউ বাংলো দেখতে এলে তাদের দেখাতে

হয়। ঘুরে দেখার অজুহাতে এবং বাড়িতে ঢুকে কিছু পয়সা দিলে মালী ভাড়াটেকে দু-তিন ঘণ্টা বেশ মজা করে সময় কাটাতে দেয় বাংলোর ভেতর। পার্সী মহিলাটি এ-সব কথা বলায় পাব্লী ডি সুজাটা ওঁকে জিজ্ঞাসা করল যে এত ব্যাপার তিনি জানলেন কেমন করে। গম্ভীর হয়ে সে প্রশ্নটা করেছিল। পার্সী মহিলাটি তাতে রাগত হয়ে উঠলেন : "এ-সব প্রশ্ন করতে তো আপনাকে আমি বলি নি। আমার বিবৃতি নেওয়াটা আপনার কাজ নয়। আমার স্বামীর বিরুদ্ধেই তো মামলার দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন। নয় কি ?" তিনি ডি সুজাকে ধমক দিলেন। মাপ চেয়ে সে বলল, "সে অর্থে কথাটা আমি জিজ্ঞাসা করি নি। আদালতের দৃষ্টিতে সব পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যেই কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি। আমি আপনারই দিকটা দেখছি, আপনার স্বামীর নয়।" শান্তভাবে তখন সেই পার্সী মহিলাটি ডি সুজাকে বললেন, "সত্যি কথা বলতে আমার কোনও আপত্তি নেই। স্বামীর সঙ্গে আমার বাক্‌দান হয়েছে, কিন্তু বিয়ে হয় নি। তবে বছর তিন-চার থেকেই এই ব্যবস্থায় চলেছি। এ কথা" শুনে ডি সুজা জিজ্ঞাসা করল, "বিয়ের আগে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বামীর সঙ্গে কি কথা কিছু বলেছিলেন ?" তখন তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।" আবার জিজ্ঞাসা করল ডিসুজা, "আচ্ছা, যখন আপনার স্বামী আপনাকে খালি বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দিল, তখন কি কোনই সন্দেহ জাগে নি আপনার মনে ?" এতে খুবই বিরক্ত হয়ে পার্সী মহিলাটি বললেন, "সন্দেহ হলেই বা কি ? পুরুষদের মধ্যে পুরোপুরি নীতিবাদী আদৌ আছে কি কেউ ? কোনও পুরুষ যদি বলে যে হ্যাঁ, আমি নীতিবাদী, তা হলেও সে কথা আমি বিশ্বাস করব না। আর পুরুষদের যে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে বা তারা শোনা কথার দাম দেয়, তার প্রমাণ কি ? সেজন্য পুরুষ নীতিবাদী বলে

ধরে নেওয়াটাই ভালো। আমিও তাই "ভাড়ার জন্য বাংলো বাড়ি"তে যাবার আগেই জানতাম আমার কোনও এক বান্ধবীও বাক্‌দানের দিনেই বাংলোর ব্যবস্থা করেছিল। যেমন শোনা কথার ভিত্তিতে বাংলোব্যবস্থার কথাটা আমার গোচরে এসেছিল, সেরকম কিছু যে আমার স্বামীও আগে জানত না, তা কি আমি বলতে পারি? মনের আত্মতুষ্টিটা কেন বিঘ্নিত করি। আরও মনে করুন, জিজ্ঞাসা করার পর স্বামী যদি আমায় বলত যে আমি আরও অনেক রমণীর সৌন্দর্য-সুধা উপভোগ করেছি, তা হলে হীনম্মন্যতা জাগবে, কারণ বাক্‌দান ছিন্ন করতে আমি সক্ষম ছিলাম না।" গোড়ায় আমার এই পার্সী মহিলার কথায় চমক লেগেছিল। পরে সেগুলো আর তেমন খারাপ লাগে নি। বাক্‌দানের পরেও আর্থিক অক্ষমতার দোহাই পেড়ে বিয়ে ঠেকিয়ে রাখার চিন্তাটা সবার তরফেই উঠছে। মেয়েরা এটাকে খুব খারাপ বলে না। বরং এভাবে ভাবী স্বামীকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তারা রাখে আর অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাটাও বন্ধ থাকে। বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতেই এ-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বিয়ে করলে, নিজের সমাজের বা অন্য কোনও আত্মীয়ের তুলনা-মূলক মাপকাঠিতে জীবন-যাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্ততঃ 400 টাকা প্রয়োজন। কিন্তু এত তো পাওয়া যায় না। তাই বিয়ে স্থগিত রাখতে হয়। কিন্তু বিয়ে স্থগিত রাখলেও মানুষের শারীরিক ধর্মকে বাধা দেওয়া চলে না। পরিস্থিতিটা বাঞ্ছনীয় নয় তবে নেহাৎই অপ্রতিরোধ্য। সেজন্য এরকম ব্যবহার যারা করে তাদের দোষ দেওয়া চলে না। এ ব্যাপারে শিক্ষিত মারাঠি মহিলাদের মনোভাবটা আমি ঠিক জানি না। তবে ইউরোপগামীদের প্রেম-ভালোবাসার ধরন-ধারণটা ভিন্ন। আবার বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যাও কত কম। যারা বেশি দিন সেখানে কাটান, তাঁদের

মধ্যে এজাতীয় ঘটনার আধিক্য দেখা যায়। আমার বিচারে এরা মূলত লোক খারাপ নয়, তবে অবস্থার দাস।

তোমার আগামী জীবন মধুময় কল্পনাকারী
নানাভাই

(19)

30.10.28

প্রিয় নানাভাই,

নিজের অফিসের নানা কথা জেনে তোমার আনন্দই হয় না ঘৃণাও জাগে? আমার মনে হয় গোড়ায় হয়তো মজা মনে হয়, পরে কিন্তু ঘৃণাই জাগে। সেই পার্সী মহিলা বাক্‌দানের পর গোপনে ভাবী স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। গল্পটা জেনে নেহাৎই কঠোর হয়ে তার ভাগ্য কিছু করনি তুমি, সেটা বুঝে আমার ভালো লাগল। নিজের পুরানো দিনের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়েছে আর আমরা যে দুজনে নিরালায় ঘুরে বেড়াতাম সে কথা স্মরণ করে স্বীয় দুর্বলতার কথাটাও নিশ্চয় তোমার মনে উঁকি দিয়েছে। যে নিজে এত দুর্বল সে অন্যকে আঘাত করে কি বুদ্ধির কাজ করছে? মেয়েদের মনেও সেই একই দ্বিধা। ভাবী স্বামীর কামনা জাগ্রত হওয়ার পর যদি তা প্রশমিত করার চেষ্টা না করে এবং ফলে স্বামী যদি অন্য ভ্রান্ত মেয়ের কাছে চলে যায়, একারণে সে নিজেই রাজী হয়। এ-ও ঠিক যে বাক্‌দানের সময় মেয়ে ও ছেলে উভয়ের মধ্যে

যে ধরনের মনোভাব থাকে তা খুবই উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী আর তা-ই যদি দুজনে প্রাক্-বিবাহকালেই বিবাহোত্তর সম্বন্ধে লিপ্ত হয়, তা হলে আশ্চর্যের কী আর আছে ?

নারীর কর্তব্য সম্পর্কে
মানসিক দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ তোমার
উপেন্দ্রবজ্রা

(20)

2.1.29

প্রিয় নানাভাই,

চার বছর ধরে আমাদের পরিচয়। আমি ছিলাম প্রিভিয়াস ক্লাসে আর তুমি বি. এ.তে। সে-সময় পরিচয়ের সূত্রপাত। আমি সদ্য সদ্য কলেজে ঢুকেছি আর প্রথম দর্শনেই তোমার মনে প্রেমের উদয় হল— ছুতোনাতা করে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলে। এ কথা পরে আমায় তুমি বলেছিলে। ১৯২৬ সালে বি. এ. পাস করার পর তুমি আমায় বললে যে শীগ্‌গিরই রুজি রোজগার শুরু করবে আর বিয়ে করবে আমায়। তোমার বাবা সে সময় তোমার বিয়ে স্থির করতে চেয়েছিলেন। তখন তুমি তাঁকে বলেছিলে যে তোমায় এখন বিয়ে করাতে হবে না। তখন আমায় যা বলেছিলে সবই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আমাদের জাত-পাত ও ঘর এক ছিল না আর পাছে সে কারণে তোমার বাবা আপত্তি তোলেন, তাই তুমি বলেছিলে 'এখন আমি বলেছি যে বিয়ে করব না। বিয়ের ব্যাপারে কেন অনাবশ্যক বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটির সৃষ্টি করি। রোজগার শুরু করি তখন বিয়ে করব।" কথাটা আমার খুব ন্যায্য মনে

হয়েছিল। তোমার প্রতি প্রেমের কারণেই স্বজাতির মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব আমি নাকচ করে দিয়েছিলাম। বিবাহোত্তর জীবনধারা সম্পর্কে আমার তোমার মধ্যে মত-পার্থক্য ছিল। তোমার বক্তব্য ছিল যে বিয়ের পর ঠাঁট-বাট করে থাকা যায়, এমন আয় হলে তবেই বিয়ে করতে হয়। আর আমার মত ছিল যে বড়োলোক হবার ধান্দায় না গিয়ে বিয়েটা আগে করে নেওয়া দরকার। গোড়ায় না-হয় বছর কয়েক গরিবীয়ানায় কাটুক, তারপর ক্রমে আয় বাড়লে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা যাবে। এ কথাটা তোমার একেবারেই পছন্দ হয় নি। আমার মনে হল বড়োলোকী করার পাগলামি তোমায় পেয়ে বসেছে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে মন তোমার কপটতায় ভরা।

কিন্তু নানাভাই, তুমি খুবই মন্দ, এরকম আমার এখনও মনে হয় না। তুমি অর্থলিপ্সু— তাই বিয়ের কথা দিয়ে এবং দুজনে শপথ নেবার পর তুমি অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে প্রবৃত্ত হচ্ছ। তোমায় আমি কেবল এটুকুই বলব যে মেয়েলোকের গভীর ভালোবাসাটা হেলাফেলার জিনিস নয়। তোমার উপর আমার অভিমান হয়েছিল আর ভালোবাসাটা আমার যথার্থই দৃঢ় ছিল, তাই অনেক যুবককেই প্রত্যাখ্যান করেছি। হতে পারে, যে মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ, সে আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী ও ধনবতী। কিন্তু প্রেমের গভীরতায় সে আমার সমকক্ষ হতে পারবে না। আমার ইচ্ছা জাগছে তোমার ভাবী শ্বশুর আর তোমার বউকে আমাদের প্রেমের কথাটা জানাই আর বিয়েটা বানচাল করে দিই। এ আমি অবশ্যই করব।

তুমি শঠ, তোমায় আমি ক্ষমা করতে পারি না। ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে মোহ তোমার মধ্যে এখন জেগেছে

তার হাত থেকে যেন তোমায় তিনি বাঁচান আর আমার নানাভাইকে আমার কাছে ফেরৎ দেন।

কল্পনা-প্রাসাদ থেকে পতনোন্মুখ
দুঃখিনী
উপেন্দ্রবজ্রা

1.3.29

উপেন্দ্রবজ্রা,

কী বলি তোমায়? বিয়ে করব বলে তোমায় কখনই আমি কথা দিই নি। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা আছে এটুকুই বলেছি। আর সেটা এখনও বলছি। কিন্তু কোনও লাভের প্রত্যাশায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ও আমার উপর অভিযোগ চাপিয়ে দিতে চাও, তবে আমায়ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। আমার সবগুলো চিঠিই তুমি আবার পড়ে দেখো। সে-সবের প্রতিলিপি আমার কাছে আছে। সে-সবের কোথাও আমি তোমায় বিয়ে করব বলে কথা দিই নি। তোমার মতো মুক্তাচারিণী স্ত্রীতে আমার প্রয়োজন নেই। আমি এ কথা স্বীকার করছি যে কার্লার ডাকবাংলোতে একসঙ্গে আমরা রাত কাটিয়েছি। এ কথাটা তুমি খোলাখুলি সবাইকে জানাতে পারো। তাতে আমার কোনও ক্ষতি হবে না। হলে তোমারই হবে। তাই বুদ্ধি যদি তোমার থাকে, তবে সে কথা প্রচার করতে যেয়ো না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রেখো যে ডাকবাংলোর খাতায় যে হস্তাক্ষর রয়েছে

সেটা যে আমারই তা প্রমাণ করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে। আমার বিরুদ্ধে যা-কিছু করতে যাবে তা-ই, তোমার পক্ষে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গের মতো হয়ে দাঁড়াবে। তোমার নাকটা নিশ্চয়ই কাটা যাবে তবে আমার যাত্রাভঙ্গ হবে কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। নাককাটা স্ত্রীলোক এসে সামনাসামনি দাঁড়ালেও কাজে সাফল্যলাভে সুবিধা হবে না। যে শকুন-শাস্ত্রে এ কথার উল্লেখ রয়েছে সে-বইটা আমি দেখেছি।

... ...

এর পর চিঠির যোগাযোগ রাখা নিতান্তই অর্থহীন।

... ...

হে পাঠক! এই সব পত্র-বিনিময় পাঠান্তে কী বলবেন আপনি? তবে কি উপেন্দ্রবজ্রার মন পাপপূর্ণ ছিল? নানাভাইকে একেবারে নীচ বদমাইশ-ই মনে হয়? আমার তো মনে হয়, উপেন্দ্রবজ্রার ভালোবাসা ছিল নানাভাইয়ের প্রতি। কিন্তু যখন সে সলিসিটরের ফার্মে আর্টিকল ক্লার্ক ছিল তখন ওখানকার কটা মেয়েবাজ কেরানি ওকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে। সেই ক্লাইন্টেল সেক্রেটারিটি যদি নানাভাইয়ের পথে এসে না হাজির হত তবে নানাভাই আর উপেন্দ্র-বজ্রার বিয়েটা হয়ে যেত। বিয়ে এত বিলম্বিত হত না। নানাভাই ও উপেন্দ্রবজ্রার একান্ত-বাসও হত না। সুখেই কাটত নানাভাইয়ের জীবনটা। নীতিবিকাশের চিন্তাটা হয়তো কিছুকাল কুরে খেত ভেতরটা, তারপর ছেলেরা যেমন মেয়েদের ওপর সব দোষ চাপিয়ে চিন্তার সমাধান করে ফেলে, তেমনি সে-ও করে নিতে

পারত। কিন্তু যে অপবাদটা আমার কানে পৌঁচেছে, সেটা অতি বিচিত্র। সাত হাজার টাকা বরপণ পাওয়ার পর যখন নানাভাই তার স্ত্রী সত্যবতী সম্পর্কে সব কথা জেনে যাবে, তখন তার একটা অনুশোচনা হতেই হবে। না হয়ে পারে না। স্বজাতিতে বিয়ে হবার পক্ষে বাধা ছিল সত্যবতীর। উইলসন কলেজে সে পড়ত। পরে এক ইহুদীর সঙ্গে সে পালিয়ে যায়। কিছু কিছু লোক বলে এ কথা। কেউ বলে বম্বেতে এক ছাপাখানা-মালিকের ছেলে পাগল হয়ে গেছে। সে ছিল ভাইশংকর ডিসুজার মক্কেল। সেই সত্যবতীকে প্রথম বিগড়ে দেয়। যখন মেয়ের বাবা ফৌজদারী মামলা দায়েরের ভয় দেখায়, তখন ভাইশকংর ডিসুজা আর এ-মেয়ে কোনও প্রকারে তাড়াতাড়ি বাবাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে থামিয়ে দেয়। ওর মাতাল বাপের হাতে এই দশ হাজার টাকাটা না দিয়ে একটা ট্রাস্ট বানিয়ে দেয় আর ডুই সলিসিটর তার ট্রাস্টি হয়। ওই অঙ্কের টাকা থেকে নিয়মিত একটা সুদ সে পেত। আর সেইভাবেই ছাপাখানার মালিকের ছেলেটির সে-মেয়ের হাত থেকে সকলের জ্ঞাতসারে রেহাই মিলেছিল। এর পর সে ছেলের মৃত্যু হয় আর মেয়েটিও মুক্তি পায়। পরে মেয়েটি শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করে। সেই ক্লাইন্টেল ক্লার্কটি ওর কাছে সুদ আদায় করতে যেত। সে-ই মেয়েটিকে সদ্‌বংশের একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। আর এইভাবেই নানাভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা বাবদ সে ডু হাজার টাকা ঘটকালি পায়। সত্যবতীর জীবনের পূর্ব-বৃত্তান্ত নানাভাইয়ের জানা ছিল। তবে নেহাৎ যৌতুকের লোভেই সে এ-মেয়েকে বিয়ে করেছিল, এমন মনে হয় না। সে-ও সম্ভবত ফেঁসে গিয়েছিল। তবে ভগবানের দরবারে সুবিচার তা যা-ই হোক কিছু আছে। কথা দেওয়া সত্ত্বেও যেমন সে

এক মেয়েকে উপেক্ষা করেছিল, তেমনি আর-এক ছল-কপট মেয়েই তার জন্য জুটেছে।

উপেন্দ্রবজ্রার কাহিনীটা কারোই বেশি জানা ছিল না। সে বড়ো দুঃখিনী— এমন কপট প্রেমিক তার বরাতে জুটল আর সেই কারণে তার কপালে এই দুঃখ। সত্যবাদী যদি সংসারে কেউ থাকে তা এই নানাভাই, এটাই তার মনে হয়েছিল। আর এখন তার মনে হল যে সংসারে কোথাও বিশ্বাস বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। এই কথাটা ভেবেই সে দুঃখিত বোধ করতে লাগল। এখন তার সামনে প্রশ্ন দাঁড়াল কী করবে সে? সে প্রবঞ্চিত হয়েছে! তা হলে অন্য কোনও পুরুষের কাছে নিজেকে পবিত্র বলে জাহির করে তাকে বিয়ে করাটা কি ওর উচিত হবে? যদি সে বলে যে তার পদস্খলন হয়েছে, তবে তা উপেক্ষা করে এই মেয়েকে বিয়ে করার মতো ঔদার্য কি আমাদের কোনও যুবকের মধ্যে রয়েছে?

এই কাহিনীটাতে লেখকের এধরনেরই উপসংহার ছিল। লেখাটা বার বার পড়ে সত্যব্রত ভাবতে লাগল, 'এই গল্পে সংসারের বহু অভিজ্ঞতারই প্রকাশ রয়েছে। কালিন্দী এত অভিজ্ঞতা কোথা থেকে সঞ্চয় করল? ব্যক্ত অভিজ্ঞতাটুকুর কতখানিই বা তার স্বীয় অভিজ্ঞতা-প্রসূত?' এই প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে তার মনে উঁকি দিতে লাগল।

যখন গল্পটা 'চন্দ্রিকা' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তখনই গল্পের সঙ্গে বোনের চরিত্রগত কিছু সম্পর্ক রয়েছে, এরকম ধারণা তার মনে ঠাঁই পেয়েছিল। এ-ও আবার মনে হয়েছিল যে শান্তারাম গুপ্তে আর কালিন্দীর মধ্যে একটা নীতিবহির্গত সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল আর এভাবেই তার নিজদেহ অপবিত্র ধারণা জন্মানোর ফলে বিবাহ-বন্ধনে কোনও যুবককে আবদ্ধ করা অনুচিত কর্ম হবে

এমন একটা চিন্তার উদয় তার মনে হয়েছিল কি? "আমার দেহ যদি অপবিত্র হয়ে থাকে তবে আমায় বিয়ে করতে নারাজ—এ কথা বলে দোষারোপ করার কোনও অধিকার আমার আছে কি? আমি নিজে অত্যন্ত সৎ ও পবিত্র যদি হয়ে থাকি তবে সেটা পূর্বপুরুষের পাপের ফলেই; সমাজে কোনও তরুনী গৃহীত না হলে দোষারোপ করা যেতে পারে। কিন্তু যে নারী নিজে কলঙ্ক-যুক্ত তার পক্ষে সমাজের তথা ব্রাহ্মণাদি বর্গের বিরুদ্ধতা সম্পর্কে অভিযোগ করার কোনও অধিকারই নেই। বিবাহ-প্রথার পবিত্রতা ক্ষুন্ন না হয় এ-ধরনের কর্তব্যই করণীয় আর যে-পথে এসব সম্ভব সেটাই যথার্থ পথ।" এ ধরনের চিন্তা কালিন্দীর মাথায় আসে নি তো? সে-সব কথাই আবা ভাবতে লাগল।

এই গল্পটার আলোচনাই বা কেমন হচ্ছে আর এ প্রসঙ্গে তার বোনের কাহিনীও লোকে জুড়তে চাইবে না তো? আবার মনের কোণে জিজ্ঞাসাটা এসে সন্ত্রস্তভাবে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করল। এই গল্পে কালিন্দীর আচরণ-বিষয়ে যে-ভয়টা তার চিন্তায় উঁকি দিচ্ছিল, সেটা তার মন তোলপাড় করে তুলছিল। তবুও সে অস্বীকার করতে চাইছিল বিষয়টা। আমার বোন নীতিবিগর্হিত যে সম্পর্কটাকে মেনে নিয়েছে, গোড়া থেকেই তার ভুল পদক্ষেপটা এর কারণ নয়। বর্ণসংকর মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হওয়াতেই হয়তো বা সে এরকমটি করেছে।

সত্যব্রত 'নয়দেব ভগিনী'র পুরো কাহিনীটাই পড়ল। তবে পূর্বা-ত গল্পের সঙ্গে পরিচয় ভালোরকম থাকার ফলে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই এই জয়দেব ভগিনী যে কালিন্দীই সেবিষয়ে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে এর সবটাই আত্ম-কথা কি-না সেটাই প্রশ্ন উঠেছিল তার মনে।

গল্পটা থেকে একটা কথা সত্যব্রতের মনে উদয় হল। এতে কিন্তু মেয়েদের যারা কুপথে চালিত করে, সর্বনাশ করে, সে সব যুবক সম্পর্কে কিন্তু খুব কঠোর বর্ণনা কিছু নেই। এই গল্পে সে-রকম যুবকের বিশেষ উল্লেখ না করে, কমিশনের প্রত্যাশায় যারা কাজ করে আর সে ষড়যন্ত্রের যারা শিকার হয়, কেবল সে ধরনের চরিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। ক্লার্ককেও খারাপ ভাবে দেখানো হয় নি। তার আর উপেন্দ্রবজ্রার পরিচয়ের ব্যাপারটা যদি আরেকটু বিশদ করা হত তবে ছবিটা আরো একটু কঠোর হতে পারত। তারপর ওর যৌতুক-লোভ ছাড়াও অন্য এক গুণ সেভাবে চিত্রিত করা হয় নি। এই দুটোর মধ্যে আরো খারাপ করার মতো তৃতীয় ব্যাপার 'বিলন' সম্পর্কে লেখিকা বিশেষ কিছু বলেন নি। যে-কোনো উপায়ে মেয়েদের কুমারীত্ব-নাশে তৎপর যুবক সম্পর্কে কঠোর মনোভাব না দেখিয়ে বরং সহানুভূতিই দেখানো হয়েছে।

সব জায়গাতেই দেখা যায় যে মেয়েদের সর্বনাশকারী যুবক দুষ্ট তথা নীচ হয়। আর বিশেষ পরিস্থিতিতেই এই যুবকেরা যুবতীদের কুমারীত্ব-নাশে প্রবৃত্ত হয়। তবে এ ধরনের প্রবৃত্তি যাদের তাদের মধ্যে সব যুবকই খারাপ নয়, আর যে সংবেদনশীল মানসিকতা-সম্পন্ন ছেলেকে চিত্রিত করা হল, এটা কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত কি প্রকাশ করা সম্ভব? অর্থাৎ নিজেকে সভ্য বলে জাহিরকারী পুণা-বম্বের উল্লেখ যার কথায় কথায় তাকে পুরোপুরি খারাপ বলা হল না বা কৃষ্ণবর্ণেও চিত্রিত করা হল না বলে লেখিকাকে দোষ দিচ্ছি আর সব সময়েই দিতে থাকব।

তবে 'নয়দেব ভগিনী' যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা নিতান্তই খাঁটি ব্যাপার আর সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়কও বটে। উপেন্দ্রবজ্রার কুমারীত্ব-নাশকারী নানাভাইকে খুবই বদমাইস দেখানো হলে সব কুমারীরই মনে হত যে যারা এই নাশকর্মে লিপ্ত হয় সবাই এরা লুচ্চা-

বদমাইস। (মনে হবে কিন্তু) আমার প্রেমিক খারাপ নয় আর সে-কারণে তার উপর পূর্ণ আস্থা বজায় রেখে তার সঙ্গে যেখানে বলবে সেখানেই যেতে পারি। কোনোই আপত্তির কারণ নেই। তা ছাড়া উপেন্দ্রবজ্রার প্রেমিককে অনেক সদ্‌গুণে ভূষিত ও সদ্‌চিন্তাযুক্ত বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ-থেকে লেখিকা যা বলতে চেয়েছেন ধরতে গেলে সেটা অনেকটা এ রকম : "ওহে মেয়েরা, তোমাদের প্রেমিকবর খুব ভাল হলেও তার সঙ্গে নিরালা-নির্জনে যেয়ো না। ভাল ছেলেরাও কামপ্রবৃত্তির বশীভূত অবস্থায় গর্হিত আচরণে লিপ্ত হতে পারে। তুমি তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। নিজের প্রতিকারের ক্ষমতাটাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

গল্পটা থেকে এ-ও স্পষ্ট হল যে সেই যুবক আর উপেন্দ্রবজ্রার নিজেরও আস্থা হারানোর মতো বিশেষ অবস্থার কথাটা খেয়াল ছিল। কিন্তু তা হলে এরা দুজনে মল্লবলী (কারলা)-তে মিলিতই বা হল কেন আর পরিণামটাও নিতান্ত খারাপই হল।

গল্পটায় আরেকটা বিষয় পরিষ্কার হল— যুবকযুবতীর পারস্পরিক ভালবাসাটা দৃঢ়ভিত্তিক হলেও, শালীনতার একটা বিশেষ সীমা লঙ্ঘন করা তাদের উচিত নয়। কারণ অনেক বাড়তি ব্যাপার দ্বারাই দুজনের ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হয়।

উপেন্দ্রবজ্রার চরিত্র-চিত্রণ আরেকটু বিশ্লেষণ করল সত্যব্রত আর কালিন্দীই বা কী চেয়েছিল তা-ও ভেবে দেখল। গল্পের মূল প্রতিপাদ্য থেকে তার মনে হল যে উপেন্দ্রবজ্রার ভালবাসার ব্যাপারটা সহৃদয়চিত্তে দেখার মতো কেউ ছিল না। তাই তাকে লুকিয়ে চুরিয়ে চিঠি লিখতে হত। পুরুষদের সঙ্গে নির্জনে মেলামেশাও সে নিঃশঙ্কচিত্তেই করত। মা-বাবা যদি আরেকটু সহানুভূতিশীল হতেন তার প্রতি, তবে পরিণামটা এ রকম হত না। কালিন্দী এ-রকমই হয়তো দেখাতে চেয়েছিল।

উল্লিখিত গল্পটা প্রকাশিত হওয়ার পর দুমাস কেটে গেছে। পাঠক 'নয়দেব ভগিনী'র কাহিনী ভোলে নি। তবে সে-সম্পর্কে যতদূর যা আলোচনার ছিল সেটা হয়ে গেছে। এতৎসংক্রান্ত সব মতামত থেকে সত্যব্রতের একটা আশঙ্কা হয়েছিল যে 'নয়দেব ভগিনী'র সঙ্গে কালিন্দীকে না জুড়ে দেয় সবাই। সেসময় লোককে গল্পটা আবার স্মরণ করিয়ে দেবার মতো হঠাৎ এক ঘটনা ঘট্‌ল। এই গল্পের জবাব হিসাবেই আরেকটা গল্প সেই পত্রিকাতে প্রকাশিত হল। এ-গল্প আত্ম-কাহিনীর ভঙ্গীতে লেখা হয়েছিল। কাহিনীকারের নাম হিসাবে উল্লেখ ছিল 'দুর্ভাগা না ভাগ্যবান?' এবং শিরোনামা ছিল 'নয়দেব ভগিনী'র প্রতি উত্তর'।

নয়দেব ভগিনীকে সম্বোধন করে সম্পূর্ণ কাহিনীটি লেখা। গল্পের সারাংশটা ছিল অনেকটা এরকম—

নয়দেব ভগিনী, সমাজের সম্মুখে যে প্রশ্ন তুমি উপস্থাপিত করেছ, তার উত্তর সমাজ যা দেবার দিক, কিন্তু আমি জবাবে এটুকু বলব যে মেয়েদের সম্পর্কে সমাজে যে-প্রশ্নটা উঠল, এধরনের প্রশ্ন পুরুষদের সম্বন্ধেও রয়েছে। মেয়েদের সর্বনাশকারী পুরুষ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তুমি সমাজে নবচেতনা আনায় সচেষ্ট হয়েছ। আর পতিতা ও ভ্রষ্টা মেয়েদের পরবর্তী সমস্যা বা কর্তব্যের কথাটা প্রশ্নাকারে সমাজের সামনে তুমি রাখতে চেয়েছ। তবে কি ভ্রষ্ট যুবকদলের প্রশ্নটাও সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়? যদি মেয়েরা এসে নষ্ট করে যুবকদের, তা হলে তারা কীকরবে? কোনও মেয়ে আমায় নষ্ট করেছে, এ কথাটা কি বিয়ের আগে বলা যায় ভাবী স্ত্রীকে? তারপর, এক মেয়ের কাছে আমল না পেয়ে অন্য আরেকজনের কাছে প্রস্তাব করাটা কি আবার নীতিস্খলনের ব্যাপার বলে ধরা চলে? এরকম ভাবে গণ্য করলে পুরুষ সে মেয়ের প্রতি কি যথোচিত কর্তব্য করতে পারবে? আমার মনে হল এ-সব

প্রশ্নের মেয়েতরফের জবাব তোমার গল্পে রয়েছে। সেই গল্পের পার্সী মহিলার 'বাড়ি ভাড়া' দেবার যুক্তিটা তোমার স্বামীর মনে কেমন করে উদয় হল ? এ-বিষয়ে যখন, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ডিস্মুজা, তখন কী উত্তর সে দিয়েছিল ? সে বলেছিল যদি স্বামীর নীতিভ্রষ্টতার কথাটা জানা থাকত গোড়ায়, তবে তার ভালবাসাটা হয়ত জমে যেত তবে কেবল এই কারণেই সে ভাবী স্বামীকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। অর্থাৎ, প্রাক্ বিবাহ জীবনে স্বামী নীতিভ্রষ্ট এ-কথাটা মেয়েদের না জানলেই ভাল। আর আমার মনে হয়, যেমন এটা স্ত্রীদের না জানাই শ্রেয়, তেমনি পুরুষদেরও এ-বিষয়ে কিছু জানা নিষ্প্রয়োজন। আগের সিঁড়ি পর্যন্ত বালবিবাহের রেওয়াজ ছিল। এই কারণে মেয়েদের প্রাক্-বিবাহ-কালীনঅনৈতিক কোনও কিছু কথা উঠত না আর পুরুষের ও নীতির প্রশ্ন ছিল না।

নয়দেব ভগিনী, উপেন্দ্রবজ্রার আচরণ সম্পর্কে আমার এটুকু কেবল মনে হয়, যা ঘটেছিল তা পুরোপুরি গোপন রাখা উচিত ছিল আর সম্পূর্ণভাবে যদি সব ভুলে যেত তবেই ভাল হত কারণ, ভ্রষ্টা সে তো হয়েই গিয়েছিল। পরের জীবনটা নীতিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল পথে চালিত করলেই বা আপত্তির কী ছিল। এ ধরনের চিন্তা মনে না আনাই ভাল। একবার পুরুষের কাছে মন্দ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলেই জীবনটা বয়ে যাক এ ঠিক নয়। কথাটা সমভাবেই মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মন্দ লোকেরা মেয়েদের আপন ফাঁদে ফেলে, তাদের বদনাম হয়। আর মেয়েদের দেখা যায়, স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের সুনীতি আর সৎ-চিন্তার দিকে ঝোঁক। কিন্তু আমার ধারণা এই যে মেয়েদের সর্বনাশ-কারী বলে পুরুষদের অপবাদ রটে অবশ্য, শুরুতে তাদের কিন্তু মেয়েরাই বিগড়ে দেয়। উপেন্দ্রবজ্রার কাহিনীটার তাৎপর্য কি ? কেউ বলবেন স্ত্রী-স্বাধীনতা অনাবশ্যক। যে শ্রেণীর বিরুদ্ধে উপেন্দ্রবজ্রার বিদ্রোহ,

সম্ভবত তাদের সাহায্য করাটাই তোমার উদ্দেশ্য। কিছু লোক এ-রকমই বুঝছে। খুব খেয়াল করে উপেন্দ্রবজ্রার গল্পটা যারা না পড়বে, তাদের বিচার কিন্তু এ-রকমই হবে। নয়দেব ভগিনী, গল্পটা পড়তে গিয়ে আমার কিন্তু মনে হয়নি যে তোমার বলার হেতুটা সেরকমই ছিল। আমার মনে হয় নিজের মা-বাবা সম্পর্কে উপেন্দ্রবজ্রার মনে যে অবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল এই মনোবৃত্তি তারই প্রতিফল। এটা প্রতিপাদন করাই হয়ত তোমার উদ্দেশ্য।

এখন স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করছি। বিয়ে না করে গোপনে পুরুষ যেমন প্রেমলীলায় রত হয়, তেমনি মেয়েরাও হয়। আমার নিজের কথাই কিছুমাত্র গোপন না করে আমি শোনাচ্ছি—

চাকুরীর ধান্দায় যখন বম্বে আসি, তখন আমি এক ধনী ব্যবসায়ীর ওখানে গৃহ-শিক্ষকের কাজ করতাম। এঁর ছোট-ছেলেপিলেদের আমি পড়াতাম। তাঁর বড় মেয়েটি বাড়ীতেই থাকত সেসময়। ওকে সংস্কৃত পড়াতাম আমি। সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের পয়সা-কড়ি অনেক ছিল। তিনি ছিলেন এক কাপড়ের মিলের এজেন্ট। গোড়ায় এক ঘণ্টা করে পড়ানোর জন্য পঁচিশ টাকা পেতাম। পরে শেঠজীকে আমি বললাম যে পরীক্ষা পাসের জন্য দিনে একঘণ্টা যথেষ্ট নয়। শেঠের ছেলে মনসুখলাল ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ত। একবার সে ফেল করেছিল। আর সব বিষয়েই সে কাঁচা ছিল। প্রতি বছরই সে ফেল করত। কিন্তু তার বাপ স্কুল কমিটিতে থাকায় তাকে উপরের ক্লাসে প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই কারণে সে পড়াশুনায় কাঁচা রয়ে গিয়েছিল। ম্যাট্রিকে ফেল করার পর আর প্রমোশনের প্রশ্ন ছিল না। তখন চৈতন্য হল শেঠের। আর স্পেশাল মাস্টার নিযুক্ত হল। জ্যামিতি, বীজগণিত আর সংস্কৃত ব্যাকরণে সে এতই কাঁচা ছিল যে বিষয়গুলো তাকে

একেবারে গোড়া থেকে পড়ানোর প্রয়োজন ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্কুল যাওয়াও তার নিরর্থক বলে বিবেচিত হল। গোড়া থেকে পড়িয়ে এই তিন বিষয়ে পাকা করে ম্যাট্রিক ক্লাসের উপযুক্ত করতে অন্ততঃ ছমাস সময় লাগবে। এ কথা মনোহর-লাল শেঠকে আমি স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। তখন দৈনিক তিন ঘণ্টার হিসাবে আমায় নিয়োগ করা হল পড়ানোর জন্য। বেতন হল মাসিক পঞ্চাশ টাকা। এইভাবেই আমি স্বাবলম্বী হতে পারলাম বম্বেতে।

কিছুদিনেই আমার বেতন বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ থেকে ষাট হল। মনসুখলালকে পড়াতামই। সে ছাড়া তারবোন করুণসুন্দরীকেও পড়াতে হত। সংস্কৃত আর ইংরেজী দুটো বিষয় সে পড়ত। তার অঙ্কে প্রয়োজন ছিল না। তাই নিয়ম করে সে পড়ত না। ম্যাট্রিক পাসের পর সে দুবছর বাড়ীতেই গল্প-উপন্যাস পড়ত। ইংরেজী আর গুজরাটি উপন্যাসও সে পড়েছিল। করুণসুন্দরীর স্বভাবটা ছিল সদানন্দময়। সে আমায় মাস্টাররূপে গ্রহণ করেছিল সেটাইকথা। যখন ছোট ভাইকে পড়াতে যেতাম, তখন সে মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ এসে জিজ্ঞাসা করত। পাঁচ-ছয়বার এ রকম হওয়ার পর ওকে একঘণ্টা করে সংস্কৃত পড়ানোর কাজটাও জুটল। গোড়ায় তিনঘণ্টা হিসাবে মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ, এখন চার ঘণ্টার দরুন ষাট টাকা পেতে লাগলাম।

চার ঘণ্টার মধ্যে প্রথম তিন ঘণ্টা মনসুখলালকে পড়াতাম। এই হিসাবে সাতটা থেকে দশটা ভাইকে আর পরেদশ থেকে এগারোটা পর্যন্ত করুণসুন্দরীকে পড়াতাম। এর পর সাড়ে এগারোটায় হোটেলে খাওয়া সেরে নিজের ঘরে ফিরে আসতে বারো সাড়ে-বারোটা বেজে যেত। আর বিকেলে এল. এল. বি. (পরীক্ষার টার্মস) পুরো করার জন্য ক্লাসে যেতাম। এই ছিল আমার দৈনন্দিন কার্যক্রম।

মাঝে মনসুখলালকে কিছুকাল স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে পড়াশুনার জন্য বলা হয়েছিল। তার বাবাও তাতে রাজী হয়েছিল। তখন দুপুরে পড়াতাম আর সকালে ঘরে নিজের পড়াশুনা করতাম। সেখানে দুপুর পেরিয়ে গেলে বিকেলের চা জলখাবার আসতে লাগল। চায়ে দুধ আর এলাচ মেশানো থাকত আর পরে সুপারীর বদলে খাওয়ার জন্য ছোলা পাওয়া যেত। এ সুবাদে চা-পান-ব্যাপারে গুজরাতীদের ভিন্নতা ইত্যাকার বিষয়ে কথাবার্তা হত।

করুণসুন্দরীর বাবা মনোহরলাল বড়লোক হলেও, লেখাপড়া তেমন জানত না। কিন্তু তার বাসনা হত তাকেও যেন লোকে শিক্ষিত শ্রেণীর বলে গণ্য করে। মেয়েকে সে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। এখন ইচ্ছা জাগল তারও যেন প্রসিদ্ধি হয়। খ্যাতির কাঙাল ছিল সে। তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী এত সীমিত পরিধিতে আবদ্ধ ছিল যে কুল্লে দুটো পরিবারও হত না। এই কারণে কন্যা করুণসুন্দরীর সব ঠিকঠাক হয়ে থাকলেও বিয়েটা হয় নি। ভাবী স্বামীর বয়স সতেরো কি আঠারো ছিল। কথা ছিল যে সে আরেকটু বড় হলেই বিয়েটা হবে। যখন করুণসুন্দরীর মাস্টারী করছি তখন গোড়ায় সাত-আট মাস এ খবরটা আমার জানাছিল না। আর শেঠের ঘরসংসারের খবরাখবর অনর্থক আমি জিজ্ঞাস করি নি।

ছোটবেলা থেকেই করুণসুন্দরীর কবিতা লেখার দিকে ঝোঁক ছিল আর তার বাবা এগুলো প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছিল। যে মাসিক পত্রিকায় সে সব ছাপা হত আর একশ' কপি বিক্রীর ব্যাপারে শেঠ সহায়তা করত। এর পর অন্য পত্র-পত্রিকাতেও এ মেয়ের গল্প ও লেখা ছাপা হতে লাগল। এ ব্যাপারে খুব গৌরব বোধ করত মনোহরলাল। আমি যখন মাস্টারী করি, তখন পত্র-পত্রিকায় এই লেখিকার ফোটো ছাপা হতেও শুরু হয়েছে। এই সব দেখে শুনে আরো বেশী আনন্দ হত মনোহরলালের।

করুণসুন্দরী যে সৌন্দর্যবতী আর সুরসিকা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। যখন গুজরাতী ভাষা কিছুটা বুঝতে শিখলাম তখন আমিও তার দুটো গল্প পড়েছিলাম। কিন্তু তা খুব একটা বিশেষ বা অভিনব কিছু তেমন আমার মনে হয় নি। কারণ একটা গল্পের চিত্ররূপ বছর দশ-বারো আগেই দেখেছিলাম। তবুও উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে আমি কিছু ভাল বলেছিলাম। সঙ্গে এ-ও বলেছিলাম যে গল্পটার একটা ফিল্ম আমি দেখেছি। এ কথা সে স্বীকার করেছিল যে তার গল্পের ছায়া সেই সিনেমা থেকেই সে নিয়েছে।

পরে আমার ধারণা হল যে দুনিয়ায় কেউ যখনই নতুন কিছু করে তা পূর্বের জানা কোনো কথা চিন্তার একত্রিতাকার ছাড়া কিছুই নয়। যন্ত্র-কল্পক (ডিজাইন ইঞ্জিনীয়ার) বা শ্রেষ্ঠ কবিরও কাজের ধারা এ-ই। সেক্সপীয়র কি করেছিলেন? তার সব নাটকেই তো তার পূর্বেকার আমলের বিদেশী ভাষায় লিখিত নাটকের প্রতিফলন। শেষের সংস্কারটা যার হাতে হয় তার নামটাই চিরকাল থেকে যায়। মৃচ্ছকটিক শূদ্রকের আগে চারুদত্তেরই নাটকের বিষয়বস্তু ছিল। তবুও আমরা তো শূদ্রকেরই প্রশংসা করি।

এরপর যখন করুণসুন্দরীকে আমার এই ধারণাটা জানালাম, তখন সে খুবই আনন্দিত হল। আর আমি কেবল তার সংস্কৃতের মাস্টারই নই, তার যেন মনে হল সাহিত্যের ব্যাপারে নির্ভরশীল একজন পরামর্শদাতাও আমি। আমি তার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা প্রশ্নের উত্তরদাতাও হয়ে গেলাম।

আমাদের দুজনের নিরালায় দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ কিভাবে মিলল? পড়াশুনাটা বড় হলঘরেই হত। সেখানে চেয়ার টেবিল ছিল। তা ছাড়া, আরামোপযোগী কৌচ ইত্যাদিও রাখা ছিল। মনসুখের পড়া দশটায় শেষ হয়ে যেত। স্নান-খাওয়া তার বাবার সঙ্গেই হত। তারপর তারা দুজনে মোটরে করে চলে যেত। তার বাবা তাকে ব্যবসা-

পত্তরের আটঘাট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য দোকানে নিয়ে যেত, করুণসুন্দরী দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত দেওয়ানখানায় পড়তে আসত। বারোটা নাগাদ সে মায়ের সঙ্গে খেত। এই কারণে কখনো কখনো আমার পড়ানো শেষ হওয়ার দশ-বারো মিনিট আগেই মনসুখ আর শেঠ বেরিয়ে যেত। এই শেষ দিককার দশ-বারো মিনিট আমার প্রতি কারো নজর থাকত না। সে সময়টাতে প্রেমের সব খেলা চলত। যেদিন শাড়ী উপহার দিই, সেদিন তার মা-ও এসে বসেছিল পড়বার জায়গায়। মাকে একটু ভেতরে যেতে দেখে আমি আমার প্রেমের খেলা শুরু করে দিই।

করুণসুন্দরীকে চুমু খেতে খেতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বিয়েটা তা হলে আমরা কবে করছি? তোমার মা-বাবার সম্মতি পাওয়া যাবে তো আমাদের এই বিয়েতে?" আমি করুণসুন্দরীর হাতের মুঠিটা আমার হাতের মধ্যে চেপে রেখেছিলাম। হাসতে হাসতে করুণসুন্দরী জবাব দিয়েছিল, "বিয়ের কথাটা এখনই বোলো না।"

"কেন?"

"যদি ব্যাপারটা নিয়ে ক্ষোভ উত্তেজনা প্রকাশ কর আর তা যদি মা বাবার অপছন্দ হয়, তখন না আবার এই একটা উৎকট চেহারা নেয়। সেকারণে এখন থেকেই আমাদের মেলামেশাটা বন্ধ করা ভাল", বলল করুণসুন্দরী। তা থেকে একটা বক্তব্য বুঝতে পারলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও ধরে নিলাম যে বিয়ের ব্যাপারে তার সায় রয়েছে আর আমাদের গোপন প্রেম চলুক আরও কিছুদিন। আরও চার-পাঁচ মাস চলে গেল। আমার মনে হল বিষয়টা আরেকবার উত্থাপন করে দেখি। উত্তেজনাসহকারে আবার যখন কথাটা বললাম, তখন হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে করুণসুন্দরী আমায় বলল, যে "ভালবাসি তোমায় তবে বিয়ে করতে পারব না।"

"কেন, বাধাটা কোথায় ? তোমার বয়স তো একুশ হল। তোমার মা-বাপের সম্মতির প্রয়োজন নেই। তুমি কার্যত এখন স্বাধীন।"

"আমি পুরোপুরি স্বাধীন নই। আমার বাগ্‌দানের ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেছে। যার কাছে আমি বাগ্‌দত্তা, তাকে আমার বিয়ে করতেই হবে।"

"এখন কেন হবে ? বাগ্‌দানের পর কি বিয়ে বাতিল করা যায় না ? কারুর সঙ্গে ভালবাসা হলে পূর্বের বাগ্‌দানটা নাকচ করলে কোনও দোষ হয় না।"

"তুমি আমার স্ব-ঘর নও। আমাদের দুজনকে তোমার সমাজ ত্যাগ করবে আর আমার সমাজও যোগ-জিজ্ঞাসা করবে না।"

"ঠিক আছে, খোঁজ খবর না করে তো পরোয়া নেই।"

"তা হলে পরে সন্তানের কি হবে ? আমার সমাজ ছোট হওয়ায় আমার বাগ্‌দান বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর মনসুখের বাগ্‌-দানটাও সেরকমই দাঁড়াচ্ছে।"

আমি জবাব দিয়েছিলাম, "জাতিভেদ রদকারীর দল এগিয়ে চলেছে, এখন আমাদের আর কোনও কিছু বাধা-বিপত্তি থাকবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল করুণসুন্দরী। বোধ হল যে তার সংশয় জাগছে মনের কথাটা বলব কি বলব না। শেষ অবধি মনে জোর নিয়ে সে বলল, "বাগ্‌দানের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাবী শ্বশুর বিশ হাজার টাকার সোনার আর জড়োয়া গহনা আমায় দিয়েছেন। এখন আমি বাগ্‌দানটা কাটাই কি করে ? সেটা নাকচ করতে যাওয়া মানে কি এই সব গহনা ফেরত দিতে হবে না ?"

এই কঠিন প্রশ্নের কি উত্তর আমি দিই ? তুমি গহনাগাঁটি সব ফেরত দাও, আমি এনে দিচ্ছি বিশ হাজার টাকার গহনা, এ কথা বলা কি আমার সম্ভব ছিল ? তবুও তাকে আমি বললাম, "ভালবাসা যদি

তোমার খাঁটি হয়, তবে বিশহাজারের গহনাও মূল্যবান মনে হবে না।" কিন্তু কথাটা বলার সময় আমার মনে এ-প্রশ্নও জেগেছিল যে এ-মেয়ে স্থিরীকৃত বিয়েটা মেনে নিয়ে সেভাবে চলতে চায়। আমার পরপুরুষের সঙ্গে সর্ববিধ প্রেমপর্বেও সে লিপ্ত হয়েছে। এর মানেটা কি ? আমার খুবই ভালবাসা ছিল ওর প্রতি। ওর মনেও যদি সেরকম প্রেমই থাকত তবে সে সেই বাগ্‌দান বাতিল করে গহনা সব ফেরত পাঠিয়ে দিত। আমি তাই বললাম, "যথার্থ ভালবাসাই যদি তোমার থাকে, তবে তো গহনা ফেরত দেওয়া উচিত।" একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম যে জবাব কী সে দেয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে করুণসুন্দরী জবাব দিল, বাগ্‌দান কি করে নাকচ করি, সেটা বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আমার বাবার অনেক ক্ষতি হবে তাতে।"

"তা কেমন করে ?"

"আমার বাবার যখন টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়, তখন শ্বশুরের গদীতে গিয়ে নিয়ে আসে।"

আমি তখন করুণসুন্দরীর মনোভাবটা বুঝতে পারলাম। আমায় ভালবাসার পরও যখন সে বিয়ে করতে চাইল না, তখন এ ব্যাপারের একটাই অর্থ করা সম্ভব। আমাকে তার প্রয়োজন ছিল গোপনে প্রেমের খেলায় মাতবার জন্যই। তার উদ্দীপিত বিকার-বাসনা তৃপ্ত করার একটা পথ বা অবলম্বন ছিলাম আমি। আমার কাছ থেকে কখনও কখনও কোনও উপহার পেলে সে খুশী হয়ে রেখে দিতে চাইত, কিন্তু বিয়ের জন্য আমার প্রয়োজন ছিল না। যে বিয়েতে মেয়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গল বা বাপের লাভ হবে, সেরকম বিয়ে হওয়াই ভাল। সেটাই ছিল তার কাছে গ্রহণীয়, অর্থাৎ সে বুঝেছিল যে বিয়েটা একধরনের প্রয়োজন।

তার অনেক চিন্তা আর অনেক কথায় এ-মেয়েকে আমার খুব হিসেবী বলে মনে হত। বারবারই আমার মনে হত এরকম হিসেবী স্ত্রী ব্রাহ্মণ-

দের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আমার ভাবী স্ত্রীর এই হিসাব-কষা মনো-ভাবে বেশ একটু গর্বিত বোধ করতাম। আমি তাকে পবিত্র বন্ধনে বাঁধার যে প্রস্তাব দিতে গিয়েছিলাম, তা সে গ্রহণে সম্মত হয় নি। বরং তার এই বস্তুবাদী দৃষ্টি ও চিন্তা যে এত গহনা হবে ইত্যাদি তা আমার মনে ঠাঁই পেত না। আর তার এই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীটাই যখন প্রধান বলে বুঝলাম তখন আর আমার ওর সম্পর্কে এই গর্বটা রইল না। আমার এই বিয়ের প্রস্তাবটাও সে গোপন রাখে নি, সে তার মাকে বলে দিয়েছিল এটা। সবাই এই ব্যাপারটাকে একটা মজার খোরাক বানাল। মেয়েটির খোলাখুলি ব্যবহারে ভুলে মূর্খ বনলাম আমি। ওর মা বলল, "মাস্টারমশাই, করুণা আপনাকে বড় ভাইয়ের মত মান্য করে। করুণার বিয়ে সব পাকা হয়ে গেছে আর, না হলেও তার বিয়েটা যাতে আমাদের সমাজের মধ্যে হয় সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। নিজের সমাজের বাইরে বিয়ে দিয়ে যদি লাভ কখনও কিছু হয়ও, আপনার বেলায় কিন্তু সেরকম লাভ কিছু হচ্ছে না। তা আপনার স্বীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি যোগ্য মেয়ে যথেষ্ট নেই? আপনার সমাজে লেখা-পড়াজানা ভাল মেয়ে যত পাওয়া যাবে, আমাদের এই বৈশ্যদের মধ্যে সেরকম মিলবে না। তাই বৈশ্য-কন্যা বিয়ে করে আপনি অযথা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন?"

এই যুক্তির বিরুদ্ধে কী উত্তর আমি দিতে পারতাম? কেবল এ-ই যে ওকে আমি ভালবাসি। আর এ-ও মনে করি যে সেও আমায় ভাল-বাসে।

সে আমায় কতখানি ভালবাসে সেটা এখন স্পষ্টই বোঝা গেল। আর মেয়েদের ভালবাসার মাপকাঠিতে যে স্ব-সমাজই বেশী এটা বুঝতে পারলেও, মুখ দিয়ে কিন্তু আমার সেই উত্তরটা আর বের হল না।

এর পর করুণাকে চার দিন পড়াতে যাই নি। পাঁচ দিনের মাথায়

যখন গেলাম তখন করুণার মা-দিদিমা-বোন সবাই বলে উঠল, "কী, বিয়ের কথাটা মানা করে দেওয়ায় খুব খারাপ লেগেছে আপনার ? আর এই কারণে এলেনই না চার দিন। আমাদের বোধ হল কি মনে বড় আঘাত পেয়েছেন আপনি। কিন্তু শেষ অবধি আপনি আসায় মনে হচ্ছে যে বুঝতে পেরেছেন সব।"

গোড়ায় তিন ঘণ্টা মনসুখকে পড়ালাম, তারপর করুণাও এল। এই তিন-চার দিনে সে একটা গল্প লিখেছে। আমায় শোনাবার জন্য সেটা সে নিয়ে এসেছে। করুণা ভিন্ন জাতের মেয়েকে বিবাহেচ্ছুক একটি ছেলের কথা লিখেছে। মেয়েটি তার মায়ের কাছে কথাটা জানিয়েছে। সেই বর্ণনায় ছেলেটিকে মূর্খ আর বাঁদর বলে চিত্রিত করা হয়েছে। বর্ণনাটা বাড়ীতে করুণা প্রথমে পড়ে শুনিয়েছে আর মায়ের প্রশংসাও এজন্য পেয়েছে।

আমায় সে এটা পড়ে শোনানোর পর আমার কেমন অবস্থা হল মনের তা বোধ হয় আর বলার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হল আমার প্রেম নিয়ে একটা মজার খেলা খেলছে সে। আমি তাই তাকে ডেকে বললাম, "আমার প্রতি কি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসাও নেই ? সত্যি করে বলো।" তখন সে আবার সেই পুরানো জবাবটাই দিল যে ভালবাসা নিশ্চয়ই আছে তবে আমাদের বিয়ে হতে পারে না। আমি বুঝলাম যে করুণসুন্দরী দ্বিধায় রয়েছে, তবে সে-মেয়ে ভালবাসে আমায়। তাই ওকে ধৈর্য ধরতে বলা আর যে অনুভব সম্পর্কে সে স্থিরনিশ্চয়, সাহস সহকারে সব বাধা ভেঙে এগুনোর চেষ্টাটা প্রয়োজন। যদি আমি বিয়েটা না করি তবেই আমার পূর্বেকার সব ব্যবহার নিন্দনীয় আর পাপ বলে পরিগণিত হবে। এ কথাটা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সফল হতে পারলাম না। আমাদের বিয়ের কি দরকার ? বিয়ে করে লাভ কিছু আছে না এখন গোপনে

যেমন চলছে, সেটায় লাভ বেশী ? সে আমায় জিজ্ঞাসা করল। দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্যের মধ্যে যে ব্যবধান তা লুপ্ত করার জন্য যে লিপ্সা আমি দেখিয়েছি সেটা নিতান্তই নীতিগত ব্যাপার। কিন্তু নীতিবদ্ধ জীবন-যাপনের জন্য অন্যপথ খুঁজে নেওয়ার কোনও উৎসাহ সঞ্চারে আমি সক্ষমই হলাম না।

"টাকা-পয়সার জন্য প্রেম-ভালবাসাটা তুমি উপেক্ষা করতে চাও?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম করুণসুন্দরীকে।

করুণসুন্দরী বলল, "বিবাহ একটা আচার। টাকা-পয়সা দ্বারাই সেটা হয়। পয়সা না থাকলে প্রেমও নিঃশেষ হয়ে যায়।"

"আমার এখন যুবাবয়স। আমি টাকা কামাতে পারি," বললাম আমি।

"টাকা রোজগার করতে করতে তুমি বুড়ো হয়ে যাবে। ভোগের দিন পেরিয়ে গেলে টাকা পেয়ে কি লাভ ?" সাফ জবাব দিল করুণা।

আমার প্রতি করুণসুন্দরীর কোনও ভালবাসা আছে কি নেই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। আমাকে বিয়ে করায় করুণের যদি অমতই ছিল, তবে আবার মাকে সে বলতে গেল কেন কথাটা ? আমার ধারণা তার দুটো কারণ ছিল : প্রথমত, কথাটা মাকে সব বলি এই ভাব দেখিয়ে তার বিশ্বাসটা বজায় রাখা আর দ্বিতীয়ত, ভালবাসাটাকে একটা কৌতুকের ব্যাপারে পরিণত করে নিজেকে আপনভোলা এবং মাস্টারকে হাস্যাস্পদ ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ করা। এ ভাবে মাস্টারীর কাজ থেকে আমায় বিতাড়নের ইচ্ছাও তার হয়েছিল, অন্ততঃ সে-ধরনের কিছু তার মাথায় ঘুরছিল। ওর চিন্তার খেইটা আমি ধরার চেষ্টা করলাম ; করুণ-সুন্দরীর বিবাহ স্থির করার ব্যাপারে তার সম্মতির অপেক্ষা করা হয় নি। তার বাবা সাংসারিক সুবিধার কথাটা মনে রেখেই তা করেছিল, করুণার বাবা মনোহরলাল একসময় ভাবী বেয়াইয়ের গদীতে কর্মচারী

ছিল। এই পাইকারী লেন-দেনে মোটা টাকার প্রয়োজন হয়। গোড়ায় পূর্বতন মালিকের গদি থেকেই সেটা সে নিত। এর পর সেই মালিকের বাড়ীতে সে-বাড়ীর সর্বকনিষ্ঠ ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেওয়া সে স্থির করে। ছেলের চেয়ে করুণা ছিল দুবছরের বড়। কিন্তু তার বয়স বলা হয়েছিল দশ কি পনেরো। পরের বছর দুজনের বিয়ে হবার কথা আর কথাটা পাকা করার উদ্দেশ্যে ছেলের বাপকে চল্লিশ হাজার টাকা জামানত মেয়ের বাপের দিতে হয়েছে।

করুণার বিয়েটা স্থির হয়েই ছিল। তার পরে আর প্রেমের খেলায় আমার সঙ্গে সে না মাতলেই পারত। আর তাই নয়, আমারও তার প্রতি অনুরক্ত হওয়া ঠিক হয় নি। কিন্তু অন্যের জীবন সম্পর্কে অনাবশ্যক কৌতূহল না থাকায়, আমিও করুণার বাগ্‌দান-বিষয়ে কোনও কিছু কখনও জিজ্ঞাসা করি নি। তারপর আমাদের ভালবাসা একটা সীমা পেরিয়ে গেল আর আমায় যখন সে তার বাগ্‌দানের কথাটা জানাল, তখন আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত নীচ বলে মনে হল।

তখন আমার মনে একটা সন্দেহও জাগল। করুণা নীতিবাদিনী না সে-সবের তার বালাই নেই? নিশ্চয় করে এ-ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। মনে আমার একটা সম্ভ্রমবোধের উদয় হল। যে করুণসুন্দরীর বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, তার আমার সঙ্গে প্রেম-ভালবাসাটা কতখানি উচিত কর্ম সে-প্রশ্ন জাগল আমার মনে। কিন্তু সে-ই বা কি করে? বিবাহ হোক-না, তবুও লেখিকার নাম-যশ-খ্যাতিও সে পাক আর লেখিকা হবার উপযুক্ত শিক্ষা তার হোক— এ সবই তার চিন্তায় ভিড় করে আসত। আর খারাপটাই কি এতে? আমি যখন আমার মনের রাশ আলগা করে দিতাম, তখন তার হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়ে উঠত। মনে হত যেন সে-ও আমার সঙ্গে বেশীরকম মিলনোৎসুক

সে-ও তার সংযম-শক্তি প্রয়োগ করেছিল, আমিও রাশ 'টেনেছিলাম নিজের উপর। পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবার মত যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা, ছাত্রী-শিক্ষক, সম্পর্ক আর লেখিকা তৈরী হবার মতো চরিত্র-চিত্রণ, মনোবিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও গড়ে উঠেছিল।

আমরা পরস্পরের প্রতি দুজনে আকৃষ্ট হলাম। করুণসুন্দরীর প্রতি প্রণয়-নিবেদনের বিষয়টা আমি তেমন ভাবি নি আর হয়ত বা সে-ও তেমনি কিছু চিন্তা করে নি। আমরা দুজনে আরও কাছাকাছি হতে শুরু করলাম। ওর মা-বাবার উচিত ছিল আমার তরফে এই স-প্রেম ভাবটায় বাধা দেওয়া। তবে তারা জানত কি-না কে জানে যে গল্প লেখায় সাহায্য করতে গিয়ে শিক্ষক ছাত্রীর মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করবে আর পরিণামে পরস্পরের প্রতি এরা আকৃষ্ট হবে। করুণসুন্দরীর বিয়েটা তো স্থির হয়েই ছিল।

যদি আমায় বিয়ে করার কোন ইচ্ছাই করুণসুন্দরীর মনে কখনো না জেগে থাকে, তবে অন্ততঃ আমার বিবাহ-প্রস্তাবটা নিয়ে তার কোন-রকম আলোচনা না করাই উচিত ছিল। করুণসুন্দরীর মা-বাবার মনে এ-ধাক্কা কখনোই জাগে নি যে সে আমায় বিয়ে করবে। কিন্তু ভাল করে যে পড়াচ্ছে সে-মাস্টারকে ছাড়িয়ে দিয়ে কি লাভ? তাদের হয়তো এ কথাটা মনে হয়েছিল।

এই চিন্তার একটা ফল দেখা দিয়েছিল। দু-চারদিন পরে এদের 'মহারাজ' আমায় চা দিতে এসে ঘরে আর কাউকে না দেখে বলল, "মাস্টার, তুমি ব্রাহ্মণ, এদের মেয়েকে বিয়ে করে নিজের জাতটা কেন অকারণে খোয়াবে? এ-মেয়ে কি এখন স্বাধীন নয়? ইচ্ছানুযায়ী যার তার সঙ্গে সে চলে যায়। গাড়ীর ড্রাইভারকে সে রাত্রে আসতে দেয় নিজের কাছে। আমি স্বচক্ষে সেটা দেখেছি। ওর মা-বাবারও জানা

আছে এ-ব্যাপার। চতুর্দিকে বদ্‌নাম হবে। তাই এ দিকে মন না দেওয়াই ভাল।”

করুণসুন্দরীর প্রতি যতটুকু ভালবাসা জন্মেছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেল। আমার বোধ হল যে এই উচ্ছৃঙ্খলতা আমার থেকেই শুরু হয়েছে। পরে সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ-ও মনে হল যে ওর উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা। মন গেছে এক নের প্রতি আর বিশ হাজার টাকা ও গহনার দরুন বিয়েটা অন্য আরেকজনের সঙ্গে হতে যাচ্ছে। এই অবস্থাই তাকে স্বাভাবিক পরিণতির পথে টেনে নিয়ে যাবে।

নয়দেব ভগিনীকে এখন আমি এটুকুই বলতে পারি যে আমার জীবনটা একবার নষ্ট হয়েছে, আর বারবার তা হতে দেব না। এদিক-ওদিক আর এটিকে হেলায় নষ্ট হতে দিতে আমি নারাজ। নয়দেব ভগিনীরও নিজের জীবন আর অপচয় করাটা ঠিক হবে না।

এস্থারের বাড়ীতে থাকাকালীন ‘চন্দ্রিকা’ পত্রিকার যে সংখ্যায় কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি কালিন্দী দেখল। খুব খুঁটিয়ে সে পড়ল সেই গল্প। তিন-চার মাস আগেকার সংখ্যা এটি। কিছুদিন সে মাসিক ‘চন্দ্রিকা দেখে নি। শিবশরণাপ্পা তাকে শুক্রবারপেঠের বাসায় নিয়ে যাবার পর থেকে পড়ার মতো পত্রিকা সে কিছু পায় নি। সাহিত্যের সঙ্গে সে সব রকমে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়েছে, এরকম একটা ধারণা হল কালিন্দীর। তখন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এই গল্পের লেখকের সঠিক নামটা জানার উদ্দেশ্যে সে ‘চন্দ্রিকা’-সম্পাদককে পত্র লিখল। ‘চন্দ্রিকা’র সম্পাদকের জবাব এল, “আপনি যেমন শর্ত করেছিলেন যে লেখিকার নাম কাউকে বলা চলবে না, তেমনি এই গল্পের লেখকও একটা শর্ত আরোপ করেছেন। আমি এটুকুই মাত্র জানি যে কাহিনীটির লেখকের নাম ‘দুর্ভাগা না ভাগ্যবান’!

13

যখন কাজের নিয়োগপত্র এল কালিন্দীর কাছে, তখন পেশাগত অনেক ব্যবধান দেখা গেল। তার মনে হল সে আর পতিতা নয়। "ভিন্ন জীবনধারা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাই বিশেষ ধরনের জীবনযাপনে অযোগ্য। কিন্তু অন্য আরেক জীবনধারা অবলম্বনের যোগ্যতা আমার আছে, তদনুযায়ী কর্তব্যও আমার জন্য স্থির রয়েছে। সেই কর্তব্য পালনের জন্যই কোনও অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক আমি প্রেরিত হচ্ছি। আশা-নিরাশার দোলায় আমি আন্দোলিত হচ্ছি। বিশেষ কার্যক্রমের জন্য আমি নির্দিষ্ট— আমার তো সেরকম মনে হচ্ছে। এখন আমি টাকা রোজগার করব। এখন আমায় ইচ্ছামতো উপদেশ দেবার বা নিন্দা করার অধিকার কারুর নেই। যদি কেউ তা করতে চায়, তবে আমি তার প্রতিকার করব আর সোৎসাহে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করব।" তার মনে হল "যদি বিবাহলব্ধ কুলীন ছেলের দেখা না-ই বা মেলে, তবে কেন আর বিয়ে করা ?" এই চিন্তাটায় আবার তার মনে তোলপাড় শুরু হল। পরিণামে এ থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে, সেটাও সে অনুভব করল। যেমন শিবশরণের বানিয়া-ঘরের আকাট মূর্খ বউ, ছেলেপিলের শিক্ষাও তেমনি হচ্ছে ; "আমি কিন্তু তা হতে দেব না। আমি এর চেয়ে বেশী শিক্ষা দিতে পারব", এ কথাই তার মনে হল। কালিন্দীর বেতন দেড়শো টাকা স্থির হয়েছিল। আর "এ-টাকায় ছেলেকে যেমন মন চায় শিক্ষা দিতে পারি। উকিল, ডাক্তার কিছু একটা তাকে তৈরি করব। সম্ভব হলে ইংল্যাণ্ডে পাঠাব ওকে।" এ-সব যাবতীয় কথা তার মনে এসে ভিড় করল। যেখানে কষ্টে-সৃষ্টে পঁচিশ টাকা মেলে, সে ক্ষেত্রে এখন

সে দেড়শো টাকা পেতে লাগল। "তা হলে আমি শিবশরণের কথাই বা কেন ভাবব ; আমায় যারা নীচ মনে করে সেই মা-বাবা সম্বন্ধেই বা কেন অনর্থক চিন্তা করতে যাব ?" সে নিজেকে এই প্রশ্নই করল।

মা একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আর নাতির মুখ-দর্শনের জন্য এসেছিল। তারপর একদমই ভুলে গেল আমায়। একসময় ব্যাপারটা তার কাছে বেশ রহস্যময় বলেই মনে হয়েছিল এবং আংশিক সে রুষ্টও হয়েছিল এই কারণে। তার মনে হল তার এই আপৎকালে মা যে তাকে ত্যাগ করেছে সেটা নেহাতই নীতির অনুশাসনের কারণে নয়। আমার সহোদর ভাই সত্যব্রতই বা আমায় ভুলল কেমন করে ? এ ভেবে সে খুবই আশ্চর্য বোধ করল। এ-সব রহস্যের একটা কিনারা হওয়া দরকার – এ কথাই তার বার বার মনে হচ্ছিল। এ-সব কথা সে পুণা স্টেশনে বলেছিল এস্থারকে। আর এস্থার তাকে আশ্বাসও দিয়েছিল, "সুবিধামতো এ-বিষয়ে আমি খোঁজ করাব।" কিন্তু চিন্তাটা কালিন্দীর মন থেকে তিরোহিত হল না। মানসিক ক্ষোভের মধ্যেও সুখের চিন্তাটা অর্থাৎ ছেলেকে পুণায় রেখে যেতে পারার ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। কালিন্দীর ছেলেটির প্রতি এস্থারের খুব মায়া জন্মেছিল। তাই তাকে পুণায় ছেড়ে যেতে পেরে কালিন্দীর মনের অস্থিরতা খানিকটা প্রশমিত হয়েছিল।

বম্বে যাওয়া স্থির হওয়ার পর কালিন্দীর মনে নতুন আশার অঙ্কুর-উদ্‌গম হল। নতুন কাজ শুরু হচ্ছে আর আমায় এখন সমাজ-সংস্কার-কর্মে অংশভাগী হতে হবে। অদৃষ্ট আমায় সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে এনে ফেলেছে, ইত্যাকার চিন্তা তার মনে পাক খেল আর সেটাই সত্যব্রতের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটাকে আরও জোরদার করল।

সত্যব্রত ও তার পরস্পরের চিন্তায় যতখানি মিল হত, সেটা আর অন্য কারুর সঙ্গে ছিল না। এ কারণে আমি আর সত্যব্রত মিলে মিশে

যদি কাজ করি, তবে কেমন হয়? কিন্তু সত্যব্রত আমার সঙ্গে দেখা করে না কেন সেটা আমার বোঝা দরকার। আবার তার আসা-যাওয়াটা শুরু হওয়া প্রয়োজন। তবে কি তার মনই বদলে গেছে? এ খবরও আমার পুরো জানা দরকার। সে স্থির করল যে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যে-কোনও উপায়েই হোক সত্যব্রতকে একবার এদিকে নিয়ে আসা প্রয়োজন। কথাটা সে এস্থারকে বলল। সে আরও বলল যে এ-ই যদি এস্থারের সেই পুরানো আবা হয় তবে তার গালে চিমটি কাটবার অবাধ অধিকার তোর থাকবে। এস্থার সত্যব্রতের সঙ্গে সাক্ষাতে রাজী হল। "কিন্তু তার গালে চিমটি কাটার প্রলোভন আমায় দেখাতে হবে না", এস্থার বলল।

বম্বেগামী গাড়ীতে বসে কালিন্দীর বোধ হল যেন সে কলঙ্ক আর দুঃখ-ভারাক্রান্ত জীবনধারা পিছনে রেখে আত্মবিকাশের এক রাস্তায় চলেছে। আর্থিক দুর্দশার দরুনই মাঝে তার মন একটা অনুশোচনায় ভরে উঠেছিল। যে শিক্ষা তা থেকে আমি পেলাম সেটা হল: যে-ধরনের আচরণহেতু আমার পশ্চাৎ-তাপটা হয়েছিল, তা মোটেই ভুল ছিল না, কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে সেটা ভুল বলে মনে হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটই ভুলে ভরা। নিজের দারিদ্র্য ও নানাবিধ অভাবটাই ছিল দূষণীয়। সেই দোষটা এখন ক্ষালন করতে হবে। এই ত্রুটির ফলেই সত্য মিথ্যা বলে মনে হয় আর মিথ্যাকেই মনে হয় সত্য। আমার চিন্তায় ভুল নেই, কিন্তু দারিদ্র্য-পীড়নে সে সময় সে-সব মিথ্যা বলে গ্রহণ করার ফলে আমায় অনুশোচনা করতে হয়েছে।

স্বীয় বিপত্তি সম্পর্কে এ কথাই থেকে থেকে সে উপলব্ধি করেছে। পাতিব্রত্যের আদর্শ, মেয়েদের মনে পুরুষেরা ভাল এ কথা সদা-সর্বদা জাগরূক রাখা ইত্যাদিও এই কারণেই। আর সকল রকম নীতি-আদর্শের কারণটাই হল যে মেয়েদের পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়।

দারিদ্র্যহেতু তার মনের এই চিন্তাটা দুর্বল হয়ে যায় নি বরং দৃঢ়বদ্ধ হয়ে মনে গেঁথে গেছে। যদি বিবাহবন্ধন আমি দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেই থাকি, তা হলে আমার ছেলে সমাজের যে শ্রেণীতে স্থান পাবে, তার সংস্কার-সাধনের দায়িত্ব আমারও গ্রহণ করা উচিত। এই ধরনের চিন্তা যতই তার মনে থেকে থেকে উদয় হতে লাগল, ততই সত্যব্রতের সান্নিধ্যের আবশ্যকতাটা সে থেকে থেকে বুঝতে পারল।

ট্রেনে জানালার কাছেই বসেছিল কালিন্দী আর বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা যখন এসে মনে ভিড় করল তখন আর শ্যাম বনশোভার দিকে তার মন গেল না। কিন্তু প্রাকৃতিক শোভা তার সত্যি ভাল লাগত। পাহাড়-চূড়া থেকে দেখা নানা দৃশ্যাবলী নিয়ে সে কবিতা লিখেছে এবং প্রকাশও করেছে। আশেপাশের লোক-জনের প্রতি তার দৃষ্টি ছিল না, তবে তাদের নজরটা অবশ্যই ওর দিকে ছিল। কালিন্দী কুমকুম্ টিপ মুছে ফেলেছিল আর মনগড়া একটা কাহিনীও খাড়া করে রেখেছিল। নিজের নাম স্থির করেছিল মিসেস্ আপ্পা। তার জাতি-গোত্র কেউ জিজ্ঞাসা করলে পদম্সালী বা এরকমই একটা তেলেগু বা কন্নড় নাম বলে দিবি, এ কথাটা এস্থারই কানে দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কালিন্দী স্থির করেছিল যে নিজেকে সে ব্রাহ্মণই বলবে। অন্য কিছু কেউ জিজ্ঞাসা করলে জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিতে হবে। এস্থার পরামর্শ দিয়েছিল ভেবেচিন্তে কিছু গল্প যেন সে বানিয়ে রাখে, কারণ আমাদের সব লোকেরা অনর্থক খোঁজখবর জানতে চায়। আর সে-জিজ্ঞাসার জবাব দিলে, আগ্রহটা আরও বাড়তেই থাকে। তাই এস্থার ওকে বলে দিয়েছিল, "গাড়ীতে কারুর সঙ্গেই বেশী কথাবার্তা বলিস না। আর কথা বলার সময় বই পড়তে থাকবি। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তা এভাবে কাটিয়ে দিতে থাকিস। আর তেমন জিজ্ঞাসা কেউ কিছু করলে তাড়াতাড়ি একটা জবাব দিয়ে

আবার বই পড়তে শুরু করবি। মনগড়া কথা একটা বানিয়ে রাখ আর সেটাই সব সময় চালিয়ে যাবি। এ কথা মোটেই মনে করিস না যে তুই মিথ্যে কথা বলছিস। এতে কোনও ছল-চাতুরীর দোষ নেই। মিথ্যে বলে কাউকে খরচান্ত না করলে সেটাকে ক্ষতিকারক বলা চলে না। সংসারটাই বাজে লোকের। এরা অন্যের নিন্দা করছে সবসময়। এরকম সংসারকে গালে-গল্পে চুপ করিয়ে দিলে কোনও পাপ হয় না, যেমন আমার নিজের কাছে কত আছে সেটা জানিয়ে দেওয়াটাও নয়। সেইরকমই পরনিন্দুকদের কাছে বানানো গল্প বলাটা কোনও খারাপ নয়। গল্প শুনে যদি ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয় তা-ও শুনবি আর জোরের সঙ্গে ঝগড়া করতে লেগে যাবি।" এস্থারের এই পরামর্শটা তার ভাল লাগল, কারণ সে ছিল এস্থারের গুণমুগ্ধ। তবে প্রসঙ্গ উঠলে বলার মতো গল্প তার তৈরিই ছিল। সেই উদ্দেশ্যে এস্থার তাকে প্রশ্নোত্তরের রিহার্সাল দিয়ে নিল চার-পাঁচবার। খুব পাকা উত্তরই সে দিল।

চাকুরির নিয়োগপত্র আসার পরের পরের দিন সকালেই কালিন্দী বম্বে রওনা হল। এস্থার তাকে পৌঁছে দিতে গেল। কালিন্দীর কাহিনী যাতে অন্যেরা জানতে না পারে, সেজন্য সে সাবধানতা অবলম্বন করেছিল। তাই তার বাড়ীর কথা এস্থারও তেমন জানত না। ঊষা নামে বোনটি হুজুরপানায় থাকে, কেবল এটুকুই সে বলেছিল এস্থারকে। আর এস্থারও এইমাত্র বলেছিল যে তাকে সে দেখেছে।

গাড়ীতে এসে যখন বসল, তখন কালিন্দী কালো রঙের 'চন্দ্রকলা' শাড়ী পরিহিত ছিল। পরনের ব্লাউজে লাল বর্ডার ছিল। পায়ে ছিল চপ্পল। কানে ছিল মুক্তার কানফুল আর হাতে সোনার বালা। গোড়ায় হাতে ছিল মা-বাবার কাছ থেকে পাওয়া সোনার 'তোড়ে'। কিন্তু যখন শিবশরণাপ্পা তার সব গহনা একে একে চেয়ে নিল, তখন তার নিজের দেওয়া জিনিসের সঙ্গে কালিন্দীর নিজস্ব সব-কিছুও নিয়ে

নেয়। সে-সবের দাম কমপক্ষে পাঁচশো টাকা হবে। যে পাঁচশো টাকা সে কালিন্দীর বাবদে খরচ করেছিল, তার সব উশুল হয়ে গেছে এ কথাটা সে একটা বাহবার সুরে বলত অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে এবং এজন্যে ওদের প্রশংসাও কুড়িয়েছিল। তাই সেই 'তোড়ে' আর দেখা যাচ্ছিল না। আর থাকলেও ট্রেনে যাওয়ার সময় তা সে ব্যবহার করত কিনা সন্দেহ। রওনা হওয়ার সময় এস্থার এসেছিল। সেই কারণে আর কপালে টিপ না থাকায় সে হিন্দু কি ইহুদী বোঝা কষ্টসাধ্য ছিল, ভিন্ন ভিন্ন লোক নিজ নিজ ভাবে চিন্তা আর অনুমান করে নিয়েছিল এ-বিষয়ে। কিন্তু সোজাসুজি এসে বলে নি কিছু।

এক মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী, বম্বে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"বম্বেতে থাকেন কোথায় ?"

"এখনও কোনও জায়গা দেখি নি। দেখে শুনে একটা স্থির করতে হবে।"

"একলাই থাকেন বম্বেতে ?"

"হ্যাঁ।"

"কাজকর্মের ব্যবস্থা কি কিছু আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কী, সেটা শিক্ষাবিভাগে ?"

"না, সচিবালয়ে !"

"মাইনে-কড়ি কত ?"

"এখনও পাওয়া যায় নি। সদ্য সদ্য গিয়ে শুরু করব।"

"শুরু হচ্ছে কততে ?"

"দেড়শো টাকায়।"

দেড়শো টাকা শুনে মেয়ে ছেলে সবাই একে অন্যের প্রতি তাকাতে

লাগল। "পড়াশুনা আপনার কতদূর হয়েছে?" আবার একজন প্রশ্ন করল।

"বি এ. অবধি।"

"কোন্ বছরের গ্র্যাজুয়েট?"

"বি এ. পরীক্ষা দিই নি। উত্তীর্ণ না হতে পেরে আমি পড়াশুনা ছেড়ে দিই।"

"কোন্ কলেজে পড়তেন?"

"বেথুন কলেজে।"

"বেথুনের নাম তো আমরা শুনি নি।"

"সেটা কলকাতায়। আমি সেখানে পড়াশুনা করেছি।"

এসময় কালিন্দীর মনে হল যে তার অস্ত্র-শস্ত্র নিঃশেষিত আর তাই সে নিজের পত্রিকাখানা চেয়ে নিয়ে তাই পড়তে শুরু করে দিল।

পত্রিকাটা সে পড়ছিল আর মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক কী ফুসফাস গুজগাজ চলছে সেদিকে কান পাতার চেষ্টা করল। ফিস্ফিসানি প্রশ্ন উঠছিল যে মেয়েটি কোন্ জাতের। কলকাতায় মেয়েদের কলেজে নিজেদের মেয়েকে রেখে সেখানে পড়াবে এমন মারাঠা-ভাষী কে বা কারা, ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর চলছিল।

"নামটা কি আপনার?" পত্রিকা থেকে মুখটা তুলতেই কালিন্দীর সামনে বসা এক মহিলা প্রশ্নটা করলেন।

"মিসেস আপ্পা।"

"আমি আপনার নিজের নামটাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"রোজ।"

"আপনি কি খৃস্টান?"

"না।"

"তবে আপনার নাম রোজ কি করে হল!"

"আমি তার কি করব ? যেনাম পাওয়া যায়, সেটাই তো রাখা হয়।"

পার্শ্ববর্তী এক ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, "রোজ ইত্যাদি ইংরেজী নাম হিন্দুরা কেমন করে যে রাখে ?"

"নয় কেন ? রোজ শব্দটা কী পাপ করেছে ? 'গুলাব' নাম কি হিন্দুদের মধ্যে হয় না ? কোথাকার হিন্দু শব্দ এটা ? এ তো ফার্সী শব্দ।"

"তবে গুলাব শব্দটা মারাঠীতে এসে গেছে। তাই পুরানো চঙ-বিসর্জনকারী আধুনিক-ভাবাপন্ন হিন্দুরা নিজেদের মেয়েদের এই নাম রাখে। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ-নাম প্রসারিত হয় নি।"

"না হলেই বা। তবে প্রাচীন দিনের ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'গহিনাবাই' নাম ছিল না ? একনাথ কিংবা কোনও এক প্রাচীন কবির জীবনীতে তাঁর মা বা বিশ্বস্তা স্ত্রীর নাম গহিনাবাই বলে উল্লেখ রয়েছে।"

"হবে হয়তো। তবে আপনার এই নাম কে রেখেছে ? বাবা না স্বামী ? এটা শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া না পিতৃকুলের রাখা ?"

"শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া নাম।"

"তা হলে বাপের বাড়ীর নামটা কি ?"

"অক্কা।"

"স্বামী কী করতেন ?"

"তিনি ছাত্র ছিলেন।"

"কোথায় ?"

"কলকাতায়।"

"বাঙালী ছিলেন কি তিনি ?"

"না, তেলেঙ্গানার লোক ছিলেন।"

"আর আপনি ?"

"আমিও মুখ্যত তেলেগুই।"

কিন্তু যারা জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তাদের প্রতি কালিন্দীর কামরারই একটি যুবকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হল। কালিন্দীর দৃষ্টি গেল তার দিকে। শ্রম দফতর-প্রকাশিত কী একটা বই সে পড়ছিল।

প্রশ্নঝড়ের দাপট যখন কিছুটা প্রশমিত হল তখন গাড়ী এসে লোনাবালা স্টেশনে থামল। সেখানে থামলে সেই যুবকটি গাড়ী থেকে নেমে আরও কিছু পত্র-পত্রিকা কিনে সেগুলো পড়ায় উদ্যোগী হল। এটা প্রশংসনীয় বলে কালিন্দী মনে মনে স্বীকার করল।

লোনাবালা গেল, খাণ্ডালাও পেরিয়ে গেল। সে সময় বীরঘাটের রিভার্সিং এড়াবার জন্য টাটা কোম্পানীর তরফে সুড়ঙ্গ কাটার যে কাজ শুরু হয়েছিল, সেখান দিয়ে গাড়ীটা যাচ্ছিল। সে-কাজটাই যুবকটি দেখতে গিয়েছিল। গাড়ী বীরঘাট রিভার্সিং পৌছলে সে এ-বিষয়ে বোঝাতে আরম্ভ করল।

সেই যুবকটির হাতে শ্রম-বিভাগের পুস্তিকা দেখে কালিন্দীর মনে প্রশ্ন উদিত হল, এ তার নিজের অফিসের নয় তো? আর সেটা সঠিক বোঝার জন্য প্রশ্ন করল, "আপনি কি শ্রম-বিভাগে রয়েছেন?"

"না", উত্তর এল।

"সে-দফতরের বই পড়ছিলেন, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।"

"আমি একটা ইউনিয়ন সেণ্টারের সেক্রেটারি, তাই বইটা পড়ছিলাম।"

"কোন্ ইউনিয়ন?"

"মিল শ্রমিকদের। মিলের শ্রমিকরা এখন ইউনিয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। আর তাই তাদের ইউনিয়ন এখন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।"

কালিন্দী আর কোনও প্রশ্ন করল না।

ওর নামটাও সে জিজ্ঞাসা করে নি। কার্যোপলক্ষে আবার হয়তো

একটা যোগসূত্র পাওয়া যাবে। এ ভাবনাটা তার মনে বিশেষভাবে গেঁথে রইল।

14

কালিন্দীর গৃহত্যাগের পরবর্তী সময়টায় সংকটের সম্মুখীন হল শিবশরণাপ্পা। তাই তার আচরণ কতখানি সংকটজনিত আর কতটাই বা লঘুমনোভাবের দরুন, তার বিচার-বিশ্লেষণ সহজ নয়।

শিবশরণাপ্পার স্বজাতিবৃন্দ তাকে সমাজচ্যুত করেছিল। আর তা-ই নয়, ব্যবসায়-ব্যাপারেও তার সঙ্গে সব রকম কাজ-কারবার এবং লেন-দেনও বন্ধ করে দিয়েছিল। এই কারণে মালপত্রের জন্য কখনও কখনও আশেপাশের লোকজনের কাছ থেকে টাকা নিতে হত। এ-ও সব সময় সম্ভব হত না, কারণ বাইরে থেকে আনা মালের টাকা সময়ে সে চুকিয়ে দিতে পারত না। বাইরের শহরেও ধারে ব্যবসার সুবিধাটা তাই নষ্ট হয়ে গেল। এটাও তার লোকসানের আরেকটা কারণ হয়ে দাঁড়াল। দোকানে জিনিসপত্র না থাকায় কর্মচারীরা পা ছড়িয়ে বসে থাকত। আদায়-উশুলটুকু দেখে শুনে হত না। আর ওদিকে মাল ছেড়ে যাওয়ার দরুনও আরও টাকা দেয় হত। কর্মচারীরা কেবল বেতন নিয়ে খাওয়া-পরার অপেক্ষায় তখন থাকত। এভাবে একবছর কাটল। শেষে ঘরের পুঁজিপাটা সব শেষ হয়ে গেল আর মালিক-কর্মচারীর মধ্যে বিরোধ বাধল। কালিন্দীর বাবদে শিবশরণের তিন সাড়ে-তিন হাজার টাকা ব্যয়ের ফলেই দোকানের অমন হাঁড়ির হাল হল। কর্মচারীরা এটাই বোঝাতে চাইল। আর শিবশরণাপ্পা বলতে লাগল

দোকানের কর্মচারীদের বেইমানীর ফলেই এ দুরবস্থা। কর্মচারীরা এদিক-ওদিক লোকজনদের জিনিসপত্র দেওয়ায় শিবশরণাপ্পা জিজ্ঞাসা করল 'এরকম কেন করলে?' তখন তারা বলল, 'মালপত্র না দেবার কথা আপনি কবে বলেছিলেন?' মালপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে কর্মচারীরা আরও অসহনীয় করে তুলল সব। এভাবে ওরা দোকানের ক্ষতি করায় বাইরে পঞ্চাশ হাজার বাকী পড়ে গেল। এ ফিরে পাবার কোনও আশা রইল না, কারণ দেউলিয়া লোকদের এভাবে ধার দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় এক মারোয়াড়ীর কাছে তার বাংলোখানা বন্ধক দিতে হল। আর ধারটা সে যে-শর্তে দিয়েছিল সেটা চুপচাপ মেনে নিতে হল তাকে।

মালিক নিজে সব-কিছু না দেখলে, মালিকের ভাল করার নামে গোমস্তা যে-সব দুষ্টামি-নষ্টামি করে তা মালিক কখনও টের পায় না। অনেক ছোটখাট মিথ্যাও গোলে হরিবোল হয়ে যায়। মালিক সতর্ক না হলে খুব চট করেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। তার যতই পুঁজির জোর থাকুক-না কেন, শীগগিরই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। শিবশরণাপ্পারও মূলধন ক্রমে সব শেষ হয়ে যাচ্ছিল।

তার প্রধান গোমস্তা ছিল মল্লিকার্জুন মডকি। সে-ই ডোবাল শিবশরণাপ্পাকে। যখন সে ব্যবসায়ে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে শুরু করল, তখন গোলমালের যতটুকু তার কাছে স্পষ্ট হল সেটা ছিল অনেকটা এরকম: অনাদায়ী পঞ্চাশ হাজার পুরোটাই নষ্ট হল আর ঋণ ছিল বিশ হাজার। হিসাব অনুযায়ী গুদামে মাল বিশ-চল্লিশ হাজারের মতো হওয়ার কথা, কিন্তু কার্যত দশ হাজার টাকার মালও ছিল না। নতুনভাবে টাকাপয়সাও আর আসছিল না। বিশ হাজার টাকার দেনাই বা এখন কিভাবে শোধ করা? মল্লিকার্জুনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের মামলাই বা কিভাবে দায়ের করা যায়! তা হলে তো খোলাখুলি-

ভাবে সব,এমন-কি, নিজের ঝঞ্ঝাটের সমুদয় কাহিনী আদালতের সামনে পেশ করতে হয়। আর এরকম কিছু করতে যাওয়া মানে দেউলে হয়ে যাওয়া। তা হলে কাজ থেকে বরখাস্ত করি মল্লিকার্জুনকে আর হাতের সওয়া লাখ টাকাটা থেকেই যাক। এটাই ঠিক নয় কি ?

মল্লিকার্জুন খুব আনন্দেই ছিল। তার চাকুরি চলে যাবে সে জানত আর তার মিথ্যাচারও আদালতের সামনে পেশ করা হচ্ছে, এ-সব সে স্থিরভাবেই জানত। তবে সে বুঝে নিয়েছিল যে মালিক নিজের আসল অবস্থাটা কখনই ফাঁস হতে দেবে না। মল্লিকার্জুন নিতান্ত সাধারণ মুন্সী ছিল না। সে নিজেকে রাজনীতি- তথা কূটনীতি-বিদ্ বলে মনে করত।

সব চেয়ে বড় যে সাজা দেওয়া সম্ভব ছিল, তাই ওকে দিল শিবশরণ। কাজ থেকে হঠিয়ে দিল তাকে। অন্য এক গদীতে গেল মল্লিকার্জুন। সে বলে বেড়াতে লাগল যে শিবশরণের হাতে পয়সা-কড়ি আর নেই। সেই মেয়েছেলেটির পেছনে সব সে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন শুধু শুধু আমার বিরুদ্ধে অকারণ মিথ্যা রটনা করছে। এইভাবে সে বদনাম ছড়াতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছিল যে সে-গদী খুবই ডুবন্ত অবস্থায়। আমায় না রাখলেও সেটা টিঁকবে না। তা হলে সে চরমদশা দেখার জন্য আমি নিজেই বা ওখানে পড়ে থাকি কেন ? নিজে সে চলে গেলেও বছর দেড়-বছরের মধ্যেই "সওয়া লাখের মুঠো" বন্ধই থাকবে। কিন্তু যে-গদীর আমি তলা খুঁড়ে দিয়েছি সেটা শিবশরণ আর কিভাবে টিঁকিয়ে রাখবে ?

মল্লিকার্জুন ছিল শিবশরণাপ্পার চেয়ে পনেরো বছরের বড়। আর নিজে সে খাঁটি আড়ৎদার। সে বুঝেছিল নিজে না দেখাশোনা করলে আড়ৎ চালানো যায় না। শিবশরণের পিতার যখন মৃত্যু হল তখন তার বয়স পনেরো আর হাইস্কুলে সে পড়ছিল। সে-সময় মল্লিকার্জুন মারফৎ ব্যবসার অনেক আদান-প্রদান হয়েছিল।

শিবশরণকে ডোবানোর চিন্তাটা মল্লিকার্জুনের মাথায় তখন থেকেই খেলছিল। শিবশরণের সংসার প্রিয়পাত্র হয়ে সারা কারবার কুক্ষিগত করার কথাটা সে ভাবছিল। কিন্তু শিবশরণাপ্পার মামা তখন এসে গেল। তাই সেই সুযোগটা মল্লিকার্জুনের আর মিলল না। শুধু এ-ই নয়, মামার নজর গিয়ে পড়েছিল মায়ের আচার-আচরণের প্রতি। ছুতোনাতা আর প্রেমের ভাণ করে বিধবাকে বশে আনার সুযোগ পুরোপুরি আর পাওয়া গেল না। এ-কারণে মল্লিকার্জুনের জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তার মনে হল বড়লোক হওয়ার সুযোগ আর সে পাচ্ছে না। কিন্তু তার বরাতজোরে কালিন্দীর প্রতি আসক্ত হল শিবশরণ— আর সেই অবসরে মল্লিকার্জুন দু'হাতে পরিষ্কার করে ফেলল সব-কিছু। যখন কালিন্দী বম্বে রওনা হল, তখন শিবশরণাপ্পার মাথায় ঘুরছে সুদিনের মুখ আবার কী করে দেখবে। সে এটুকুই শুধু জানত যে কালিন্দী সেই ইহুদি মেয়েটির কাছে থাকতে গেছে।

15

বোম্বাইয়ে এসে কালিন্দী এক বেন-ইজরায়েলী পরিবারের সঙ্গে বাস করতে লাগল। পূর্ববৃত্তান্তের উল্লেখ না করে কেবল চাকুরির জন্য আমার এক হিন্দু বান্ধবী বম্বে যাচ্ছে এটুকু পরিচয়পত্রই এস্থার লিখেছিল বাড়ীর কর্ত্রীর কাছে। কর্ত্রী ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। দুই মেয়ে ছিল তাঁর। তাদের একজন ছিল নার্স আর অন্য জন স্কুল-শিক্ষয়িত্রী। দুজনে মিলে দু'শো সওয়াদুশো টাকা রোজগার করত। মা আর মেয়েরা বেশ আনন্দেই ছিল। কালিন্দীও রইল তাদের সঙ্গে।

মা ব্রাহ্মণ না হলেও কালিন্দীর চাল-চলন খাওয়া-বসা ব্রাহ্মণ ধারানু-যায়ী ছিল। সে আমিষভোজে অভ্যস্ত ছিল না। এস্থার ও তার মা মুখ্যত ছিল নিরামিষাশী তবে কখনও কখনও তারা মাছ মাংস খেত। তাদের খাওয়া দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল কালিন্দী। এখানেও তাই হল। কালিন্দীর প্রতি স্নেহ-ভালবাসা বশত সারাবাঈ আষ্টমকরের বাড়ীতে নিরামিষ খাওয়া চলল। আবার কিছুদিন বাদ দিয়ে আমিষ আহার শুরু হয়ে গেল। গোড়ায় কালিন্দী বাসায় না থাকলে সেটা হত। তারপর কালিন্দীও তাদের বলল সে নিজে না খেলেও পাশে বসে কেউ খেলে তার ঘেন্না হয় না।

বম্বে পৌঁছনোর পরের দিন কালিন্দী শ্রম-দফতরে গেল। অফিসে তাকে কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দেওয়া হল।

কালিন্দীর প্রধান কাজ ছিল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা। শ্রমিক-বর্গের পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বহু পরিবারের খরচপত্রের হিসাব নেওয়া হত। আর জমা-খরচের অঙ্ক থেকে সঠিক অবস্থাটা বোঝা যেত। এই জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক মহিলাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কালিন্দী ছিল তাদের মধ্যে একজন। কাজের ধরনটা ছিল অনেকটা এরকম: শ্রম-দফতর থেকে বড় বড় ঘর-কাটা ফর্ম দিয়ে দিত। সেই ঘর-ভর্তির উদ্দেশ্যে মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে তথ্যাদি জেনে নিয়ে ভর্তি করত সেই-সব ফর্ম। এই-সব কাজে মেয়েদের নিয়োগের কারণ এই যে সংসার-খরচটা মেয়ে-দের হাতেই থাকে। তাই তাদের কাছেই এই জিজ্ঞাসাবাদ। আর মেয়েদের জিজ্ঞাসার জন্য মেয়েরাই উপযুক্ত। কাজের সময়টা সকালে এক বা দুইবার আর সন্ধ্যায় একবারই— দুপুরে সবাই কাজে বেরিয়ে যেত, তাই সে সময়টায় কালিন্দীর কাজ থাকত না।

প্যারেলে শ্রমিক-বস্তিতে কালিন্দী কাজ শুরু করল। গোড়ায় সে

এ কাজে বড় মজা পেয়েছিল। তারপর ক্রমে কাজের অন্তর্নিহিত রূপটা অনুভব করতে শুরু করল। সেই মজাটা তখন কেমন হারিয়ে গেল। একবার সব দেখে তার মনে যে একটা ঘৃণার উদয় হয়েছিল, এবার আর সেরকম ঘৃণা হল না। কমে এল সেটা।

কয়েক জায়গায় তার এমন অভিজ্ঞতা হল যে কাজের ব্যাপারে একটু ভয়ও জাগল মনে। প্রথমত, গরীব অশিক্ষিত লোকেদের মনে হল, এধরনের খোঁজখবরের পিছনে কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই রয়েছে। তারা ভাবল আমরা কী খাই এ-ও সরকারের জানা চাই। আমরা চা খাই, তা হলে সেরকম বুঝে হয়তো সরকার ট্যাক্স বৃদ্ধির কথা ভাবছে। এ-ধরনের নানা সন্দেহের উদয় হল শ্রমিক-মনে।

একদিন অনুসন্ধান-পর্ব শেষ করে সন্ধ্যা আটটা নাগাদ সে যখন তার বাড়ী ফিরছিল, তখন এরকম একটা ব্যাপার ঘটল। তার ভিক্টোরিয়া গাড়ীর কোচোয়ানকে কাছাকাছি কোথাও সে দেখতে পাচ্ছিল না। অবশেষে ভাবল পাওনা পয়সা দিয়ে 'ভাইসাব, আর যাব না' এধরনের কিছু বলে লোকটিকে বিদায় করি। একটা ছেলে উপস্থিত ছিল সেখানে। সে-ও অন্ততঃ এরকমই বলল। কেউ যেন হঠাৎ সেই সময় ডাকতে এল কালিন্দীকে। তাই সব কথা আর ঠিক খেয়াল হয় নি। যে ডাকতে এসেছিল কালিন্দীকে সে ছিল একজন 'মাস্টার'। আগ বাড়িয়ে এসে বলল, গাড়ীর কোচোয়ান ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে একটু ওপাশে গেছে। এখনই সে ফিরে আসবে। সেই সময়টুকু চলুন আপনি, ওপরে গিয়ে বসবেন। সেখানে আপনাকে আমরা আমাদের কাজের মোটামুটি আভাস দেব। যদি এমন কাজে আপনি লিপ্ত থাকেন যাতে শ্রমিকদের মঙ্গল হয়, তবে আমরা আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি। 'আপনি ওপরে চলুন', বলে ওরা নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল। সঙ্গে মিষ্টিও কিছু নিয়েছিল। 'মিষ্টি আপনার জন্যই', এ-ও

তারা বলল। "আরেকটু মিষ্টি খান" বলে সাগ্রহে খাওয়াল। যখন তাদের কথাবার্তা সাধারণ ব্যবহারের সীমা ছাড়িয়ে প্রেম-প্রচেষ্টায় পরিণত হল, তখন ঝট করে ঝোলা-বারান্দার গ্যালারীতে চলে এল কালিন্দী। তখন সেই মাস্টার তাকে বাধা দিল। সে হাত ধরল কালিন্দীর। ঝটকা মেরে সে হাত সরিয়ে নিল। ইতিমধ্যে সিঁড়িতে লোক দেখা গেল। তখন কালিন্দী ইংরেজীতে বলল, "বিল য়ু কাম অ্যাণ্ড হেল্প মি ?" সে দেখল একসঙ্গে ট্রেনে যে এসেছিল, এ হল সে-ই যুবক।

সেই যুবকটিকে এগিয়ে আসতে দেখে মিলের মাস্টার ঘাবড়ে গেল। গোলমাল বন্ধ করে সে সিঁড়ি অবধি পথ ছেড়ে দিল কালিন্দীকে। নীচে নামতে নামতে কালিন্দী সেই তরুণকে অনুরোধ জানাল, "আপনি আমার সঙ্গে একটু চলুন।" তাতে রাজী হল তরুণটি।

সে একটা গাড়ী ডাকল ও নিজে পোয়ে-বাবজী থেকে অফিস যাওয়ার ট্রাম রাস্তা অবধি কালিন্দীর সঙ্গে এল। দূর থেকে সে দেখাল ওটাই আমার অফিস। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কালিন্দী তরুণটিকে ধন্যবাদ জানাল। তার নাম জানতে চাওয়ায় সে এটুকুই বলল যে উকিল রামরাও নামেই লোকেরা আমায় জানে। আপনার যখনই কোনও ব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজন হবে, নিঃসংকোচে আমায় বলবেন। কালিন্দী আর রামরাও একসঙ্গেই ভিক্টোরিয়া থেকে নামল আর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলল মিনিট পাঁচ-দশ। তারপর ট্রামে উঠে পড়ল কালিন্দী।

16

কালিন্দীর কথাবার্তা থেকে তার পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছিল, তার চেয়েও বেশী কিছু জানার আগ্রহ হল

এস্থারের। সত্যব্রত সম্পর্কে জানার ইচ্ছাটাই তার সমধিক প্রবল। আগে যাকে দেখেছিলাম, এ কি সেই ছেলে? সে-চিন্তাটা তার মনে এল। কালিন্দীর সঙ্গে যতটা স্বকীয়তা বজায় রেখে চলে সত্যব্রত, সে-রকম আচরণ কি আমার সঙ্গেও করবে, নিজেকেই সে প্রশ্নটা করল। কালিন্দীর বাড়ীর অবস্থাটা তাই সম্যক অনুধাবন করা প্রয়োজন। তার একটু সুখের দিন আসুক। বাড়ীর সবাই এসে দেখা করুক তার সঙ্গে। এভাবে তাকে বাইরে রাখা ঠিক নয়। এস্থার স্থির করল এ-বিষয়ে তার যথাসাধ্য সে করবে। এরকম একটা মনোভাব নিয়েই সে শান্তা-বাঈয়ের কাছে গেল। কালিন্দীর ছোট বোন ঊষা হুজুরপানায় ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ত। তাই শান্তাবাঈকে আগেই যাবার খবরটা সে জানিয়ে দিতে পেরেছিল।

এস্থারের সঙ্গে শান্তাবাঈয়ের পরিচয় করিয়ে দিল ঊষা। এস্থার সোজাসুজি শান্তাবাঈকে বলল, "গত দেড় মাস কালিন্দী আমার বাড়ীতে ছিল। এখন সে বম্বে চলে গেছে। দেড়শো টাকার একটা চাকুরি হয়েছে তার।

কালিন্দী এস্থারের বাড়ীতে ছিল ইত্যাদি শান্তাবাঈয়ের জানা ছিল না। তাঁর কাছে এসে এস্থার আবার কি আলোচনা করবে, তিনি ঠিক কল্পনা করতে পারেন নি। মনে হয়েছিল হয়ত বা অন্য মেয়ের পড়া-শুনার কথাই বলবে। তাই এস্থার যখন জানাল যে কালিন্দী এখন শিবশরণাপ্পার আশ্রয়ে নেই আর চাকুরির জন্য বম্বে চলে গেছে, তখন শান্তাবাঈ খুবই আশ্চর্য হল। নিম্নোক্ত ধরনের কথাবার্তা হল শান্তাবাঈ আর এস্থারের মধ্যে :

"কালিন্দীর ছেলেটা কোথায়?"

"আমার বাড়ীতেই রয়েছে এখন।"

"কালিন্দী চলে গেছে, তোমার ওখান থেকে?"

"কি আর করে? বাড়ীর লোক তাকে দূর ক'রে দিলে, অন্তত: বাচ্চাটার কথা ভেবে তার ঘর তাকে সামলাতেই হবে। সত্যি বলতে কি, তার আত্মীয়-কুটুম্ব তার প্রতি কঠোর মনোভাব অবলম্বন না করলেই ভাল।"

"কেন, সে-রকম করার কি কোনও কারণ ঘটে নি?"

"আপনি কেন এত কঠোর হচ্ছেন? আপনার কি এতটুকুও মায়া-মমতা নেই?"

"আমার মায়া-মমতা নেই, কে বলে এ কথা? আমাদেরই কি খারাপ লাগছে না? আমার ওপর কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে?"

"কী ধরনের দায়িত্বের ব্যাপার?"

"কালিন্দীর আচরণে কুলে কলঙ্ক পড়েছে।"

"আপনি বলছেন কুলের কথা? আপনার মায়ের আচরণের চেয়েও কি খারাপ কিছু করেছে কালিন্দী?" জবাবটা শুনে উষার হাসি পেল। মা যখনই নিজের সংসারের মান-ইজ্জতের কথা বলেছে কয়েকবারই এস্থারের জবাবের মতো কিছু অপ্রিয় কথা তার মাথায়ও এসেছে। তবে সাহস করে সে আর বলে নি সে-কথা। তার মনের কথাটা যখন এস্থার বলেই দিল, তখন খুব আনন্দ হল উষার।

শান্তাবাঈ বলল, "এস্থারবাঈ, পুরানো কাসুন্দী ঘেঁটে কি লাভ? পেছনে না তাকিয়ে আমি সামনে তাকাতে চাই।"

"সমুখপানে তাকাতে চান তো? তা হলে বাচ্চাটারও মঙ্গলচিন্তা করতে হয়। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এক মেয়েকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে তার নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়ে, অন্য মেয়েটার কী উপকার হতে চলেছে?"

"কালিন্দীর এরকম আচরণে উষার বিয়েতে কোনও বাধার সৃষ্টি

হবে না বলছ ?”

“তা হলে কেবল ঊষার সুবিধার কথাটাই ভাবছেন ? কালিন্দী মরে গেছে ?” কথাটা বলে এস্থার ঊষার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, “ঊষাবাঈ, তোমার স্বার্থ চিন্তা করে মা কালিন্দীর প্রতি অতখানি নিষ্ঠুর হয়, তাই কি তুমি চাও ?”

ঊষা জবাব দিল, “আমার লাভের বিষয়ে ভাববার চেষ্টা করবেন না আর কালিন্দীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণও অনাবশ্যক।”

হঠাৎ আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল শান্তাবাঈ আর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার ঊষাকে বলল, “আবার যদি আমরা কালিন্দীকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনি, তাতে তোর অনিষ্ট হবে না ?”

“তোমরা কালিন্দীকে বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে এলে আমার আচার-আচরণ বিগড়ে যাবে, এ-ধরনের ভয় তোমাদের মনে জাগছে কেন ? তোমার মায়ের সান্নিধ্যে তোমার আচরণ তো বদলে যায় নি।”

“তোরা আজকালকার মেয়েরা কী যে সব উল্টোপাল্টা কথা বলিস্ ! তোর আচার-আচরণ সম্পর্কে তো আমার মনে ভয় জাগছে না। আমি ভাবছি চারপাশের সবাই কী বলবে ? আর তুই যদি কালিন্দীর সঙ্গে থাকিস তবে বিয়ের বাজারেও তোর দাম কমে যাবে।”

“আজই বা বিয়ের বাজারে আমার কী দাম যে কালিন্দীকে নিয়ে থাকলে সেটা কমে যাবে ? যদিও ব্রাহ্মণেরই মেয়ে আমি, তবুও বুঝি যে উঁচু সমাজে মেলামেশার চেষ্টাটা আমায় ছাড়তে হবে। আর আমায় আমার বর্ণসঙ্করের সমাজকেই মেনে নিতে হবে। এ-কথাটা আমাকে বলেছিল কালিন্দী। আর ক্রমে ক্রমে সেটাই আমার কাছে খাঁটি বলে মনে হচ্ছে। কালিন্দী আমাদের সঙ্গে এসে থাকলে এ-জাতের যুবকদের কাছে আমার মূল্য নিশ্চয়ই কিছু কমে যাবে না।”

ঊষার দিকে ফিরে তাকাল শান্তাবাঈ। এই মিশ্রজাতির দিকে

ঝোঁকার ব্যাপারটায় বাধাদানের ইচ্ছা ছিল। কারণ, এই সমাজের প্রতি তার মনে একটা ঘৃণার ভাব বরাবরই ছিল। একান্তই তার অন্তরের ব্যাপার ছিল এটা, না-কি স্বামীর সঙ্গে থাকার ফলে এর উদ্ভব হয়েছিল, তা বলা কঠিন। মা চোখ ঘুরিয়ে তাকানোয় ঊষা হাসতে শুরু করল।

এস্থারের মনে হল আমি এসেছি বলেই হয়তো মা-মেয়ের কোঁদল আরম্ভ হয়ে গেল। আর আমি থাকলে খোলাখুলি লড়াইটা এরা করতে পারবে না। নিজেকে একটা বাধা ভেবে সে অন্য প্রসঙ্গে চলে এল।

"তোমার ভাই সত্যব্রত কোথায়?"

ঊষা বলল, "এখন তো আছে বম্বেতে। তবে সম্প্রতি সে বম্বের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছে আর তার জিনিসপত্র সব পুণা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

শান্তাবাঈ বলল, "সে এখন উত্তর ভারত ঘুরতে গেছে।"

"কেবল ঘুরে বেড়াতে-দেখতেই সে গেছে?"

"বম্বেতে প্রার্থনা সমাজে যাতায়াত ও কাছে থেকে সেটা দেখার পর এখন সে আর্যসমাজ আর ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে চায়। এখন মহাভারত আর বেদের হিন্দী অনুবাদ বিক্রয় উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে," ঊষা জবাব দিল।

একটু হেসে এস্থার বলল, "প্রার্থনা সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কী দেখল সে?"

ঊষা বলল, "জাতিভেদ প্রথা যারা দূর করতে চাইছে তাদের সত্যি-কারের হিতৈষী কেউ নেই।" এটুকুই সে কেবল বলল।

ওর ভাই বলেছিল, "কালিন্দী মন্দ কিছুই করে নি। তার জাতক সম্পর্কে সে গোড়াতেই স্থির নিশ্চয় হয়েছিল। তার দীনতার কোনই কারণ ঘটে নি, তবুও ব্রাহ্মণ-সমাজে মেশার যে চিন্তা মনে আসছে, সে কারণে তার আচরণ দূষণীয় বোধ হচ্ছে। তবে সে বুঝতে পেরেছিল যে

ব্যাপারটা অসম্ভব, তাই ভবিষ্যৎ যতটুকু স্থির করা সম্ভব, ততটাই সুনিশ্চিত করতে সে প্রয়াস পেয়েছিল। যে-সমাজ থেকে মা এসেছে, সে সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চিন্তা সে এজন্যই করেছিল যে আমার কাছে আমার বোনের আচরণ আপাতত খারাপ মনে হলেও, এতে সত্যি দোষের কিছু নেই। যদি বিবাহের ফলে জাত-গোত্রের কলঙ্ক মোচন না-ই হয়, তা হলে আর বিবাহের গুরুত্ব বা তাৎপর্য রইল কোথায়? কথাটা তোমার কাছে কটু মনে হবে, তবে এটা খুবই যথার্থ বক্তব্য।" সত্যব্রতের বাবা জবাব দিয়েছিল, "তোমার মাথায় নানা চিন্তা-ভাবনার উদয় হচ্ছে আর তাই পাগলামির প্রসার ঘটে বাড়ীতে। তার চেয়ে ভাল হবে যদি একেবারেই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাও। আর তোমার মতো চিন্তাধারা যদি কালিন্দীর মাথায়ও থেকে থাকে, তা হলে সে যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতির কারণ আমি দেখি না। ওর সঙ্গদোষ উষার মধ্যে না বর্তায়।"

এস্থার উষাকে জিজ্ঞাসা করল, "এর মানে কি? আপ্পাসাহেব যে কালিন্দী আর সত্যব্রতকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন, সেটা কি কেবল তোমারই জন্য?"

উষা বলল, "বাবা এভাবেই নিজের মনকে বোঝায়।"

17

বিকেলে বাড়ী ফিরে চা-জলখাবার খেয়ে দুপুরের ডাকটা দেখতেন আপ্পাসাহেব। নতুন খবরের কাগজটা এলে পড়তেন। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা ছাড়া আর-কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন না।

স্ব-পেশাভুক্তরা বাড়ীতে কেউ তেমন আসতেন না, কারণ কোর্টেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হত। তাই বিকেলে ঘুরতে যেতেন আপ্পাসাহেব আর সেটাই ছিল তাঁর কালক্ষেপণের একমাত্র পথ। কিন্তু এই ঘোরাটা তিনি একাই ঘুরতেন। বিয়ের পর যতদিন না বাচ্চা হয়েছে, স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে বেড়াতেন। কিন্তু ছেলেপিলে হয়ে তারা বড় হওয়া অবধি স্ত্রীর বেড়ানোটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। কখনও কখনও কালিন্দী বা সত্যব্রতও সঙ্গে যেত। শেষে তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। যখন সঙ্গে যেত কালিন্দী, তখন তার বয়স এগারোর মত ছিল। বেড়াতে বেরিয়ে মেয়ের সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হত। আলোচনাটা হত বিভিন্ন বিষয়ে। কালিন্দী একদিন একটা সহজ প্রশ্ন করল, "তুমি তো ব্রাহ্মণ. তুমি ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন ?"

আপ্পাসাহেব বললেন, "কেন, এ প্রশ্ন করছিস কেন ?"

"আমার ক্লাসের মেয়েরা আমার হাতে জল খায় না। ওরা বলে, 'তুই ব্রাহ্মণ নোস্।' আরও বলে যে, 'তুই ব্রাহ্মণের মেয়ে হলেও, তোর মা তো ব্রাহ্মণ নয়'।"

আপ্পাসাহেব ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না নিজের আচরণের সমর্থনে কী বলবেন এই এগারো-বারো বছরের মেয়েটিকে। তিনি জবাব দিলেন, "ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের পার্থক্যটা আমি সমর্থন করি না। আর এই ভেদাভেদ দূর করার উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণ না হওয়া সত্ত্বেও, তোর মাকে আমি বিয়ে করেছি।"

প্রশ্নটা শুনে আঁৎকেই উঠেছিলেন আপ্পাসাহেব। "নীতি", "ধৈর্য", "সমাজ সংস্কার" ইত্যাদি গভীর অর্থব্যঞ্জক আর বিমূর্ত শব্দগুলো এগারো বছরের এ-মেয়ে বুঝবে কেমন করে আর এই শব্দগুলো ব্যবহার না করে স্বীয় কর্মের সমর্থনে কিছু বোঝানোও সম্ভব নয়। তাই অন্য কোনও প্রসঙ্গ তুলে মেয়েটির কথাবার্তা ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কি-না, সে-কথা তিনি

ভাবলেন এবং তাতে সচেষ্ট হলেন। মেয়েকে অনেক কথা বলে জ্ঞান-দান করে আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাকে তিনি শ্রুতিধর বানিয়েছিলেন। শেষে তাদের যাবতীয় কথাবার্তা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ে গিয়ে ঠেকল। ইতিহাসের অনেক গল্প-গাথা তাকে তিনি শোনালেন। পুরাণ-বিষয়ক পঞ্চান্নটি শ্লোকও সংস্কৃতে তাকে শেখালেন। এর পর শীগ্‌গিরই সে বাবার সঙ্গে বেড়ানো বন্ধ করে দিয়ে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে আরম্ভ করে দিল। তখন আপ্পাসাহেব একাই বেড়াতে যেতেন। ফলে, নিজেদের পারিবারিক বিষয়ে প্রশ্ন বা কথাবার্তার দ্বারা সন্ততিদের স্বীয় মতে আনার ব্যাপারটা যেমনটি ছিল, তেমনটিই রয়ে গেল।

কালিন্দীর গৃহত্যাগের দিন থেকেই মনে খুব একটা ঘা খেয়েছেন আপ্পাসাহেব। নিজের স্ত্রী সামাজিক প্রশ্নটা সমাধানের গুরুত্বটা তত-খানি উপলব্ধি করেন নি, কারণ তাঁর কাছে ক্ষণিক সুখটাই ছিল কাম্য। সে হিসেবে দেখতে গেলে তিনি পুরোপুরি সহধর্মিণী ছিলেন না। বোঝা যেত যে তাঁর ও আপ্পাসাহেবের মনের গঠনের মধ্যে অনেকখানি ফারাক। সন্তান-জন্মের পর এঁদের মনে হয়েছিল যে সন্তানও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের মতোই হবে আর জাতিভেদ দূরীকরণেও তৎপর হবে। তবে আপ্পা-সাহেবের মনে শঙ্কা যা জেগেছিল সেটা হল এই যে বিধিসম্মত এবং শাস্ত্রানুযায়ী অনুলোম বিবাহের পরও জাত সন্তান সঙ্কর জাতি অক্কর-মাস হিসেবে পরিগণিত হবে। এই ভীতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কালিন্দীর বিয়ের যে সুযোগটা হাতের নাগালে এসেছিল, সেটা তিনি বানচাল করে দিলেন। মনে হল যে কালিন্দীর প্রতি একটা অবিচার করা হল। তাই আপ্পাসাহেব প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, "যে ব্যাপারে আমি এত হৈ-চৈ করছি, সেটা কি একান্তই অসম্ভব কিছু? একটা অসম্ভব আদর্শের পিছনে ধাওয়া করে যদি আমি সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে থাকি, তা হলে বাপ হিসেবে তো আমি অপরাধীই হলাম।" এ-চিন্তাটা

তাঁর মন থেকে কখনই যায় নি। ইংরেজ যখন বলে যে নীতির কারণে সমাজ-বিরুদ্ধ আচরণ করা চলে, তখন হয়তো দশ-বিশ বছরের নিকট ভবিষ্যতের চিন্তাটাই মনে থাকে। যে ফলের আশায় জাতিভেদ দূরীকরণের কথাটা ভাবছি, কে জানে তার জন্য কত বছর পথ হাতড়াতে হবে? সদগুণ বা নীতি যাকে বলা হয় আজকের দার্শনিক যা ভাষ্য করছেন, সেটা ভবিষ্যৎ সুখেরই তথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। আত্মসংযম বা অন্যবিধ সংগঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়েই সে চেষ্টা করতে হয়। তবে সদগুণের এই দৃষ্টি বা ভাষ্য দিয়ে যদি নিজের আচরণ-বিচারে প্রবৃত্ত হই, তা হলে কী দেখতে পাই?

আমার আপন স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরবর্তীকালে লাভ কিছুই হয় নি। স্বার্থত্যাগী অধ্যাপক আইন-প্রণেতা কাউন্সিল-সদস্য হয়ে যান, মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের সেই স্বার্থ-বিসর্জনের ফলে ভবিষ্যতে কিছু মেলে। কিন্তু এ বাবদে আমি কি পেলাম? আমার ছেলেপিলেরাই বা কি পেল? আমি তো আমার পুত্রকন্যাদের 'কুলীন ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্যাদা' দিতে পারি নি। তাই এক মেয়েকে আমি কুমারী-মাতৃত্বের পথে ঠেলে দিয়েছি আর আমার ছেলে তা পুরোপুরি সমর্থন করায় তাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছি। এক কথায় সে বলতে চেয়েছিল যে নিজ জাতের বাইরে যারা বিয়ে করে তাদের কোনই ভবিষ্যৎ নেই, উপরন্তু সঙ্কর হিসাবেই এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এ-পথে যেন কেউ আর না যায়, সেভেবেই কালিন্দী এভাবে আত্মপীড়ন করছে। আমি ছেলের বক্তব্যে সায় দিই নি, কিন্তু কালিন্দীর আচরণের যে-ব্যাখ্যা ওরা করেছে, তা কি ঠিক নয়? আর সে-ব্যাখ্যা যদি ঠিক না-ও হয়, তা হলেও কি কালিন্দীর আচরণ আরও সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা আমার উচিত ছিল না? আমি তো সেরকম করি নি। জীবনক্রমই আমার ত্রুটিপূর্ণ হয়ে রইল আর মতলববাজ কিছু সংস্কারপন্থীর তত্ত্বোপদেশের শিকার হয়ে আমি একনম্বর

একটা গাধার মতোই সব কাজ করলাম। কেবল আমার অহঙ্কারের দরুনই কথাটা স্বীকারে আমার বাধছে।

যদি কেউ তর্কে প্রবৃত্ত হত যে জাতিভেদজনিত সহানুভূতিটুকু কেবল স্বজাতীয়দের মধ্যেই সীমিত থাকতে দেখা যায়, তত ব্যাপক সেটা নয়, তা হলে বৈজনাথ শাস্ত্রী জবাবে তাকে বলতেন, "সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি অপরের ভাল করতে চায়। তবুও সমগ্র সমাজ বা নিখিল বিশ্বই বন্ধু-কুটুম্ব এ কথা বলা সত্ত্বেও কেউ নিকট বা বিশ্বস্ত বলে কাউকে খুঁজে পায় না। বসুধার কুটুম্বিতা তখন নিতান্তই জলো বলে ঠাহর হয়। জাত্যাভিমানী ব্যক্তি স্বজাতীয়দের সাহায্য করবে বা দানাদি করবে। আমি কিন্তু জাতের ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামাব না। আবার এসব কথা যারা বলে তারা আদপেই কোন কাজের নয়। ত্যাগ বা দানের দিক থেকে জাতি-প্রথার উপযোগিতা নিশ্চয়ই রয়েছে। নিজের ভাইবোন বা সন্তানের জন্য মানুষ স্বার্থত্যাগে বাধ্য হয়। কিন্তু অন্যের সে-ত্যাগ-স্বীকার সে করবে না। স্বল্প সীমার পরিসরে দানের মাহাত্ম্য অনেক বেশী কার্যকর হয়। নিজের সন্তানের জন্য মানুষ প্রায় সব কিছুই বিসর্জন দিতে পারে। এই কারণেই নিজে অভুক্ত থেকে বাবা বাচ্চাকে আনন্দে রাখতে সচেষ্ট হয়। বাধাবন্ধনহীন ব্যক্তির কাছে পিতার এই মমত্ববোধ-টুকু সুতীব্র তো হতে পারে না। যদি ব্যক্তিজীবনে মানুষের এরকম কাছের কাউকে প্রয়োজন হয়, গোষ্ঠীজীবনেও এই সত্য সমভাবেই প্রযোজ্য। জাতি-বিহীনতার চেয়ে শ্রেয় আর কি হতে পারে?" নিজের ক্লাসে বসে বৈজনাথ শাস্ত্রী খোলাখুলি ভাবেই এসব কথা বলতেন। একবার তো হেডমাস্টারমশায় দোষারোপ করে তাঁকে বলেই ফেললেন পড়ার বিষয় ছেড়ে অনর্থক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন কেন? তিনি তখন ক্লাসে এসব আলোচনা বন্ধ করলেন। তবে বলেওছিলেন, "এ হেড-মাস্টারও ব্যাখ্যা করেন সব। তারপর ছেলেরা শাসনের বেড়া ভাঙে।

তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সংস্কারের যুক্তি আমি খণ্ডন করি। বিরুদ্ধতা সে কারণেই। অন্য ক্লাসে সংস্কারপন্থী স্বীয় বক্তব্য প্রচারে রত।" এর কিছুদিন বাদে বৈজনাথ শাস্ত্রী স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। তার একটা কারণও ঘটেছিল।

সে-সময়কার ছাত্রেরা নীরবে সনাতনী বৈজনাথ শাস্ত্রীর সব কথা শুনতে রাজী ছিল না। তাঁকে চটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ক্লাসে ওরা বলত, "রাণাডে, ভাণ্ডারকর প্রমুখ বিচারশীলেরা তো জাতিভেদের বিরোধী। ইতিহাস বলে যে ভেদজনিত কারণে স্বাধীনতা গেছে আমাদের। কথাটা কি তবে ঠিক নয়?" তখন বৈজনাথ শাস্ত্রী বলতেন, "ওরে, এভাবে কি ইতিহাস রচিত হয়?"

"দ্বিতীয় বাজীরাও আর শিবাজীর কালে কি জাতিভেদ ছিল না? যদি জাতিভেদের কারণে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের আমলে স্বাধীনতা চলে গিয়ে থাকে, তবে একই অবস্থা সত্ত্বেও শিবাজীর সময়ে রাজ্যস্থাপনা হয়েছিল। এ কথাও তো সমভাবেই সত্য। রাণাডের সমাজশাস্ত্রের দৌড়ই বা কতটুকু আর ইতিহাসই বা কতটা জানা? আর ওই রাম্যা ভাণ্ডারকর ত' কিছুই জানে না। এ দুজনের কাউকেই আমি সমাজশাস্ত্রে যথার্থ বিদ্বান মনে করি না। এদের তো 'জোড়া বলদ' বলেই মনে হয়।" বড় বড় সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জোড়া বলদ ইত্যাদি আখ্যা যেসব শিক্ষক দেন, তারা থাকলে যে প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ সেটা বুঝে কর্তৃপক্ষ এই "মোটা পণ্ডিত"কে একেবারেই ছুটি দিয়ে দিলেন।

বৈজনাথ শাস্ত্রী বিধবা বিবাহ করলেও সংস্কারপন্থীরা তাকে আপন বলে মনে করত না, কারণ সংস্কারবাদী লোকজনকে বোঝা বা বিচারের আগে কিছু জানার প্রয়োজন। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি দোষারোপ আর ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষাকে শ্রেয় বলে গ্রহণ করার দরকার। কিন্তু বৈজনাথের মধ্যে এই গুণটা ছিল না। তাঁর সব ধারণা সংস্কারপন্থীদের

সঙ্গে সংগতি রেখে চলত না।

আপ্পাসাহেব বৈজনাথ শাস্ত্রীর চিন্তাধারার কথা সবই জানতেন। তবে তাঁর কাছে হয়তো যাওয়াটা উচিত হবে না বুঝেছিলেন। কারণ, স্ব-শ্রেণীর বাইরে কিংবা অকুলীন মেয়েকে বিয়ে করা অনুচিত এসব কথা শোনার তাঁর মোটেই ইচ্ছা ছিলনা। আর ঔচিত্য-অনৌচিত্য কি সাময়িক ক্ষতিবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করতে পারা যায়? যে সমাজ-আদর্শের জন্য এই সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করা, তা যদি নিতান্তই অসাধ্য হয়ে পড়ে, তবে কিভাবে তাকে সুসাধ্য করা যায়? এবিষয়ে পরামর্শ দেবার মতো সমাজবিজ্ঞানীরই তাঁর প্রয়োজন ছিল। এখন যা অসাধ্য মনে হচ্ছে, সে পথই তো বেছে নিয়েছি। কেন তো নিলাম, সেটা তো অনুচিত পথ। এসব কথা আলোচনা বা সমর্থনের মতো কোন যোগ্য সমাজবিজ্ঞানী তাঁর হাতের নাগালে ছিল না। কিছুদিন বাদে কালিন্দীর নামে সত্য-ব্রতের লেখা একটা চিঠি তিনি পড়লেন। অনেক এদিক-ওদিক ভেবে শেষে তিনি বৈজনাথ শাস্ত্রীর কাছে যাওয়া ঠিক করলেন।

18

রামরাওয়ের অফিসটা ছিল পোয়বাড়ীর কোনায়। দোতালায় দুটো ঘর ছিল। একটাতে তার বিছানা, চা-তৈরীর স্টোভ আর ব্যাচেলার কিচেনের অন্যান্য সামগ্রী ছিল। অফিস-কামরায় ছিল দুটো টেবিল, বইয়ের একটা আলমারী আর একটা ফাইল রাখার কাবার্ড। টেবিল দুটোর একটার ওপরে টাইপ-রাইটার আর যারা আসা-যাওয়া করত তাদের জন্য একটা বেঞ্চি পাতা ছিল। বাইরে 'রামরাও ধড়ফলে, বি. এ., এল এল. বি., এডভোকেট' লেখা নেমপ্লেট একটা ছিল। আরেকটা

পাটায় লেখা ছিল 'শ্রমিক (হাতকর্ঘা) ইউনিয়ন, প্যারেল শাখার প্রধান দফতর'। রামরাও স্বয়ং ছিল এই ইউনিয়নের অধ্যক্ষ। তার ক্লার্ক ছিল এর কর্মসচিব। আসলে এটা অফিস ছিল না। যখন কালিন্দীর সঙ্গে ট্রেনে ওর দেখা হয়, তখন শ্রমিক ইউনিয়নের কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

সে-সময়টায় সে ছিল অন্য এক ইউনিয়নের একটা সেন্টারের সেক্রেটারি। সেখানেই কাজের একটা তাগিদ সে অনুভব করে। তখন আবার সেখান থেকে সে বিতাড়িত হয়। তাই সে অন্য একটা কার্যালয় বানিয়ে নেয়।

শ্রমিক স্বার্থে কাজ করার বহুবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে নানা জন একত্রিত হয়েছিল : কিছু ছিল সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। আর কিছু লোক রাজনীতির প্রশাখা হিসাবে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করত। কিছু লোকের মনোভাব ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে তৎপর হওয়া। অন্ততঃ এরকম কিছু মনে করে তারা আত্মসন্তোষ লাভের চেষ্টা করত। এই কারণেই পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের জন্য গরম গরম বুলি তারা আওড়াত। সাম্রাজ্যবাদ নিপাতের কথা যারা বলত, তারা আবার বিদেশ থেকে টাকা-পয়সা ও বেতনাদি পেত। কিছু শ্রমিক নেতা অন্ততঃ সেরকমই মনে করত। কিন্তু 'সাম্রাজ্য-বাদ নিপাত যাক' বলার জন্য বিদেশী বৈপ্লবিক সংগঠনের আড়াল নেবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিছু লোক আবার এও ভাবত যে সাম্রাজ্যবাদ বিনাশের বুলি আউড়ে জেলে না গেলে বোম্বাইয়ে শ্রমিক মহলে নামের যথোপযুক্ত প্রচার সম্ভব নয়। এই শ্রমিক নেতৃবর্গ কিভাবে যে নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করত, সেটাও ছিল এক রহস্য। কারণ আমাদের কাজের জন্য বেতন নিচ্ছি এ কথা বললেও প্রতিষ্ঠালাভ কঠিন হত। এরা বলত যে আমরা অর্থবান আর শ্রমিকদের জন্য একটা দরদবোধ রয়েছে। তাই অবৈতনিকভাবেই আমরা কাজ

করছি। এই নিঃস্বার্থ শ্রমিক-সেবা আর ত্যাগের বড়াই কতদিন আর চলে? এও বেশী দিন চলে নি। তবুও অনেক নেতাকেই এই ঢঙ-টুকু বজায় রাখতে হচ্ছিল।

রামরাও আসলে ছিল সাতারার লোক। তবে ছেলেবেলাটা তার কেটেছিল বিদর্ভ-নাগপুরে। পিতা ছিলেন সরকারী কর্মচারী এবং অল্প-বয়সেই মারা যান। সামান্য যা টাকাকড়ি উনি রেখে গিয়েছিলেন, তা থেকেই ওর শিক্ষাব্যয় নির্বাহ হয়। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ার সময় মা মারা যান। গোড়ায় এলাহাবাদে পড়তে সে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে মন বসে নি। বম্বেতে এসে সে বি. এ. পাস করে। ততদিন পর্যন্ত কোনও ক্রমে বাবার টাকায় চলে যাচ্ছিল। তারপর চাকুরি করতে হয়। কোথাও কোনও সরকারী চাকুরি মেলে নি। শেষ অবধি সে মিলে ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি পায়। সেখানেই বেতন বেড়ে পঁচাত্তর টাকা হয়। এল এল বি. পাস করার জন্য তার কোনও তাড়া ছিল না। এই পরীক্ষায় সে পাঁচ বছর লাগাল। তার কারণ, মন তার সে সময় শ্রমিক আর তৎসংক্রান্ত সব সমস্যার প্রতি ধাবিত হতে থাকে। তার মনে হল, "এ-ধরনের অবস্থায় যারা রয়েছে, তাদের ব্যবহার, রীতি-নীতি আচরণ, ব্রাহ্মণাদি তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নীতি, বিধি, আচার-আচরণ থেকে একেবারেই আলাদা। আর শিল্প-উদ্যোগের দুনিয়ায় প্রধান বলে কেউ নেই। জোর যার মুলুক তার — ন্যায়-নীতিই এখানে চালু। বিভিন্ন শ্রেণী যদি স্বীয় স্বার্থ নিয়ে লড়াই না করে এ জগতে তবে অন্য আর কে তাদের হয়ে সেটা করবে? আপন হিতসাধনে যারা সংগ্রামে লিপ্ত হবে না, তাদের এভাবে কষ্টেই কাটাতে হবে। ধনিক-বণিককুলের বিরুদ্ধে তার মনে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। পয়সার জন্য এই বণিককুল মিথ্যা কথা বলে। বড় বড় কথা যারা বলে তারা খ্যাতনামা হয়। আর তখন তারা আরও নিঃশঙ্কভাবে মিথ্যা বাক্য বলে।"

19

বদমাইসদের হাত থেকে রক্ষা পাবার পর থেকেই রামরাওয়ের বাড়ীটা কালিন্দীর বসার ও গল্প করার একটা জায়গা হয়ে উঠল। আর কালিন্দীকে যোগ-জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে নানাভাবে তাকে রামরাও সাহায্যও করত। এযাবৎ নিজের নামটা ঠিক করে কালিন্দী রামরাওকে বলে নি। 'মিসেস আপ্পা' বলেই রামরাও তাকে ডাকত। কিছুদিন বাদে তার মনে হল যে এভাবে ফর্মালিটি সহকারে এবং দূরত্ব বজায় রেখে 'মিসেস আপ্পা' ডাকটা খুব শোভন নয়। এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিচিত কাউকে তার প্রকৃত নামে ডাকাই বাঞ্ছনীয়। রামরাওয়ের স্মরণ ছিল যে এ মেয়ের নামটা 'রোজ'। কিন্তু আবার নাম ধরে এভাবে সরাসরি ডাকা বা 'রোজবাঈ' সম্বোধনটা যেন আরও পছন্দ হল না। তবে একভাবে না একভাবে শুরু একটা করা দরকার। তাই শেষে কালিন্দীকে সে রোজবাঈ ডাকতে আরম্ভ করে দিল। একদিন তা শুনে কালিন্দী বলল, 'আমার নাম রোজ নয়।' তিন মাসের মাইনেটা হাতে আসার পরই কালিন্দী আসল নামটা জানাতে ভরসা পেল। সব খুলে বললে তার কাহিনীটা সবার জানা হয়ে যাবে। আপাতত সেরকম হবার সম্ভাবনা না থাকায় সে নিশ্চিন্ত হল। নিত্যকার এই লুকোচুরির যেন একটা সমাপ্তি ঘটল।

রামরাও জিজ্ঞাসা করল, "তবে আপনার নামটা কি ?"

"আমার নাম কালিন্দী।"

"তা হলে ট্রেনে রোজ বলেছিলেন কেন ?"

"আমার এক বান্ধবী আমায় এই পরামর্শ দিয়েছিল। তাই তার প্রয়োগ করছিলাম।"

"পরামর্শটা কি ধরনের ছিল ?"

"আমাদের লোকজনেরা অনাবশ্যক ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। নানা প্রশ্ন, অনর্থক কথাবার্তা বা সত্যাসত্য বিচারে তারা প্রবৃত্ত হয়, বাদানুবাদ পছন্দ করে আর জড়িয়ে পড়ে কথায়। অর্থহীন এই-সব কথাবার্তা আবার এভাবে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।"

"এখানে লোকেরা অকারণ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, এ কথা সত্যি। আবার কিছু চেপে যাওয়ার চেষ্টা হলেও অকারণ উষ্মা তাদের দেখা যায়। আমার অন্ততঃ বহুবারই সেরকম মনে হয়েছে। শুনুন একটু— আমার কথার আবার ঠিক ঠিক সেরকম অর্থই করে বসবেন না! আপনার কাছে লুকোবার মতো কোনও কথা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিছু কিছু লোকের আবার অপ্রয়োজনীয় সামান্য প্রশ্নও ভাল লাগেনা।"

রামরাওয়ের প্রথম কথাটা থেকেই কালিন্দীর মনে হল যেন সে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু কথার পরের অংশটুকু থেকে আবার মনে হল 'সে বেঁচে গেছে'। কিন্তু সেই ক্ষণেই আরেকটা চিন্তা তার মনে এল। সে একটা প্রশ্ন করল আর জবাবে কালিন্দী বলল, "আমার অনেক কথাই সাধারণ মানুষের কাছে চেপে যাওয়ার প্রয়োজন। আমি তাদের কোনও রকম কথাবার্তাই এ ব্যাপারে আদৌ পছন্দ করি না। আমি থাকতাম এক বেন ইহুদী বোনের পরিবারে। সে কথাটা যদি কেউ বুঝতে পারত তা হলে নিশ্চয়ই আলোচনা হত কেন আমি এ রকম করছি ?"

"লোকজনের অনর্থক আলোচনা বন্ধ করার স্বপক্ষে এই ধরনের যুক্তি বেঠিক নয়। আমিও একবার এ রকম একটা উপায় বাৎলে দেখি। তা হলে, নামটা আপনার কালিন্দী ?"

"হ্যাঁ।"

"তা সত্ত্বেও মিসেস্ আপ্পা নামটা সত্যি কি-না ?"

"না, এটাও ঠিক নয়। আমার নাম কালিন্দী ডগ্‌গে।"

"মিসেস্ কালিন্দীবাঈ ডগ্‌গে ?"

"না, মিস্ ডগ্‌গে।"

"আপনি তা হলে কুমারী ?"

"হ্যাঁ।"

'তা হলে কুঙ্কুম টিপ কি পরেন না ?"

"আমার ভাল লাগে না, তাই পড়ি নি। আমি আমার ইহুদী বন্ধুর সঙ্গে থাকার দরুন তাদের মতোই চলি। ওরাও কুঙ্কুম লাগায় না, আমিও না। 'যেমন দেশ, তেমনই মোষ' এ-তো পুরানো কথা। আমি সে কথার সঙ্গে একটু জুড়ে দিতে পারি. যেমন জায়গা, তার তেমনি চাল-চলন।"

এভাবে সে তার নিজের কথা কিছু কিছু খুলে বলতে শুরু করল। তবুও রামরাও সঠিক জ্ঞাত ছিল না যে কালিন্দী কে বা তার পূর্ব-ইতিহাস কী। রামরাও বম্বেতে থাকত আর পুণার লোকজনের সঙ্গে খুব কমই মেলামেশা করেছে। তাই কালিন্দী পুণার লোকের কাছে কাহিনীর বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেও, সে-সম্পর্কে রামরাওয়ের তেমন কিছু জানার সুযোগ ঘটে নি।

কালিন্দীর আসল নামটা জানার পর রামরাওয়ের তরফে ঘনিষ্ঠতা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেল। সে এতকাল জানত যে 'মিসেস রোজ আপ্পা' নামধেয় মেয়েটি একজন তেলেগু বিধবা। এক ইহুদী পরিবারের সঙ্গে একত্র থাকায় মেয়েটি উদারমনা ও সুশিক্ষিতা। তবে সে মহারাষ্ট্রীয় একটি কুমারী সে খবর জানার পর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল। সে মহারাষ্ট্রীয় কুমারী কন্যা, স্বাধীনা, উপার্জনশীলা— ইত্যাদি বৃত্তান্ত জানার পর, কেন তাকে ঘনিষ্ঠ মনে হবে না ? শ্রমিক এলাকায় নিজের কাজ শেষ করে

কখন কালিন্দী দফতরে আসে, সবই রামরাও খুঁটিনাটি ভাবে জানত। অন্ততঃ সেভাবে কথাটা বলা চলে।

রোজই সকালে রামরাও আর কালিন্দীর দেখা হত। তবে কাজের সময় হলে রামরাওয়ের মনে হত আবার যেন কালিন্দী আমার কাছে আসে এবং তখন একসঙ্গে বেড়ানো যেতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে রামরাওয়ের মন একেবারেই বিগড়ে গিয়েছিল। তবে তার অবশ্য এ-ও মনে হত যে মেয়েছেলে না থাকলে জীবনটাও নীরস হয়ে পড়ে। তারপর একদিন সকালে যখন কালিন্দী এল, তখন তাকে রামরাও জিজ্ঞাসা করল যে কোন সময়টাতে তার অবসর থাকে। এখন তারা প্রতি শনিবার অপরাহ্নে দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করতে শুরু করল। দুজনে ঘুরে বেরিয়ে দর্শনীয় নানা স্থান দেখে বেড়াতে লাগল।

প্রতি শনিবার রামরাও তার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হত আর অন্যান্য দিনেও কখনও কখনও যেত সেখানে। কালিন্দী এলে বেরিয়ে পড়ত দুজনে। ঘুরতে ঘুরতে রাস্তায়-ঘাটে যা কিছু দেখত তাই নিয়ে কথা হত রামরাও এবং কালিন্দীর মধ্যে। বিশেষত আশেপাশের শ্রমিক-কুলের অবস্থা সম্পর্কেই বেশী কথা হত। তার মনে হত কালিন্দীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লব্ধ সব কথা লোকের শোনা প্রয়োজন। সে শ্রোতা হিসাবে রামরাওকেই পেয়েছিল। রামরাওয়ের মনে হত যে মহিলারা এগিয়ে এসে সমাজশাস্ত্র বিষয়ে তাদের জ্ঞানের পরিচয় দিক। এ-মেয়েরও সেই পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানের পরিচয়-প্রদানের এই এক সুযোগ রয়েছে। সেই কৃতিত্ব নিয়ে চালবাজী ঠিক না হলেও কাউকে সেকথা বলা বা কারোর কালিন্দীকে উৎসাহদান প্রয়োজন — সে বিশেষভাবেই তা অনুভব করত। কালিন্দীর সান্নিধ্যে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। কালিন্দী স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য কাতর হয়ে উঠেছিল আর

রামরাও-ও তা শোনার জন্য আকুল ছিল। আর এই আকুলতা নিতান্তই বাহ্যিক নয়, সত্যি সত্যি বেড়ে চলেছিল। রামরাও কাজের কথা যা বলত তা কালিন্দী কেবল শোনা নয়, বরং রামরাওয়ের নানা ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের কথাটা সুযোগমতো সহৃদয়তার সঙ্গে সে ব্যক্তও করত।

সব কথা শুনে রামরাওয়ের মনে হত যা সে জানে না, তেমন সব কথাও কালিন্দীর জানা আছে। সে কালিন্দীকে বলত, 'শ্রমিকদের ঘর-গৃহস্থালি সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই কম। তোমার এ-বিষয়ে অনেক বেশী জানা আছে। ধর্মঘট যদি হয়, তা-হলে এসব কথা আমাদের খুব কাজে লাগবে।"

"আমি সব বলব আপনাকে, আমায় জিজ্ঞাসা করবেন।"

"এ জ্ঞান আমার কাজে আসবে আর আমি এজন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি বলায় আমার মনে নতুন চিন্তার উদয় হয়েছে।"

"কী সেটা ?"

"আজ যা বললে, কেবল সেটুকু জানালেই হবে না। ঘরের সব খবর যারা জানে, সেই মেয়েরা শ্রমিক-সভায় এসে যোগ না দিলে কাজ এগুবে না।"

কালিন্দী বলল, "কথাটা সত্যি।"

"তবে এ-বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতাই বা কী। তা-ও বলো।"

"আমি প্রধানত তারদেও থেকে দাদর অবধি ঘুরে বেড়াই। আর তার মধ্যে পারেলে আমার অনুসন্ধানকর্মের কেন্দ্র অবস্থিত। সেখানে কাজ করতে করতে আমার মনে হয় যেন এক নতুন জগতে আমি পৌঁছে গেছি। শ্রমিক সেখানে স্বহস্তে কাজ করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কাজ করছে। পয়সা দুজনেই কামাচ্ছে। আর পয়সা রোজগারের ক্ষমতা দিয়েই তাদের যোগ্যতার পরিমাপ হয়। এ শুধু এ-জায়গা কেন, সমগ্র উত্তরবঙ্গেরই নিয়ম বা ধারা।"

রামরাও জিজ্ঞাসা করল, "পারিবারিক রীতি-নীতি বা চালা-চলতি সম্পর্কেই বা তোমার কী মনে হচ্ছে ?"

"অন্যত্র পরিবার সম্পর্কে যে নীতি-নিয়ম বা ছোট-বড়র ভেদ দেখা যায়, এই শ্রমিককুলের মধ্যে তা নেই। এখানে যে বেশী রোজগার করে, সেই তার শাসন চালায়। ছেলে যদি পয়সা বেশী কামায়, তবে মা-বাপের কথা সে শোনে না। সেটাই চলতি রেওয়াজ। স্ত্রী রোজগার শুরু করলে অন্য ব্যাপারে সে থাকেও না কিংবা নজরও বিশেষ দেয় না। এটাই নিয়ম।" জবাব দিল কালিন্দী।

রামরাও শুধাল, "তা হলে, টাকা-পয়সাকে— অন্যকে পয়সা রোজগার করতে দেবার বা না দেবার ক্ষমতা যে রাখে সে-লোককেই মান্য করতে দেখা যায়। এই সুবাদে তুমি শ্রমিকদের সম্বন্ধে নতুন বিশেষ কী জেনেছ ?"

"এই শ্রমিক-দুনিয়ায় মেয়েদেরও পুরুষদের মতোই সমান অধিকার রয়েছে। স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট নাগরিক বলে এরা স্বীকৃত। অন্যত্র মেয়েদের সম্পর্কে যে আইন বা রীতি, সেটা এক্ষেত্রে চালু নয়। এটাই এখানে আমার কাছে বৈশিষ্ট্য বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। সে মালিকানী বা সর্দারনী পয়সা খায় আর খাওয়ায়। সে সুন্দরী মেয়েদের কাজে বহাল করে আর খুশী রাখে ম্যানেজারদের। যার সম্বন্ধে এ-ধরনের কথা বলা হয়, তার আচরণ নিয়ে বাড়ীতে লোকেরা নিন্দাচর্চা করলে করতে পারে, কিন্তু মিলে তার কাজের ব্যাপারে সকলেই তাকে খোসামোদ করে।"

রামরাও বলল, "তোমার অনুমানটা ঠিকই।" হেসে কালিন্দী বলল, "পয়সাই রাজা— সব কিছু। পয়সা রোজগারের বুদ্ধিটা থাকা চাই।"

রামরাও প্রশ্ন করল, "এখনও রাজা-রাজত্বের তুলনা দিয়ে তুমি কথা বল। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ-ভাষা ঠিক নয়। কেউ কেউ একে লোকরাজ্য বলেন। 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্রেসি' কথাটা তুমিও হয়তো

শুনেছ। তবে তোমার চোখে শ্রম-ব্যাপারে লোকরাজ্য কতটুকু নজরে এসেছে!"

কালিন্দী বলল, "লোকরাজ্য বলে কিছুই নজরে পড়ে নি।"

"তবে সেটা কী?"

"আমার তো তানাশাহী-টানাপোড়েনের ব্যাপার মনে হয়েছে।"

"সেটা কি রকম?"

"পয়সা রোজগারের বুদ্ধি মানে এই নয় যে কুশলতাও চাই। কিন্তু সেটার অর্থ অন্যকে কাজের জন্য ঠিকমতো পয়সা না দেওয়া। আর সেটাই বুদ্ধি। কর্মকুশলী আর কাজে বাধা-সৃষ্টিকারী ও পয়সাখাওয়া লোকই শিল্পসাম্রাজ্যে ধনবান হয়। তাই এটা লোকরাজ্য নয়, বরং বলা চলে তানাশাহী।"

"এই তানাশাহীকে উৎখাত করলে তবেই কি লোকরাজ্য গড়ে উঠবে?"

"তানাশাহীকে হঠাতে পারলেই সে কথা আসবে।"

"আমাদের এই হঠানোর কাজটা করতে হবে।"

" 'আমাদের' বলার অর্থ কি!" একটু উচ্চস্বরেই কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল।

রামরাও জবাব দিল, "'আমাদের' অর্থ, আমি আর অন্য যারা আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবে।"

20

একবার পুণা গেল কালিন্দী। তার পরম শান্তির স্থান এস্থারের ওখানেই সে উঠল। পৌঁছে বাড়ীর খবর প্রসঙ্গে এস্থারের কাছ থেকেই

কালিন্দী জানতে পারল সত্যব্রত সেখানে নেই। এ-ও জানল কালিন্দীর পক্ষ অবলম্বন করে সে বাপের বিরুদ্ধতা করেছিল আর বলেছিল যে সুনিশ্চিতভাবে বিচার-বিবেচনা করেই কালিন্দী ও-ধরনের আচরণ করেছে। তাই বাপের সঙ্গে তার বিতণ্ডা-কলহ হয়েছিল। কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল এস্থারকে, "এখনও কি সে পুণা ফেরে নি!"

এস্থার বলল, "না।"

কালিন্দী বলল, "সত্যব্রত এখনও তার পূর্বেকার মতে অটল রয়েছে?"

"আগেকার মত কী ছিল!"

"সেটাকে মত না বলে বিচার বলাই ঠিক হবে।"

"সেই বিচারটা কি?"

"নির্ভীক আর ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের একটা সংগঠন প্রয়োজন।"

"তোরও কি সে-ধরনের কোনও একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার দরকার ছিল!"

"হ্যাঁ।"

"কী ধরনের!"

"সেটা হবে জাতিহীনদের একটা সংগঠন এবং সবার জন্যই তার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।"

সেই সংগঠনের সঙ্গে কি পার্শী, বেন-ইহুদীরাও যুক্ত হতে পারবে?"

"আমি পার্শী বা বেন-ইহুদীদের কথা ঠিক চিন্তা করে উঠতে পারি নি। তবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছায় কেউ যোগ দিতে চাইলে আসুক। সেরকমই অন্ততঃ ভাবছি।"

এর পরে কোনও-এক আলোচনা প্রসঙ্গে কালিন্দী সোচ্ছ্বাসে বলে উঠল, "এতদিন সে বম্বেতে থাকল, সময়ে জানতে পারলে বেশ মজা হত।"

এস্থার শুধাল. "কী করতিস তা হলে !"

"আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে থাকতাম আর আমার একটা লাভও হত তাতে।"

এস্থার জিজ্ঞাসা করল, "কী লাভ হত ?"

"সে আর আমি একত্র থাকলে. একা মেয়েকে নীতিহীন মনে করে যে-সব বদমাইস আমার পেছনে লেগেছিল, ওরা আর ঘোরাফেরা করত না।"

এস্থার প্রশ্ন করল, "কিরে, তবে খুবই ঝঞ্ঝাটে তোর দিন কেটেছে বল !"

বেশী আর কী বলব, বাড়ীর দরজাটা আমায় হরদমই বন্ধ রাখতে হত। কেউ এলে, না জিজ্ঞাসা করে এবং পরিচিত না জেনে দরজা খুলতাম না।" বিগত সে-সব দিনের কথা ভেবে কালিন্দীর চোখ ভিজে এল। সে চোখ পুঁছতে লাগল।

"সেখানে গুণ্ডা-বদমাইস তোকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তা হলে শিব-শরণাপ্পাকে তুই কেন জানালি না ব্যাপারটা !"

"যখন আমি কথাটা উল্লেখ করলাম, তখন দরজাটার একটা অংশ কেটে সেখানটায় কাঁচ লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'কাঁচের ভেতর দিয়ে আগন্তুককে না দেখে শুনে দরজা খুলবে না'।"

"তুইও তাই করলি !"

"না করে যাই কোথায় ? তবে আমার মনে হল যেন কারা-অন্তরালে রয়েছি।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এস্থার বলল. "তোর শিবশরণাপ্পাকে সম্প্রতি দেখলাম।"

"কোথায় ?"

"সেদিন আমি রেসের মাঠে গিয়েছিলাম।"

"এস্থার··· !"

'গেছি তো কি হয়েছে ? আমি এখনও জুয়া খেলি না। সত্যি-কারের রেসকোর্সটা কেমন সেটা দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। আমার জাতেরই একজন টিকিট বিক্রি করছিল সেখানে। একরকম জোর করেই সে একটা টিকিট আমায় গছিয়ে দিল। আমিও ভাবলাম, দেখি নি কখনও, এই অবসরে দেখে নিই রেসকোর্সটা।"

"কি মনে হল তোর ?"

"ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করলে, পেছিয়ে কোনটা রইল বা কোনটা এগিয়ে যাচ্ছে, এ-সব দেখে, দর্শকদের ঔৎসুক্য বাড়তে থাকে।"

"তোরও কি নেশা চড়ে গিয়েছিল ? পয়সা দিয়ে তুইও খেললি ?"

"পয়সা দিয়ে খেলার ইচ্ছাটা অবশ্যই হয়েছিল। তবে সেটা করা ঠিক হবে না চিন্তা করেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। কেবল খাবার কেনার মতো সামান্য পয়সা নিয়েছিলাম।"

"ভাল করেছিলি।"

"কেন !"

"আমার তো ঘোড়ার মাঠে যেতে ভয়ই হয়।"

"কেন !"

"শিবশরণাপ্পা আর আমার সাক্ষাতের শেষ রাতটার কথাই মনে হয়। সে-রাতে সব পয়সা খুইয়ে দুঃখ ভোলার জন্য প্রচুর মদ খেয়েছিল শিবশরণাপ্পা। তাই আমার এতে ভয়।"

"তার মানে তুই যখন শিবশরণের সাথে ছিলি, তখনই সে রেস, মদ, দুইয়েতেই মজে গিয়েছিল।"

"তখনই আমি এত সব ব্যাপার টের পেয়েছিলাম। আমি কখনও অবশ্য ওকে রেস খেলতে যেতে বা মদ খেতে দেখি নি। শহরের বাইরে বাংলোতে আমি যখন থাকতাম, তখনও আর্থিক ধাক্কাটা সে খায় নি।

শুক্রবারপেটে যখন গেল, তখনই সম্ভবত খেতে শুরু করল বলা যায়। কিন্তু এস্থার, তুই কিভাবে চিনলি যে সে লোকটাই শিবশরণাপ্পা।"

"সে নীল পাগড়ি পরিহিত ছিল আর মুখটাও নিভাঁজ নিটোল দেখাচ্ছিল।"

"হ্যাঁ, বর্ণনাটা ঠিকই, তবে তুই এ-সব জানলি কি করে!"

"আমি রেসের মাঠে একটা বেঞ্চে বসেছিলাম অরে সেদিকটাতেই শিবশরণাপ্পা বসে ছিল। ওর সম্পর্কে দুজন ব্রাহ্মণের কথাবার্তা হচ্ছিল। একজন আঙ্ুল তুলে ওর দিকে নির্দেশ করতেই বোঝা গেল।"

"কী বোঝা গেল!"

"ওই লোকটিই আপ্পাসাহেব ডগ্‌গের জামাতা বাবাজী। দ্বিতীয় জন প্রথম জনের কথাটা সংক্ষিপ্ত করে জামাইয়ের বদলে অন্য শব্দ দিয়ে আরও স্পষ্টাকারে বর্ণনা করল সেটা।"

"কিভাবে!"

"তুই শুনতে চাস সেই কথাটা! সে বলল, জামাই কেন বলছ। আপ্পাসাহেবের মেয়েকে এ লোকটাই ফুসলে নিয়ে গিয়েছিল।"

"তারপর কি হল?"

"তারপরে তোর নামও উচ্চারণ করল ওরা, আর বলতে লাগল লেখাপড়াজানা মেয়েরাও এ-পথে যাচ্ছে। তা হলে উপায় কি?"

"তা হলে অর্থটা দাঁড়াচ্ছে এই যে দুবছরেরও বেশী হল আমি বাড়ী ছেড়ে এসেছি, কিন্তু এখনও লোকেরা এভাবে আমায় নিয়ে কথাবার্তা বলছে।"

"আরে, এটা যে পুণা। এ-সব কথাবার্তা পুণায় বেশীই হয়।"

"আর শিবশরণাপ্পার সঙ্গে কথাবার্তা হল কিছু? তার জানা-চেনা আর কারু সাথে দেখা হল কি?"

"হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল।"

"কি রকম ?"

"বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছে শিবশরণ। ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান দিতে হয়েছে। মুনীম তার সব পয়সা খেয়ে ফেলেছে। আর এখন তাই বড়লোক হবার এ-পথটাই সে বেছে নিয়েছে— রেসের মাঠে যেতে শুরু করেছে। সে মনে করে যে জুয়াতেই তার ভাগ্য ফিরে যাবে।"

"এত সব তুই জেনে গেলি, আমি কিছুই জানি না।"

"আমি আরও জানতে পেরেছি যে একটা বাজীতে সে একহাজার টাকা জিতেছে আর একটা বড় পার্টি দিয়েছে সব জকিদের।"

"জকিদের পার্টি দেবার উদ্দেশ্য কি !"

"আমি অত শত জানি না। তবে আমার জানাচেনা লোকেরা আমায় বলেছে যে কার ঘোড়া আগে যাবে সে কথা নাকি জকিরা নিজেদের মধ্যে আপসেই স্থির করে আর সেভাবেই ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে জিতিয়ে দেয়। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করলে এক-আধবার যশ-রহস্যের হাল-হদিশ ওরাই বলে দেয়। আর ওরা নিজেরাও বড়লোক হয়ে যায়। এ-কারণেই সব বড়লোক, সরকারী পদস্থের দল বা তাদের লোভাতুর স্ত্রীরা জকিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়।"

'হতে পারে, ইচ্ছামতো যাকে-তাকে বড়লোক বানানোটা জকিদের হাতের মধ্যে। তবে এজন্য যদি হাজার লোক তাদের পেছনে ছোটে তা হলে শিবশরণাপ্পার পার্টিতে আর কতদূর কি লাভ !"

"আমার অন্ততঃ ওরকমই মনে হচ্ছে। তুই ও-বেচারাকে জুয়াবাজী থেকে বাঁচা।"

"তা হলে সে জুয়াড়ী হয়ে উঠেছে, কথাটা ঠিক !"

"লোকে তাই বলছিল।"

"তা হলে কৃতকর্মের ফল সে ভুগবে। আমি তার কি করব !"

"কালিন্দী, তুই নিস্পৃহের মত কথা বলছিস ?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"ওর একটা ভাল-মন্দ হলে, তোর কেমন লাগবে!"

"আজ আর আমি সে কথা ভাবতেও পারি না।"

"শিবশরণাপ্পা নিজে এসে যদি আজ তোকে ডাকে, তবে যাবি তুই?"

"একদমই নয়।"

"কিন্তু কালিন্দী, দারিদ্র্যহেতুই যদি শিবশরণাপ্পা তোকে ছেড়ে থাকে, তা হলে তার এই আপৎকালে তোর কি কর্তব্য নয়, ওর পাশে দাঁড়ানো? সে তোর বিয়ে-করা স্বামী নয় বুঝি, তা হলেও তোর বান্ধব প্রিয়সখা সে তো ছিল। তাই না?"

"হ্যাঁ, তা ছিল। এখন সে আর আমার দয়িত নয়।"

"তোকে দুর্দশার মধ্যে নিয়ে সে ফেলেছিল, অর্থসংকটই তার কারণ। কিন্তু তখনও তার প্রতি তোর ভালবাসা পুরোপুরিই ছিল। সংকটাপন্ন পুরুষকে সাহায্য করা স্ত্রীর কর্তব্যও বটে। সে-পুরুষকে যে প্রিয় জ্ঞান করে সেই স্ত্রীরও এই একই কর্তব্য।"

"স্ত্রীর যে এটা কর্তব্য তা আমিও বুঝি। আর এই সহায়তাদানের ব্যাপারে নিজেকে তৈরীও করেছিলাম। কিন্তু যখন মনে হল হয়তো বাড়ী ছেড়ে আমি চলে যাব, তখন আমায় সে জিজ্ঞাসা করল আমি সিনেমায় নামব কি-না।"

"এ-ধরনের একটা আভাস সে দিয়েছিল ঠিকই, তবে তাতে দোষের কি?"

"আমায় সে কখনও তার মনটা দেয় নি। সব সময়ই সে আমার কাছে কথা চেপে যেত।"

"দেখ কালিন্দী, 'আমার উপর ভরসা রেখো' বললেই কিছু আস্থা জন্মায় না। তাই সে নিজের সুখ-দুঃখের আভাস কিছু দেয় নি। তার

কারণ হয়তো এই যে তোর সহানুভূতিটুকু সে পুরো পাবে এমনটা বোধ-হয় আশা করে নি।"

"তা হলে ?"

"তোর অবস্থা ভালই। শিবশরণাপ্পার আশ্রয়ের অপেক্ষায় তুই থাকিস নি। তবুও, একসময় যে তোর প্রিয়সখা বা দয়িত ছিল, যে তোর পুত্রের জনক, সে এখন সর্বনাশের পথে চলেছে। তাই এখন তাকে সৎপরামর্শের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। আমার অন্তত: সেরকমই মনে হয়।"

"এস্থার, তুই যতই বলিস-না কেন, শিবশরণাপ্পার সঙ্গে সম্পর্কে আমার ফাটল ধরেছে। আমার মনে হচ্ছে ওর মুখটাও যেন আমি আর না দেখি।"

"কালিন্দী, এটুকুই শুধু আমি বলব লোকে স্ত্রী আর রক্ষিতার মধ্যে পার্থক্য করতে চায়। বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী একবার দুর্ব্যবহার করলে, স্ত্রী তাকে চিরতরে ছেড়ে দেয় না। বরং সে পতিকে শোধরাবার চেষ্টা করে। একত্র থেকে সেই চেষ্টাই সে করে।"

"তুই যা খুশি বল, আমি আর যাব না।"

"আর তুই তো চাকুরিতেও লেগে গেছিস।"

"তা ছাড়া বিবাহিত স্ত্রীর বিশেষ অধিকারও আমার নেই। তাই বন্ধন আমি মানব কেন ?"

"কথাটা ঠিক। আমার এটা খেয়াল হয় নি। তবে তোর বাচ্চা-টার তো একটা বাপ দরকার।"

"ওর লালন-পালন আমিই করব।"

"কালিন্দী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোকে ?"

"নিশ্চয়ই করবি। কি জানতে চাস্ তুই ?"

"অন্য কোনও যুবকের প্রতি কি তোর ভালবাসা জন্মেছে ?"

"তুই গোড়ায় বলেছিস সবমেয়েরই অগুণতি ছেলের প্রতি ভালবাসা জন্মায়। তার হিসাব চাইছিস ?"

"কালিন্দী, সত্যি কথা বল। বাজে কথা বলিস না।"

"আমি সত্যি কথাই বলছি তা হলে তোর পুরানো জবাব যে বহুজনকেই তুই ভালবেসেছিস। নাকি সেটাও ভাসা ভাসা জবাব একটা ?"

"কালিন্দী, আমার মন বিশেষ কারুর ওপর স্থির হয়ে পড়ে নি। কিন্তু তুই শিবশরণাপ্পার ওপর এতটা আসক্ত হয়ে পড়েছিলি যে বিয়ে না করেই তার সঙ্গে থাকতে তুই রাজী হয়ে গিয়েছিলি। কিন্তু আজ তার ব্যাপারে তুই কতটা উদাসীন। কেন এই পার্থক্য ?"

"ব্যবধান নিশ্চয়ই একটা এসেছে।"

"কারণ জিজ্ঞাসা করলে সোজা আমার রায় জানিয়ে বলব যে তুই অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করছিস।"

"প্রেম করছি না। তবে অন্য একব্যক্তি সম্পর্কে মনে মনে অবশ্য চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে।"

"কার সম্পর্কে ?"

"রামরাও ধড়ফেল নামধেয় একজন উকিল সম্পর্কে।"

"তার কি বিয়ে হয়েছে ?"

"না।"

"সে কি বিয়ের প্রস্তাব করেছে ?"

"না, ভয় হচ্ছে হয়তো বা করে বসবে। তবে তার ভালবাসা স্বীকার বা অস্বীকার যাই করি, বিষয়টা আমায় ভাবতেই হবে। কারণ তার জীবনধারা থেকে আমার মনে হচ্ছে পূর্বকাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত কোনও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে সে সুখী হবে না।"

"কেন ? তোর সঙ্গে তার ভালবাসা জন্মালে তবেই তো এ কথা আসে ?"

"তার প্রেম আমায় ঘিরেই থাকুক, সেটা আমার অভিপ্রেত নয়। আমি কলঙ্কিনী তাই তার স্ত্রী হওয়া অনুচিত।"

"কালিন্দী, কি রে, রামরাওয়েরপ্রতি তোরভালবাসা খুবই যথার্থ?" এস্থার জিজ্ঞাসা করল।

কালিন্দী কোনও জবাব দিল না। তবে তার মনের আবেগটা অশ্রু হয়ে ঝরতে শুরু করল।

21

ভারত-সফরের সূচী অনুযায়ী সত্যব্রত কিছুদিন দিল্লীতে কাটিয়েছিল। দিল্লীকেই সে তার ঘোরাঘুরির প্রধান কেন্দ্র করে নিয়েছিল বললে হয়তো ভুল বলা হবে না। দিল্লী সারা হিন্দুস্থানের রাজধানী আর একদা মারাঠা-শক্তির শত্রুরও রাজধানী ছিল। এখানকার আবহাওয়া কতটুকু পুণার মতো আর কতটাই বা তফাং সেটা সম্যক উপলব্ধির জন্য দিল্লীতে কিছুটা বেশী সময় তার ব্যয়িত করার অভিলাষ হল আর সে-অনুযায়ী রইলও এখানে কয়েকমাস। পরে পাঞ্জাব গিয়ে নানা জায়গা ঘুরে সে দিল্লী ফিরে আসছিল। পথে মীরাট ছাউনি স্টেশনে সে নামল। আর সেখানে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা যেটা চলছিল, তার শুনানীর অংশবিশেষ সে কোর্টে গিয়ে শুনল। কেস শুনে সে মীরাট স্টেশনে এল। যখন সে মামলা শুনতে যেত, তখন শুনানীর শেষে আদালতের ছুটির পর কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তার যে-সব আলাপাদি হয়েছিল সেকথাও তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। "মানুষে মানুষে যে শ্রেণীবিভেদ, একান্তভাবে সম্পিত্তিজনিত কারণেই তার উদ্ভব। তাই

সাম্যবাদী সম্পত্তির বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমতা স্থাপন করতে চায়।" এই প্রচেষ্টায় সেই দল কতটা সুযশ বা সাফল্য লাভ করবে মনে মনে সে ওই বিচারেও প্রবৃত্ত হল। যে সমাজে নিজের সম্পত্তি বলতে কারো কিছু থাকবে না, তরে স্বরূপটা কী হবে, সে ঠিক কল্পনা করে উঠতে পারল না। তখন সে কিছু কিছু হিন্দী সংবাদপত্র-পত্রিকা পড়তে শুরু করে-ছিল। তাতে আর্য-সমাজ আন্দোলনেরও খবর ছিল।

প্রবাসে অবস্থানকালে আর্য-সমাজের অনেক কাজকর্ম সে প্রত্যক্ষ করেছিল আর অনেক জায়গায় অনেক লোকজনের সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়েছিল। তার মনে হল যে সমাজ-সম্পর্কিত নানা প্রশ্নে, অন্য বহু সমাজ বা সমিতির চেয়ে আর্যসমাজ অনেক বেশী সজাগ।

22

সোমবার সকালে আবার বম্বে ফিরে এল কালিন্দী। নিত্যকারমতো সকালে সে শ্রমিকবস্তীতে গেল। তথ্য-অঙ্ক জমা দিয়ে ফেরার পথে কালিন্দী রামরাওয়ের দফতরে এল। রামরাও নানা প্রকল্পের কাগজ-পত্র তৈরী করছিল। তার মধ্যে একটায় ছিল মিলের যাবতীয় কাজকর্ম পুঁজিপতিদের হাত থেকে নিয়ে শ্রমিকদলের হাতে ন্যস্ত করা হবে আর সমুদয় লভ্যাংশ শ্রমিকদেরই প্রাপ্য হবে। এ সম্পর্কে অনেক পরিশ্রমে তৈরী করা কাগজ-পত্র সামনে ছড়ানো ছিল। কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল, "অঙ্কের এ আবার কী নতুন হিসাব?"

"কালিন্দী, আমার মনে নানারকম সব কল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে, তবে নিজের জীবনে এসবের কতটা কি পূর্ণ করতে পারব, তাই ভাবছি।"

"তোমার মনে আবার কি কল্পনার উদয় হল?"

"শ্রমিকদের দারিদ্র্য দূর করার একটা পরিকল্পনা আমার রয়েছে। কিন্তু কবে সেটা পূর্ণ হবে?"

"দারিদ্র্যের বিনাশ তুমি কি করে করবে? দুনিয়ায় বড়লোক আর গরীবের প্রভেদ তো রয়েছেই আর সেটা থাকবেও।"

"আছে, সে কথা ঠিক। কিন্তু থাকবেই সেটা কেমনতরো কথা?"

"দারিদ্র্য থাকবে না, সেটা নিতান্তই একটা কাল্পনিক আদর্শ।"

"হয়তো বা।"

"তবে আদর্শের পেছনে যারা ছোটে, আমি তাদের ভয় পাই।"

"কেন?"

"একশ বছর বাদে যা ঘটবে, তাতে মাথা ঘামায় আদর্শবাদীর দল। তাদের জীবনকালে কিছুই ঘটে না, কিন্তু তাদের স্ত্রী ও ছেলেপিলেদের সেই আদর্শবাদিতার পরিণামটা ভুগতে হয়।"

"কালিন্দী, সংসারের পোড়-খাওয়া মহিলাদের মতো তুমি কথা বলছ। সদ্য-স্কুলের-পাস মেয়েদের মতো নয়। এসব পাস-করা-মেয়েরা মাস্টারনীদের কাছে শেখা চলতি কথা কেবল বলে— প্রত্যেক লোকেরই একটা-না-একটা আদর্শ থাকা উচিত। সেটা পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু তুমি তো আদর্শবাদী লোকদের ভয় পাও। আদর্শবাদী লোক ধোকাবাজী করে খায় না।"

"হ্যাঁ, এরা কাউকে ঠকায় না বটে, আর তাই আমার এদের ভয় পাওয়াও উচিত নয়। কিন্তু আদর্শের দরুন এদের স্ত্রী বা সন্তানের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার হয়, সেটা আর কারুর হয় না।"

"কিন্তু কালিন্দী, যে আদর্শবাদী সে মিছিমিছি স্ত্রী আর সন্তানের মনে কি করে ভয়ের উদ্রেক করবে?"

"কি করে করবে? আদর্শের জন্য সে-ব্যক্তি স্বার্থত্যাগ করবে। আর স্বার্থত্যাগের অর্থই হল স্ত্রী ও সন্তানের পক্ষেও কিছুটা ত্যাগ।

নিজের স্বার্থত্যাগের দরুন সে প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু তার স্বার্থ-ত্যাগজনিত ক্ষতিটা তার স্ত্রী ও সন্তানকে ভুগতে হয়।''

"তাহলে এই স্বার্থত্যাগটা কি খাঁটি নয়?"

''না, সেটা সত্যিকারের ত্যাগ নয়। স্ত্রী-পুত্রের হিত-বিসর্জন সেটা।"

''কালিন্দী, তবে কি আদর্শবাদী লোকের এ-পৃথিবীতে থাকারই কোনও অধিকার নেই?"

"আমি বলছি না যে পৃথিবীতে থাকার তাদের অধিকার নেই। তবে বিবাহাদি করে সন্তান-উৎপাদনের কোনও অধিকার নেই।"

"খুবই যথার্থ বলেছ কালিন্দী। আমার মনেও প্রশ্নটা বার-কয়েকই জেগেছে যে বিয়ে আমি করব কি করব না। তবে এখন তোমার জবাবটায় আমি পথের নিশানা পেয়ে গেছি।"

"কি রকম?"

"আদর্শবাদী লোকের বিবাহ তথা সন্তান-উৎপাদনের অধিকার নেই এ কথা স্থিরভাবে বুঝলাম।"

"বিয়ে করবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে?"

"নিশানাটা আজ পেলাম। তবে এটা কাজে পরিণত করার পাকা সিদ্ধান্তটা পরেই হবে।"

"নিশানা আর সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে।"

"অনেক পার্থক্য।"

"ভালোই করেছ। একটা পথ খোলা রাখলে নিজের জন্য," কালিন্দী হেসে বলল।

"সেটা কেমনতরো?"

"আমি 'বিয়ে করব না' বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনেক পুরুষই দেখেছি।"

''আমার সহকর্মীরা কেউ কেউ যখন এব্যাপারে স্থিরনিশ্চয় হন তখন আমি তাদের ভুল হচ্ছে বলে ভাবতাম। তবে আমার এখন আর

তাদের ওপর রাগ করা উচিত নয়।”

“তোমার সহকর্মীরা এমন কী করল যে তোমার রাগ হল?”

“এই দেখো আমরা শ্রমিকদের নেতা হয়ে গেলাম, কিন্তু আয়ের কোনও পথ নেই আমাদের। শ্রমিকদের পয়সা থেকে বেতন বলে কিছু আমরা নিতে পারি না। মিথ্যা হিসাব দাখিল করে যা কিছু কামিয়ে নেওয়া সম্ভব, সেটাই আমাদের রোজগার। এরকম অবস্থায় আমাদের মতো শ্রমিক নেতাদের বিয়ে করাটা কঠিন হয়ে পড়ে···কিন্তু তবুও··· তবুও···তবুও···।”

“কী তবুও?”

“তোমার মতো পবিত্র মেয়ের সামনে সেসব মেয়েদের কথাটা বলাও কঠিন।”

‘পবিত্র মেয়ে’ কথাটা শুনে কালিন্দীর মনোভাবটা কী হল, সেটা সহজেই অনুমেয়। তবুও জানার বাসনায় কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল, “তুমি জানার আকাঙ্ক্ষাটাই মনের মধ্যে বাড়িয়ে দাও, কিন্তু সব কথা আর বলো না।”

“সব কথা বলতে আমার আপত্তি কিছুই নেই, কিন্তু যা তোমায় বলব সেটা যদি সভ্য মহিলাদের বলা অনুচিত হয়, তবে কথাটা বলার জন্য কিন্তু আমায় দোষী কোরো না।”

“রামরাও, শ্রমিক-বস্তীতে ঘোরা-ফেরার দরুন যাকে বামমার্গ বলা হয়, এর অনেক মন্দ রীতি-নীতিই আমি জানি। সত্য কথাটা বলতে তাই তুমি বিন্দুমাত্র সংকোচ কোরো না।”

“আমাদের শ্রমিক নেতৃবর্গের কেউ কেউ বলে যে আদর্শহেতু আজীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে, তাই আমাদের বিয়ে না হওয়াটাই ভাল অর্থাৎ, বিয়ে আমাদের করাই হবে না।”

“আদর্শহেতু বা দেশভক্তির জন্য বিয়ে না করার অজুহাতটা পুরানো

হয়ে গেছে।”

“কিন্তু আমাদের সংকল্পটা এত সোজা সরল নয়। তবে আমরা এটুকু তো দেখেছি যে মেয়েছেলে আমাদের দরকার। তাই শ্রমিকদের মধ্যে নেতাগিরির জন্য কিছু কিছু সুন্দরী যুবতীদের উৎসাহদান করা হয় আর সেসব মেয়েদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে পুরুষের দল কাছে কাছেই থাকে।”

“বাঃ! চমৎকার আদর্শ!”

“তত্ত্ব-দর্শনের দিক থেকে কম্যুনিস্টদের কাছে বিবাহ বা বিনা-বিবাহে স্ত্রী-পুরুষ একত্র থাকাটা একই ব্যাপার।”

রামরাওয়ের এই কথাটা শুনে কালিন্দীর মনে হল এ-ধরনের দর্শন তো তার পক্ষে বড় উপযুক্ত। এ বিষয়ে আরো জানতে ইচ্ছা হল, তাই সে প্রশ্ন করল, “এধরনের আদর্শে বিশ্বাসী মেয়েও কি পাওয়া যায় কোথাও ?”

“হ্যাঁ, য়ুরোপ-প্রত্যাগত মেয়েদের মধ্যে এ-ধরনের কিছু মেলে। নামমাত্র বিয়ে কারুর সঙ্গে এদের হয়, তবে শেষ অবধি এদের আচার-ব্যবহার নিরঙ্কুশ।”

“এ-ধরনের শিক্ষিতা মহিলা কি ভারতবর্ষেও আছে ?”

“বাঙালী বা বিহারী মেয়েদের মধ্যে এ-ধরনের কিছু কিছু এখানেও নিজেদের খেল দেখাচ্ছে।”

“সত্যি সত্যি ?”

“যখন এরা এ পথ ছেড়ে চলে যাবে, তখন আমি বলব সব।”

“তবে আমি মানতে রাজী নই যে এসব মেয়েরা কম্যুনিস্ট বিচারানু-যায়ী আচার-আচরণ করছে।”

“তা হলে ?”

“যদি কোনও কুমারী মেয়ে বিবাহ অথবা বিনা-বিবাহের বন্ধনকে

একই ব্যাপার মনে ক'রে কোনও পুরুষের সঙ্গে কাটায়, তবে আমি বুঝব যে সে তার নীতিগত আদর্শ-ই পালন করছে। কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনে যার-তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে চলে, এমনও বহু মেয়ে আছে। কিম্বস্নুনা বা বহুপতিত্ব প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। তুমি বলছ এসব মেয়ের অবাঞ্ছিত-মাতৃত্ব-জনিত সংকটের কোনও বালাই নেই। আর তাই এরা প্রথা হিসাবে বিবাহের প্রতি কোনও গুরুত্বই আরোপ করে না। অন্ততঃ সেভাবেই কথাটা বলা যায়।''

"হ্যাঁ, এ তো খুবই সত্যি।"

"তুমি তো বলছ এসব মেয়েরা বিয়ের যা লাভ তা পুরোই গ্রহণ করছে, কিন্তু কর্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছে।"

"কথাটা খুবই খাঁটি, কিন্তু এসব মেয়েরা লোকপ্রিয় হয়।"

"আচ্ছা, এদের কথা কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি।"

"আমি এটুকুই বলছিলাম যে আমাদের শ্রমিক নেতারা যখন এ-ধরনের কোনো মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতায়, তখন আমরা আজও এদেরই দোষারোপ করি। কিন্তু বিয়েতে গররাজী আদর্শবাদী লোকেদের এরকম আচরণ ক্ষমার যোগ্য বলেই বিবেচনা করি।"

অবিচলিত কণ্ঠে কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, তা হলে তুমিও কি অনুরূপ আচরণ করবে?"

"আমি আমার নিজের কথা বলছি না। কিন্তু যাদের নিয়ে বিচার চলে না, তাদের অন্তুতঃ এই পাণ্ডব ধর্ম পালন করা উচিত।" রামরাও সুচিন্তিতভাবেই কথাটা বলল।

"কেন, আদর্শবাদী আরও একটা পথ অবলম্বন করতে পারে।"

"কি সেটা?"

"আদর্শবাদী আর স্বার্থত্যাগীর দল আর যারা সাহিত্য-সেবা, জাতি-সেবা, বিজ্ঞান-চর্চা এসব লাভ-স্বার্থ-হীন সেবায় রত পুরুষেরা…।"

"কি করা উচিত ?" ঔৎসুক্যভরে রামরাও প্রশ্ন করল।

"তাদের রোজগারী মেয়ে বিয়ে করা উচিত।"

"রোজগারী মেয়ে মানেটা কি ?"

"মহিলা ডাক্তার, নার্স, মাস্টারণী আর আজকাল মহিলা-উকিলও রয়েছে ?"

"আমাদের যেমনই হোক-না, তেমনটি হচ্ছে আর কোথায় ?"

"কেন ?"

"যে মেয়েরা রোজগার করে, তারা আমাদের মতো লোকদের কেন বিয়ে করবে ?"

"তার কারণ তাদেরও স্বামী প্রয়োজন।"

"আমি বলব না যে তাদের স্বামীর প্রয়োজন নেই। কিন্তু শ্রমিক-নেতাদের মতো যারা বিনা লাভের পেশায় রয়েছে, তাদেরকেই বা পতি-রূপে এরা নির্বাচন করবে কেন ?"

কথাবার্তার প্রধান প্রসঙ্গটা বদলে যাচ্ছে। এটা ভাল লক্ষণ নয় বুঝে কালিন্দী প্রশ্ন করল, "কথাবার্তাটা আমাদের কি বিষয়ে হচ্ছিল ?"

"শ্রমিক নেতাদের গার্হস্থ্য-ধর্ম বিষয়ে।"

"হতে পারে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের পয়সার অসচ্ছলতা রয়েছে, তবে তাদের প্রাচীন যুগের পাণ্ডব-ধর্ম আচরণের আবশ্যকতা নেই বলেই আমি মনে করি।"

"তাহলে, এ কথা থেকে কী প্রমাণ করা যেতে পারে ?"

"লেখাপড়াজানা অবিবাহিত মেয়েদের মনোভাব আমার বেশ ভাল রকমই জানা আছে। তুমি সামাজিক কর্মে রত মেয়েদের কথা বলো।"

"কি কথা ?"

"যাদের বয়স ত্রিশের ওপরে আর নিজের কাজ নিয়ে যারা ব্যস্ত, এমন সব মেয়েদেরও বিয়ে করার সাধ জাগে।"

"মানছি সে কথা।"

"আর এসব মেয়েদের পতির জন্য অপেক্ষার ব্যাপারটাও যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন হয়।"

এ কথা বলার সময় কালিন্দী যেন মনশ্চক্ষে এস্থারকে সামনে দাঁড়ানো দেখতে পেল।

রামরাও বলল, "আচ্ছা বেশ।"

"তাই অতি সাধারণ অথবা অনিশ্চিত রোজগারী কিন্তু সৎকার্যে রত সুশিক্ষিত যুবকের এ-ধরনের মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে শঙ্কিত হওয়া অনুচিত।"

"যদি কোনও পুরুষ এ ধরনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে আর সে মেয়ে যদি চাপরাশীকে ডেকে বাইরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে বলে, তখন?"

"তা, সেজন্যও তৈরী থাকতে হবে। তবে এব্যাপার হামেশা ঘটে না। তাই, 'ভয় পাওয়া উচিত নয়' কথাটা আমি বুঝে শুনেই বলছি। পাছে থাপ্পড় খেতে হয় এ-ভয়ে যুবকদের "প্রপোজ" করতে শঙ্কিত বা কুণ্ঠিত হওয়া অনুচিত। যখন পুরুষ নিজে বিচার করে বিবাহে অগ্রসর হয়, তখন এক-আধবার তার থাপ্পড় জুটলেও জুটতে পারে। পুরুষ যখন প্রথমে মেয়ের কাছে 'প্রপোজ' করে তাই কি মেয়ে স্বীকার করে নেয়? আর মেয়ে বা কি কোনও পুরুষ কেউ প্রথম 'প্রপোজ' করলেই অন্যদল তা মেনে নেয়?"

"আমি জিজ্ঞাসা করছি, যে পুরুষের আয় অনিশ্চিত, তেমন পুরুষকে স্বীকার বা গ্রহণে রাজী এমন মেয়ে কি সত্যি কোথাও আছে? তোমায় অন্ততঃ সেরকম মনে হয়। তাই না?"

"হ্যাঁ, এ কথায় তোমার সন্দেহ কোথায়?"

"আমার সন্দেহ রয়েছে।"

"কেন?"

" 'কেন' আবার কিসের জন্য ?"

"কিছু রোজগার করে এমন মেয়েও আমি দেখেছি রোজগারী স্বামী পেয়ে নিজেরা রোজগার বন্ধ করে দেয়। এদের ধরনই এ-ই।"

"এ কথাটাও ঠিক।"

"আমি একজন নার্সকে জানি। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর সে নিজের রোজগারের রাস্তা ছেড়ে দেবার মতলব করছিল। স্বামীর দরুন আয়ের ব্যবস্থা একটা ছিল। তাই বিয়ের পর— সত্যি বলতে পুনর্বিবাহের পর একে অন্যের বিয়ের কারণটা খুঁজে পেল, তখন উভয়ের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হল; আজকাল দুজনে নিত্যদিন কেবল ঝগড়াই করে।"

"এটা সম্ভব। কিন্তু রোজগার-বিহীন সুস্বভাবের পুরুষকে বিয়েতে রাজী এমন মেয়েও খুব মিলবে। তার সঙ্গে তোমাদের কম্যুনিস্টদের আরেকটা লাভও আছে। তোমরা জাত বিচার করো না। বিধবা বা কুমারীর প্রশ্নও তোমাদের নেই। তোমার মতো পুরুষ তাই পুরো স্বাধীন। তাই রোজগারী মেয়ে পেতে তোমার মতো কম্যুনিস্টদের খুবই সুবিধা। রোজগারী মেয়েদের মধ্যে অনেকেই বিধবা। অনেকে একেবারে নীচু জাতের। এসব কারণে বিয়ে হবে না ভেবে এদেরকে রোজগারের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তাই তোমাদের মতো ছেলেদের পাণ্ডব-নীতিকে আর্যনীতি জ্ঞান করে ওপথে যাবার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকেরই বিবাহ করা সম্ভব।"

দুজনের কথাবার্তা আরও চলত। কিন্তু রামরাওয়ের ঘড়ির প্রতি লক্ষ্য ছিল। তাই সে বলল, "আজ নিজেদের কথা প্রচুর হল, এর পরে আরও বলা চলত। কিন্তু আজ আর বলতে পারছি না। অন্য সব লোকেরা আমার কাছে আসছে, তাই আমায় সে-কাজে লিপ্ত হতে হবে।"

রামরাও এ কথা বলতে বলতেই ওখানে সাক্ষাতের জন্য অন্য সব লোকজন এসে গেল। রামরাও বলে উঠল, "আজ তোমরা হিসাবপত্র এনেছ?" কালিন্দী ভাবল, এবার চলে যাওয়া উচিত। ওভার-কোট ও ছাতা নিয়ে সে চলে গেল।

খবর দিয়ে আনা সব লোকজনের সঙ্গে রাত বারোটা অবধি রাম-রাওয়ের কথাবার্তা হল। এরা সবাই চলে যাওয়ার পর রামরাওয়ের মস্তিস্ক নানা চিন্তায় ভরে উঠল। কালিন্দীর ওকথা বলার কী কারণ? আমি যদি 'প্রপোজ' করি তবে তার কাছে সেটা অপ্রিয় হবে না। এরকম বলার তো কোনও কারণ কালিন্দীর ছিল না। কথাটা রামরাও চিন্তা করতে লাগল।

23

সত্যব্রতের পত্র কালিন্দী পেল; সেটা উষার কাছে লেখা। এখনও ডগ্‌গে পরিবার কালিন্দীর ঠিকানাটা জানত না। কালিন্দীর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার যে আদেশ আপ্পাসাহেব দিয়েছিলেন, সেটা তখনও অপরিবর্তিতই ছিল। আর এই কারণেই কালিন্দী বম্বে আছে, এস্থার-বাঈ মারফৎ এ খবর পাওয়া সত্ত্বেও, কালিন্দীর ঠিকানাটা কেউ আর জিজ্ঞাসা করে নি।

কালিন্দীকে লেখা সত্যব্রতের চিঠিটা উষার কাছে লিখিত খামটাতেই ছিল। তাতে উষারও একটা চিঠি ছিল। "তোমার চিঠিটা বাবাকে দেখিয়ো আর কালিন্দীর কাছে তার চিঠিটা পাঠাবার ব্যবস্থা করো, তবে এমনভাবে করবে যেন সেটা শিবশরণের হাতে না পৌঁছায়," এভাবে

তাতে সত্যব্রত লিখে দিয়েছিল। অর্থাৎ, কালিন্দী এখনও শিবশরণের কাছে রয়েছে বলেই তার ধারণা ছিল। চিঠি থেকে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। এখন শিবশরণ যাতে না দেখতে পায় এভাবে চিঠি কালিন্দীর কাছে পৌঁছে দেওয়াটা খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল। উষাকে লেখা চিঠিতে 'এ পত্র বাবাকে দেখিয়ো' এমনই লেখা ছিল। কিন্তু চিঠি-খানা পড়ার পর, বাবাকে এটাকে দেখানো চলে কি-না, সে বিষয়ে উষা সত্যি সত্যি দোটানায় ছিল ; কারণ, 'কালিন্দীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা চলবে না' এরূপ কড়া আদেশ সত্ত্বেও সত্যব্রত কালিন্দীকে চিঠি লিখে তাকে সমাজ-সেবার কাজে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছে। এর অর্থ কি ? তার পত্র-বিনিময়ের মধ্যে 'আমি কি করে সামাল দেব ?' —এ প্রশ্নটাও উষার মনে জেগেছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ সে খুঁজে পায় নি। যদিও সত্যব্রত চিঠিটা বাবাকে দেখানোর জন্য বলেছে, কিন্তু দেখাতে গিয়ে ভয়ও হয়েছে। কারণ, বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, "যে দুষ্টার নামও উচ্চারণ করা উচিত নয়, তোমার মারফৎ তারই সঙ্গে পত্র-বিনিময় চলছে ?" অন্ততঃ তার তাই মনে হল। কিন্তু বাবাকে চিঠিখানা দেখাতে লিখেছে সত্যব্রত। তাই এই প্রশ্ন আপাতত অর্থহীন। গত বছর-দুই-আড়াই যাবৎ, কালিন্দীর গৃহত্যাগের পর, উষার প্রাপ্ত-প্রেরিত যাবতীয় পত্রই আপ্পাসাহেব খুলে পড়তেন। এবারও সত্যব্রতের চিঠি আপ্পা নিজে পড়ে উষাকে দিয়েছেন। এটা দেবার সময়ও ওকে আপ্পাসাহেব কিছুই বলেন নি আর কালিন্দীকে পাঠানোর চিঠিও আটকে রাখেন নি। তা হলে উনি হয়তো চিঠিটা পাঠানোর স্বপক্ষেই।

উষার ইচ্ছা ছিল চিঠিটা সম্পর্কে বাড়ীতে বাদানুবাদ যা হয়, সেটা কালিন্দীকে জানায়। কিন্তু বিতণ্ডা কিছুই হল না। পরের দিন আপ্পা-সাহেব উষাকে কেবল এটুকুই বললেন, "আপ্পা চিঠিটা পড়েছে, এ-কথাটা আবাকে জানাবে আর আমাদের খবর-বার্তা জানিয়ে লিখবে যে

আমাদের কী করণীয়, সেটা তোমার চিঠিতে পুরো বোঝা যাচ্ছে না। তুমি এখানেই চলে এসো। তখনই ভবিষ্যতের কথাটা ভাবা যাবে।”

আপ্পাসাহেবের এ কথাটা শুনে ঊষা আর শান্তাবাঈ দুজনেই অবাক হল। আবার ওপর আপ্পা রাগ করে আছেন এসব ধারণাই দুজনের হয়েছিল আর তাই আবাকে বাড়ী ফেরার আমন্ত্রণ আপ্পা জানাচ্ছেন দেখে সবারই আনন্দ হল। সেদিন বড় আনন্দিতচিত্তে ঊষা স্কুলে গেল আর সব কথা শোনাল এস্থারকে।

সত্যব্রতের পত্রে আপ্পাসাহেব সত্যি সত্যি বিশেষ আনন্দলাভ করেছিলেন। ‘আবা আমার চিন্তাধারার অনেক কিছুই এখন লাভ করেছে। সে আর আমি কি একই দৃষ্টি নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছি না? সে নয়া মানুষের দৃষ্টিতে বিচার করছে আর আমি এখনও ‘ব্রাহ্মণ’-ভাবনায় ভাবিত হচ্ছি।’ এই চিন্তা মনে উঁকি দিতেই উনি ছেলেকে আসতে বললেন।

পরের দিন কালিন্দীকে দেবার জন্য ঊষা এস্থারকে চিঠিটা দিল। সত্যব্রতকে বাবা বাড়ী ফিরতে বলেছেন আর ফেরার জন্য সে'ও তাকে লিখছে এ-ও সে বলল। চিঠিটা এস্থারবাঈ কালিন্দীর কাছে পাঠিয়ে দিল আর ঊষা যা যা বলেছে তা-ও জানাল।

24

বৈজনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে আপ্পাসাহেব যখন দেখা করতে গেলেন, সে সময়ে তিনি ডেকান জিমখানার একখানা ছোট-বাংলোতে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী শারদাবাঈ তখন গত হয়েছেন। তাই তাঁর সেই পুরানো

বিধুর-নিঃসঙ্গতাবোধ আবার তাঁকে পীড়া দিতে শুরু করেছিল। খাওয়া-দাওয়ার কষ্টও ছিল। দেবল নামক নাট্যকার লিখিত "শারদা" নাটকের একটা বিখ্যাত উক্তি "আমিও আমার শয্যা গ্রহণ করছি" যেন বার বার তিনি অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ঐতিহাসিক ব্যাকরণ আর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণার কাজেও বাধা পড়তে আরম্ভ হয়েছিল।

আপ্পাসাহেব যখন দেখা করতে গেলেন তখন শাস্ত্রীজী নিজের যাবতীয় কথা তাঁকে শোনালেন। তাঁর প্রতীক্ষা কিভাবে ব্যর্থ হল আর কোন সমাজ আজ শাস্ত্রীয় সত্যের সন্ধানে রত— এসব কথা কিভাবে স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা করা যায়, এই বিরাট সপ্তকাণ্ড-কাহিনী কিভাবে শোনানো যায় -- এসব ভাবতে ভাবতে চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। কিন্তু পরে দেখা গেল যে আপ্পাসাহেবের কুলের কলঙ্ক-কথা আর কালিন্দীর কাহিনী শাস্ত্রীজী পুরোই অবগত আছেন। আলোচনা থেকে এসব তথ্য জানার অপেক্ষায় তিনি থাকলেন না। যখন চিঠি দিয়ে দেখা করার কথাটা শাস্ত্রীমশাইকে জানিয়েছিলেন, তখন তিনি এ-কথাটাও জুড়ে দিয়েছিলেন— "জাতিভেদ দূরীকরণে যারা সচেষ্ট তারা সবাই মাঝপথে ঘূর্ণিপাকে পড়ে যায়। সেটাই হিন্দুসমাজের স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে উদ্ধার পাবার পথ কি কিছু আছে না নেই। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানার জন্য একটু আলোচনা আপনার সঙ্গে করতে চাই। কবে এলে আপনার সুবিধা সেটা দয়া করে জানাবেন।"

দেখা করার ব্যাপারে বৈজনাথ শাস্ত্রীর দিক থেকে জবাব এল— "বাড়ীতে সব সময়টাই আমার লেখায় ব্যয়িত হয়। ঘরে বসতে হলে, লেখার জন্যই আমার বসা প্রয়োজন। আরও বেশী বসতে হলে, খোলা বাতাস ছেড়ে ঘরে বসায় আমার আদৌ সময় নেই। কথা-

বার্তাই যদি চালাতে হয়, সেটা ঘরেই হওয়ার কি প্রয়োজন ? তাই বাড়ীতে আমি সাক্ষাতের পক্ষপাতী নই। আমি ঘুরতে বেরোই, সে সময় তুমিও এসো, একত্রে বেড়াব। আগামী রবিবার অপরাহ্ণ তিনটা নাগাদ পাগুয়া মারুতীর চড়াইয়ে আমি ঘুরতে যাব। তখন তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

বৈজনাথ শাস্ত্রীর চিঠিটা আসার পর রবিবার আপ্পাসাহেব বৈজনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পাগুয়া মারুতীর দিকে বেড়াতে গেলেন।

পাহাড়ী চড়াই-পথে অর্ধেক উঠে বৈজনাথ শাস্ত্রী চারিদিকে তাকালেন আর আপ্পাসাহেবকে বললেন, "তোমার প্রশ্নটা কি ?"

আপ্পাসাহেব উত্তর দিলেন, "জাতিভেদ দূরীকরণে যারা সচেষ্ট, তারা সামাজিকভাবে অবদমিত বা নীচু হয়ে থাকবে, সেটাই কি তাদের ভবিষ্যৎ ? আমার সামনে এটাই প্রশ্ন।"

"কবি বলেছেন আর সে-অনুসারে আমারও মনে সত্যি সত্যি ভয় জাগছে যে জাতিভেদ-বিরোধীদের সামাজিক দুর্গতির একশেষ হবে। সমাজের অন্য সব শ্রেণীর চেয়ে যা বড় এমন একটা শ্রেণী তৈরীর ধ্যান না থাকায়, অসবর্ণ-বিবাহের সন্ততিবর্গ বিদুর, বর্ণসঙ্কর আর কডু মারাঠার দল ভারী করতে থাকবে। কিন্তু এই মহাকর্মের আদর্শ জাতিভেদবিরোধীদের সামনে থাকলে, 'মূর্ধন সর্ব লোকস্য' এটাই তাদের ভবিতব্য দাঁড়াবে।"

"কিন্তু সমাজের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী তা হলে কি ভাবে তৈরী হবে ?"

"এটা যাঁর জানা, তিনি তো বিশ্বের এক মহাপুরুষ।"

"তার মানে এবিষয়ে আপনারও জানা নেই ?"

"প্রত্যেক কালেই পুরানো শ্রেণী-সমাজ ভেঙে নতুন তৈরীর প্রক্রিয়া চলছে। জাতিভেদের প্রতি নির্দেশ করে, সেই লক্ষ্যাভিমুখীদের তা হলে আরেক নতুন জাতি গড়ে তোলো বলে আহ্বান জানাচ্ছ

কেন ?”

“আমি সেরকম চাই না। জাতিভেদ-দূরকারীরাই যদি আরেক জাতের সৃষ্টি করে, তবে তাদের আগে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।”

“কিন্তু এ-ধরনের যাদের আগ্রহ, তাদের মনোভাবটা পাকাপোক্ত হওয়া দরকার। তুমি সেরকম দৃঢ়মত নও।”

“আপনি আমার মনের দৃঢ়তা সম্পর্কে সন্দিহান কেন ?”

“হাঁ, সন্দেহ করছি।”

“কিন্তু, কেন ?”

“তোমার যে কর্মফল বহন করছে, তুমি তাকে তিরস্কার করছ।”

“কি করে ?” আপ্পাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

“তুমি তো তোমার মেয়ের নামটাই খারিজ করে দিয়েছ ?”

“সে যদি সুশিক্ষিত কুমারী নাম কলঙ্কিত করার মতো কাজ করে, সেটা কি প্রশংসনীয় ?”

“সে মন্দটা কী করেছে ?”

“আপনার মতো লোককে সেসব কুকর্মের কথা কী আর বলব।”

“আমি কিন্তু এতে খারাপ কিছু দেখছি না।”

“সত্যি বলছেন ?”

“পুরুষ-সত্তার পূর্ণ-অধিগত না হয়েও, পুরুষ-সাযুজ্যের পথে সে তার মাতৃত্বের অধিকার কায়েম করেছে। আর অন্য কী সে করেছে ?”

“মেয়েলোকের পক্ষে বিনা বিবাহের মাতৃত্বকে মেনে নেওয়াটা কি খুব ভাল কথা ?”

“সেটা ভুলই বা হতে যাবে কেন ? সমাজের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধাচরণ এটা, এটুকুই বলব আমি।”

“কেন ?”

"মেয়েদের করণীয় আর পালনীয় সব রীতি-নিয়ম এ-সবই মধ্যবিত্ত তথা উচ্চবিত্ত সমাজ তৈরী করেছে। যে সমাজে পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্ততিবর্গের ভরণ-পোষণ করে, সেখানে তারা স্ত্রীকে আপন অধিকারের মধ্যে রেখেছে। কিন্তু আর্থিকভাবে স্ত্রী যখন স্বাধীন, তখন কোন নিয়ম খাটবে, সেটা ছুনিয়ায় এখনও স্থির হয় নি। সেটা স্থির হওয়া প্রয়োজন। তুমি তোমার মেয়ের আচরণের রহস্যটা জানতে চেয়েছিলে ?"

"না।"

"সব জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তুমি তাকে মন্দ আখ্যা দিচ্ছ।"

"আপনার বক্তব্য কি ?"

"এ-ছুনিয়ায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করার মতো কোনও শ্রেণী বা সমাজ তৈরী করতে গেলে, তার গোড়াপত্তনের জন্য সাথে সাথে চাই নতুন নীতিশাস্ত্র আর ভিন্ন ধরনের সামাজিক আদর্শ। তুমি কী করলে বা তোমার মেয়েই বা কী করল, তার কোনও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তুমি কর নি। তোমার শ্বশ্রূমাতা স্বাবলম্বিনী ছিলেন। তিনি স্বামী স্বীকার করেন নি এবং বিনা বিবাহে সন্তানের জন্মদান করেছেন। কাজটা তুমি অনুচিত মনে করছ, কিন্তু সেই মহিলার মেয়েকে বিয়ে করে উদারতা দেখিয়েছ এমন ভাবছ। তোমার মেয়েও বিয়ে না করে একজনের সঙ্গে থেকেছে, সেটা তুমি অনুচিত মনে করছ। তোমার সমস্ত ব্যবহারটাই পুরানো চিন্তার পরিচয়, তোমার শাশুড়ী বা মেয়ে কোন অনুচিত কর্মই করে নি। তাদের জীবনের গূঢ়ার্থ তুমি অনুধাবন করতে পার নি। এটা আগে বোঝ।"

"আপনি তা বুঝেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কী সেটা ?"

"তোমার শাশুড়ী মাতৃতান্ত্রিক পরিবার স্থাপন করে গেছেন। পরে সে পরিবারেরই এক মেয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে পিতৃপ্রধান পরিবারে আপনস্থান সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছে। তোমার মেয়ে এখন আবার মাতৃতান্ত্রিক পরিবার-স্থাপনার প্রতি ঝুঁকেছে।"

"সমাজ-বিষয়ে আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ-কথা অনেক হল। তা হলে আপনার বিচারে সব কুলটা-বেশ্যা মেয়েরা দুরাচারিণী নয়, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার-প্রতিষ্ঠাত্রী মহিলা সব।"

"অর্থাৎ, এরা দুরাচারিণী নয়। যখন মেয়েরা স্বাধীনা ও স্বাবলম্বিনী হচ্ছে, তখন বেদোক্ত পুরুষ-নারীর বন্ধন আর কার্যকরী-থাকছে না। নর্তকীর জন্যই বা কী নীতি-নিয়ম হওয়া উচিত, তাও আপনি পুনর্বিবেচনা করুন। স্বাবলম্বিনী নারীর জন্য পতিসেবার ধর্ম আর থাকবে না। যেহেতু স্বামীর অধিকার তাদের উপর চলবে না, তাই উপার্জনশীলা মেয়েদের জন্য পাতিব্রত্যের কোনও অনুশাসনই নির্দেশ করা হয় নি।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন যে আর্থিকভাবে স্বাধীনা যেসব মেয়ে, পাতিব্রাত্য-ধর্মটা তাদের জন্য অচল।"

"আমি এটুকুই বলতে চাইছি যে এসব নিয়মের কড়াকড়ি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিজেদের যারা উচ্চশ্রেণীর মনে করে তারা তথাকথিত নিম্নবর্গের মেয়েদের রীতি-নীতির কথাটাই বার বার বলে। কিন্তু এভাবে কিছু বলাটা অহেতুক। আমি কখনই মনে করি না যে সেই শ্রেণীর মেয়েদের বিচার-আচার আর ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়েদের ধ্যান-ধারণা পৃথক। মনোভাব ভিন্ন নয় তবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবটা বেশী লক্ষণীয়।"

"কোন শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা আপনি বলছেন? খাঁটি-কথাটা এই যে উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে আর্থিক স্বাবলম্বন দেখা যায় না। পয়সা

রোজগারের দায়িত্বটা তাদের উপর ন্যস্ত নয়। আর তাই মেয়েরা উপার্জনশীলা হলে, তাদের আচরণটা অন্যরকম হয়ে যায়।"

"এই যদি মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ায়, তবে আমি বলব যে সে-স্বাধীনতাটা তাদের আদৌ দেওয়া ঠিক নয়।"

"তবে এ-ধারণাটা বলবৎ থাকবে না। বিধবা আর কুমারীদের নিজেদের জীবিকা নিজেদেরই উপার্জন করতে হবে আর বহুসময়েই পুরুষদের স্বীয় দুর্বলতার জন্য রোজগারের দায়িত্বটা মেয়েদের ওপর এসে বর্তাবে। বহু মেয়েরই আর্থিক স্বাধীনতা সদাসর্বদা থেকে যাবে। এই সামাজিক সত্যটাকে চোখ মেলে দেখে মেয়েদের জন্য নতুন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে হবে।"

"কোন্ ধরনের সেটা?"

এতখানি কথাবার্তার পর শাস্ত্রীজীর খেয়াল হল যে চড়াই-পথে চলতে গিয়ে হাঁপ ধরেছে। তাই তিনি একটা পাথরের ওপর বসলেন আর একটু বিশ্রাম নিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে তাতে টান দিয়ে জবাব দিতে লাগলেন।

"নতুন নিয়ম-অনুশাসন অনুসারে প্রত্যেক স্ত্রী বা পুরুষের বিয়ের সময় পরিবার মাতৃ- বা পিতৃ- তান্ত্রিক কী ধরনের হবে স্থির করার স্বাধীনতাটুকু থাকা প্রয়োজন। তদনুযায়ী বিয়ের স্বাধীনতা তাঁদের থাকবে। মাতৃতান্ত্রিক ধারা হলে ইচ্ছা করলে স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করতে পারবে। স্বামী বা সন্তানের সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকবে না। এমন অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের একত্র থাকা নিষ্প্রয়োজন।"

"আপনার এই সংস্কার কেউ মানবে না। প্রাচীন মুনি-ঋষিদের ধর্ম যারা আঁকড়ে ধরেছে সেই হিন্দুই আপনার বক্তব্য গ্রহণ করবে না। আর নবীনেরাও একে স্বীকার করবে না।"

"না মানে তো না-ই মানল। যারা মানার তারা মানবে।"

"এর মানে কি এই যে পৃথিবীর সব ধর্মবেত্তাদের চেয়ে আপনি নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করেন ?"

"হ্যাঁ, তাই। দুনিয়ার তাবৎ ধর্মবেত্তারা যতটুকু ইতিহাস জানতেন, তার চেয়ে বেশী আমি জানি। তাই তাদের প্রশংসা আমার সামনে আর করবে না।"

"প্রাচীন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র... ।"

"আর তাদের মধ্যে আমি বৈজনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আপ্পাসাহেব আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু শাস্ত্রীমশাই, আজ যে মতামত আপনি ব্যক্ত করলেন, তা সবই কি আপনার নিজের ?"

"আমার স্ত্রীর প্রিয়ম্বদা গোদবলে নামে এক সই ছিল। মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে তিনি আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন যে যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র পুরুষেরাই লিখেছে আর যে ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিপালনকারী পুরুষেরাই এর প্রণেতা, তারাই সব সমাজের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষে যেসব মেয়েরা পরিবার প্রতিপালনের জন্য বাড়ীর বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করে, হিসাবে তা তিন-চতুর্থাংশ। এই অবস্থায় পুরুষ-প্রতিপালিত এক-চতুর্থাংশ মেয়েদের জন্য যে নিয়ম-নির্দেশ প্রচলিত রয়েছে সেটা সমাজের পুরো অংশে চালু করাটা নিতান্তই অন্যায় ব্যাপার। তিনি বার বারই আমার স্ত্রীকে বলতেন দেশের সম্পদ মেয়েরাই, পুরুষ নয়। ধরা যাক, কোনও যুদ্ধের দরুন সমাজের তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ মারা গেল, কেবল মেয়েরা আর বাচ্চারাই রইল। তখন পরের সিঁড়ি বহুপত্নীত্ব প্রথানুসারে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। আর মেয়েরা যদি সব মারা যায়, কেবল পুরুষেরাই জীবিত থাকে, তাহলে রাষ্ট্র-বল-বৃদ্ধি কেমন করে ঘটবে ? তাই প্রজা-বর্ধনের যে নীতি-নিয়ম, তা পুরুষ কখনও তৈরী করতে পারে না।"

"শাস্ত্রীজী, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?"

"আমাদের ধর্ম আর পাপ-পুণ্য সংক্রান্ত চিন্তা-কল্পনা নিয়ত পরিবর্তনশীল। খাঁটি বৈদান্তিক পাপ-পুণ্য মানে না। বলা যেতে পারে, যে কোনও আচার-আচরণই পাপ-পুণ্য তথা ব্যবহার-সাপেক্ষ। নির্ভয়ে এসব বিচার-পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। কেউ কি এপর্যন্ত সেরকম পরীক্ষা বিচারে এগিয়ে এসেছেন? পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানীও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ও কর্মরত পাদ্রীদের ভয় পায়। এই কারণে ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তনের অধিকারী ব্রাহ্মণকেই সংস্কার-ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। আর তা সূত্রপাতের উদ্দেশ্যে আমি বৈজনাথ শাস্ত্রী নিম্নোক্ত নিয়ম জারী করছি।"

"অবিবাহিত অবস্থায় কোনও মেয়ে যদি মা হয়, তবে সেটা কার্যত পাপ নয়। পাপ একে বলা হয়, কারণ পরিণামটা এর মঙ্গলজনক নয়। বিয়ে না করে মেয়ে যদি পুরুষের সঙ্গে কাটায়, সে অবস্থায় পুরুষের সম্পত্তিতে তার কোনও অধিকার বর্তায় না। যে-সন্তান এ-অবস্থায় জন্মায়, তারও পিতার সম্পত্তিতে কোনও অধিকার বর্তায় না। এই কারণে বিনা বিবাহে সন্তান-উৎপাদন নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সবই পয়সার খেলা। এর সঙ্গে লোক, পরলোক বা ঈশ্বরের কোনও সম্পর্কই নেই। প্রাচীনকালে অনৌরস সন্তানকে ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার দেওয়া হত। যদি অবিবাহিত মাতৃত্বের কারণে মেয়ে বা তার সন্তানকে আর্থিক দুরবস্থার দণ্ডই দেওয়া হল, তাহলে কঠোরতর আর কি-ই বা হতে পারে।"

আপ্পাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "বিনা বিবাহে সন্তান-উৎপাদনকারীর আর্থিক দণ্ড হত। তা সেটাই কি পর্যাপ্ত ছিল?"

"হ্যাঁ, আমি এটুকুই বলব যে আর্থিক কষ্টই বা কেন এরা বহন করবে? মেয়েদের বিনা-বিবাহে সন্তান-জন্মদান ব্যাপারটা মেনে নেওয়া

উচিত।”

“আপনি বলতে চান যে এধরনের বিচিত্র ধর্মশাস্ত্রেরও প্রয়োজন রয়েছে?”

“তুমি যা বুঝছ, তা মোটেই অসংগত নয়।”

“নয় কেন?”

“যখন ইচ্ছা আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করার স্বাধীনতা আমার ছিল। আমি সত্যি কথাই বলব যে কোনও কিছু করার পুরো স্বাধীনতা থাকলে, তার সুযোগ বা সুবিধা-গ্রহণের ইচ্ছাটা কমই হয়। এই নিয়ম শারদা-বাঈয়ের মতো বিদুষীদের জন্যই সত্যিকারের প্রযোজ্য। অন্যদের জন্য নয়।”

বৈজনাথ শাস্ত্রী নিজের স্ত্রী সম্পর্কে আরও কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তাঁর বলার উদ্দেশ্য হল তাঁর সব কথা বিবেচিত হবার পর হয়তো বা কথাগুলো যাচাই ও গৃহীত হবে সাধারণের কাছে।

ফেরার পথে বৈজনাথ শাস্ত্রী বললেন, তাঁর কথা তিনি আরও বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করবেন। বৈজনাথ শাস্ত্রী ও আপ্পা-সাহেবের যে কথাবার্তা হল, তা খুবই ফলপ্রসূ দেখা গেল। বৈজনাথ শাস্ত্রী স্বীয় আদর্শ নিয়ে বসে আছেন আর তাকে কিভাবে কার্যকর করা যায় তার উপায় চিন্তা ও রূপরেখা তৈরি করছেন। আপ্পাসাহেবের মনে হল এই দার্শনিকই তাঁকে সত্যিকারের পথটা দেখিয়ে দেবেন।

25

পুণা ফিরে এল কালিন্দী তার নিজের বিষয়ে ভাবতে শুরু করল। চিন্তা করতে করতে নিজেকে সে নিজেই যাচাই করতে লাগল। সমস্ত

চিন্তাই তার ছিল স্বীয় ভবিষ্যৎ আর রামরাওকে ঘিরে। নিজের জীবনটা রামরাও সমাজ-সেবাতেই উৎসর্গ করেছে আর স্বীয় হিত-অহিতের প্রতি সে উদাসীন। এর কাছে থাকার ইচ্ছাটা আমার মনে রয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা তীব্র সংকল্পও জাগছে যে আমি যেন তার জীবনটা নষ্ট না করে দিই। রামরাওয়ের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে কালিন্দী তার বাবার জীবনধারার সঙ্গে এর তুলনা করছিল। তার মনে হল রামরাওয়ের জীবনটা যেন আপ্পাসাহেবের মতো দুঃখের না হয়। তার মাকে বিয়ে করে বাবা যা-কিছু পেয়েছিল বা হারিয়েছিল, তার জন্য সব দোষে বাবাকেই দোষী করা হয়। সেই রকম কোনও দোষারোপ রামরাওয়ের সন্ততি যেন কখনও তাকে না করে। এ কথাটাই তার মনে উঁকি দিচ্ছিল।

কিন্তু আবার তার মনে চিন্তা জাগল যে মায়ের কুল-কথা বাচ্চা আজ না জানলেও কাল তো জানবেই। তবে ছেলে মায়ের বিষয়ে জেনে যাবে, এজন্য শঙ্কিত হবার তো কারণ নেই। রামরাওয়ের যদি জাতি নিয়ে কোনও চিন্তা না-ই থাকে, তাহলে আমার তরফে তাকে বিয়ে করার আপত্তি কেন হবে? আমার বাবা যে পরিণামটা সহ্য করে নিয়েছেন বা মানসিকভাবে তৈরী থেকেছেন, তাতে নিশ্চয়ই তাঁর দুঃখটা অনেক কম বোধ হয়েছে। রামরাওয়ের দুঃখটা কম হোক— এটাই যদি আমার মনের অভিলাষ হয়, তবে সম্ভাব্য সব পরিণতি আমার কল্পনা করে নেওয়া উচিত। সব পরিণাম মেনে নেবার জন্য যদি সে তৈরী থাকে, তাহলে তার গলায় মালা দিতে আমার কোনও আপত্তি হবে না। সে চোখ খোলা রেখে সব দেখে আর আগ বাড়িয়ে পা ফেলে, সেরকম পুরুষই আমার কাম্য। আমি যে-শ্রেণীভুক্ত আর আমার চিন্তামণির স্থান যেখানে, সেই শ্রেণীর নেতৃত্বের জন্য, জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ জাতি থেকে উদ্‌ভূত কেউ যদি এগিয়ে আসে তাতে লাভই হয়। বাবাও সমাজ-বিপ্লবের জন্য চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে

কিছু করেন নি। রামরাও সমাজ-বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত। আমায় বিয়ে করতে যদি রামরাও প্রস্তুত থাকে, তবে তার মঙ্গলের কথা — সত্য-মিথ্যা সব রকমে চিন্তা করে, আমারও তাকে বিয়ে না করার কোনই হেতু নেই। কালিন্দী এভাবে ব্যাপারটা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হল।

26

যে সব চিন্তা রামরাওয়ের মনে উদয় হল, সেগুলো সবই সে কালিন্দীর সামনে উপস্থাপিত করবে স্থির করল। সে সব বিষয়ে কালিন্দীরই বা কী বক্তব্য তাও সে জেনে নেবে ঠিক করল। পরে স্বীয় ভাবনা যখন সে পেশ করার চেষ্টা করল, তখন সে সমুদয় কথার যথার্থ বিচার-বিবেচনাটা ঠিক না হয়ে, স্বার্থত্যাগী লোকেরা কাদের বিয়ে করবে, সে প্রসঙ্গেই কথাবার্তাটা হল।

পরের বার যখন কালিন্দীর সঙ্গে তার দেখা হল, তখন প্রসঙ্গ-উত্থাপনে তৎপর হয়ে সে আপন বক্তব্য সামনে রেখে তৃতীয় একটা ভূমিকা ফেঁদে বসল। রামরাও যে-প্রকল্প প্রস্তুত করছিল সে-সম্পর্কে শ্রমিকবর্গের যারা লেখাপড়া-জানা তাদের মধ্যে কিছুটা আলোচনাও শুরু হয়েছিল। তাদের ভেতর কিয়দংশ প্রকল্পের রূপায়ন সম্ভব বলে ভাবত কিছু আবার ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই মনে করত। যারা বলছিল অসম্ভব, তাদের একবার কাজে লাগিয়ে দিয়ে বিষয়টার আলোচনা প্রয়োজন। তা-ই ছিল রামরাওয়ের মত। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে উল্লিখিত নেতৃবর্গের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে, তা থেকে উদ্‌ভূত সিদ্ধান্তগুলো আবার সবটা সে লিখে ফেলল। সেই পরিকল্পনার সংক্ষেপিত রূপটা ছিল এ রকম— রামরাও লক্ষ্য করেছিল যে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার

ইউনিট-মণ্ডলী একটা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং এ-ধরনের ইউনিয়নের নেতৃত্বে দেড় লাখ লোক ধর্মঘটে লিপ্ত হয়। এদের ধর্মঘট কোনও প্রকারে কয়েক মাস চলে। আদৌ কোনও কাজ না হলেও শ্রমিকদের নিজেদের ভরনপোষণ দুয়েক মাস চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। তা হলে জোর করতে পারলে আট বা পনেরো দিন পর্যন্ত কি এরা চালিয়ে নিতে পারে না? যদি এভাবে চলে তা হলে সেই টাকার পুঁজিতে সব শ্রমিকরা মিলে আপন হাতে মিল-ফ্যাক্টরির ভার নিতে চাইলে কি সেটা অনুচিত কর্ম হয়?

"যখন শ্রমিকেরা বেশ কয়েক মাস মিলের বাইরে কাটায়, তখনও এরা বেকার থাকে না। কিছু-না-কিছু কাজ করতে থাকে। যারা কাজ করে না, তারা স্বস্থান ছেড়ে কোঙ্কন যায়। পনেরো দিন-একমাস কোনও ভাবে ওদের ওখানে কাটে। বেকার যেমন ওখানেও কিছু দেখা যায়, তেমন তো কর্মরত অংশও দেখতে পাওয়া উচিত। এদের প্রত্যেকেরই মাল বহনের ক্ষমতা রয়েছে আর সেটাই তাদের মূলধন। শেঠের দল এটাই কাজে লাগায়। আমি যখন মুরার দীপচাঁদের ওখানে কেরানী ছিলাম, তখনই আমি বুঝেছিলাম শেঠের টাকা ছাড়া আর কী ছিল। ওখানে তুলো কিনত শেঠ আর কাপড় তৈরীর পর সেটা চট করে মহাজনের গুদামে গিয়ে পৌঁছত। আবার শেঠ নতুন করে তুলো কিনত। যখন তুলো নেওয়া হত না, তখন ফড়ে দালালের কাছ থেকে কথাবার্তানুযায়ী পনেরো দিন একমাসের টাকা আগাম নিয়ে নিত। যখন এত সব দেখলাম তখন থেকে মনে এই চিন্তাটা আসছে যে তুলোর জন্য যদি শেঠ ফড়ে-দালাল থেকে টাকা নিতে পারে, তাহলে কি শ্রমিক ইউনিয়নও সেরকম করতে পারে না? শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমেই তো মুরার দীপচাঁদ পয়সা কামায়। পরজীবী শেঠেরা যদি এভাবে পয়সা উপার্জন করতে পারে, তবে স্বাবলম্বী শ্রমিক সংঘ কেন

সেটা পারবে না ? পরিশ্রম-সহকারে কাজ করাটা যতটা শ্রমিকদের আয়ত্তের মধ্যে, ততটাই মুরার দীপচাঁদের করায়ত্তে। তাই শ্রমিক যদি ইউনিয়নের সুনাম রক্ষার্থে জোর দিয়ে পরিশ্রম করে আর নামের জন্য সেটা করে, তবে কত ভাল হয়।" রামরাও নিজের কামরায় বহু মিলের শ্রমিক আর সর্দারদের খবর দিয়ে তুলো সংগ্রহ থেকে কাপড় তৈরীর যাবতীয় প্রতিক্রিয়াগুলো আরও সত্বর কি ভাবে করা যায় সব ব্যাখ্যা করল। তবে কতদিনে একাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ? সব হিসাবাদি করে ওরা সাব্যস্ত করল যে তিনদিনে সমস্তটা করা সম্ভব। এসব হিসাব ওরা করল আর রামরাও নোট লিখে নিল, "তিনদিনের মধ্যে কাপড় তৈরী করে মিলের গেটে যদি বিক্রি করা যায়, তাহলে খরিদ্দার দৌড়ে সেখানে চলে আসবে। এভাবে খুব ভাল কাপড় তৈরী করে সারা ভারতবর্ষে ভালমতো বেচা চলে। কাপড় সস্তা হলে বিক্রি দ্বিগুণ হবে আর ভারতবর্ষে মিলগুলোর কাজও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কিন্তু শেঠের দল কাপড় আজ সস্তায় দিচ্ছে কোথায় ? সব মিলেই লাভ খাবার কত লোক রয়েছে ; নীচেকার লোকদের সামান্য কিছু পারি-শ্রমিক দিয়ে উপরতলার কর্মচারীদের প্রচুর মাইনে দেওয়া হচ্ছে। আর সারাদিন মরমর হয়ে কাজ করেও শ্রমিকদের এমন মজুরী মেলে যে তাতে তাদেরও কাজের পরাকাষ্ঠা দেখানোর কোনও চেষ্টাই থাকে না।"

সুতা আর কাপড় তৈরীর সব কল-কারখানা আজ না হোক কাল শ্রমিকদের দখলে আসা চাই। আর একাজের সব কিছু যখন শ্রমিকেরা বুঝে নেবে, তখন শিল্প-কারখানা শ্রমিক-করায়ত্ত না হয়ে পারবে না।

রামরাওয়ের পরিকল্পনায় সামাজিক বিষয়ও কিছু ছিল। শ্রমিক সংগঠনান্তে তাদের মিল পরিচালনা কার্যের পরও আরও কিছু বিষয়ে তার বলার কথা ছিল, পাঠান কাবুলীওয়ালা বা মারোয়াড়ীর কাছে টাকা

ধার নিয়ে হিসাবের বেলায় ওদের দশটাকার বদলে বিশ অথবা পঞ্চাশ টাকার তমস্সুক লিখে দিতে হয়। তার উপর টাকায় দু-আনা সুদ দেবার যে-রীতি, সেটা পুরোপুরি বন্ধ করার কথাটা, কাবুলীওয়ালা বা মারোয়াড়ীর বিশ্বাস নিয়ে টাকা লগ্নী করা বা অবস্থানুযায়ী শ্রমিক বস্তীতে তাদের আসতে না দেওয়া— এসব সমস্যা দূরীকরণ— তার প্রস্তাবিত আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। শ্রমিক ইউনিয়নের নিজস্ব কোনও স্থানের ব্যবস্থা, বাইরে দূরে কোন জায়গায় শাক সব্জী ফলানো শ্রমিকের বাড়ী বাড়ী তা পৌঁছে দেওয়া, দলে দলে শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে খোলা হাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা ইত্যাদিও তার পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল।

রামরাও ফোর্ডের লেখা একটি বই পড়েছিল। বলা হত যে ফোর্ডের আদর্শ অনুযায়ী সব শিল্প-উদ্যোগের সংস্কার সাধিত হওয়া আর শ্রমিককে বড়লোক বানানোর প্রয়োজন রয়েছে।

রামরাও এই যে নিবন্ধটি লিখল, তার ক্লার্ক এর দশটি কপি বানিয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নের কাছে পাঠিয়ে দিল। রামরাওয়ের যেসব সহযোগীরা মীরাটে ইংরেজ সরকারের আতিথ্যে ছিল তাদেরও কপি পাঠাল। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধরনের মতামত জানাল। কিছু লোকের কাছে এটা অলীক আকাশকুসুম মনে হল। কিন্তু এ-পরিকল্পনার পেছনে যে নিশ্চিতরূপেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে, সেটা অনেকেই মানতে বাধ্য হল। মীরাটের সরকারপক্ষীয়দের কাছ থেকে পরামর্শ এল যে পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য চেষ্টা করা হোক, তাহলে বোঝা যাবে এটা ঠিক আছে কি-না। আর যদি এটা ঠিক না থাকে, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এর সংশোধন করা যাবে।

পরিকল্পনাটা মীরাটে পাঠানোর আগে, এমনকি প্রতিলিপি নেওয়ার আগে সে কালিন্দীকে সব পড়ে শুনিয়েছিল। কালিন্দী পরিকল্পনাটা

মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করল আর বলল, "আমার ধারণা বাড়ীতে খরচ আরও বেশী হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হলে, এ-হিসাবটা কার্যকর হচ্ছে না। কারণ, পয়সা তারা খুব তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলে। ভাড়া প্রতি মাসে দিতে হচ্ছে, তার অর্দেক বেতন হিসাব করে সপ্তাহে দেওয়া যায় আর বাকীটা মাসের শেষে। এতে শ্রমিকরা ঋণ-গ্রস্ত হবে না আর ভাড়াও ঠিকমতো দিয়ে দিতে পারবে।"

"এই প্রস্তাবটা খুবই ভাল। আমার পরিকল্পনায় আমি এটি জুড়ে দিচ্ছি", রামরাও বলল।

কালিন্দী বলল, "নিজেদের দেশে কাপড় খুব সস্তা হওয়া উচিত। কম দামে যদি সমস্ত মাল বেচা যায় তবে টাকাটা এসে যাবে আর গরীবদের খুব লাভ হবে। সঙ্গে সঙ্গে মিলের কাজের জন্য যত উৎপাদন বাড়ানো যাবে ততই ভাল হবে। প্রতি মিল-শ্রমিকই তখন আরও বেশী কাপড় তৈরী করবে। আমাদের দেশে লোকেরা কাপড় খুব কম ব্যবহার করে তার কারণ বেশী কাপড় কেনার ক্ষমতা তাদের নেই। শ্রমিকদের কাপড় ধার দেবার পরিকল্পনাও করা প্রয়োজন।" এ-প্রস্তাবও রামরাও মেনে নিল।

কালিন্দী রামরাওকে বলল, "তোমার পরিকল্পনা জেনে আমার আশ্চর্য লাগছে যে তুমি নিজে শ্রমিক না হয়েও ওদের প্রতি কতটা সহানুভূতিসম্পন্ন। আমি আরও আশ্চর্য বোধ করছি শ্রমিকরা এ-সব ব্যাপারে এখনও কেন কোনও চিন্তা করছে না?"

"আমিও শ্রমিকদের দলেই ছিলাম এ কথা বলায় বোধ হয় আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু চাকুরী যখন করতাম তখন মালিকের হিতই দেখতাম। তবে চট করেই সেটা উঠে গেল। আমাদের মিল মালিকেরা শ্রমিক-কল্যাণের প্রতি খেয়ালই করে না।"

"কোন খেয়ালই করে না?"

"আমাদের সব সময় চিন্তা থাকে শ্রমিককে কম বেতন দিয়ে বাড়তি সবটুকু যেন নিজের কোলে টানা যায়। মনে যতক্ষণ এই মুনাফার চিন্তাটা ঘুরছে, ততক্ষণ আমরা ভালভাবে উৎপাদনে সমর্থ হব না আর মালিকেরও মঙ্গল হবে না। আমেরিকায়ও বারে বারেই দেখা গেছে যে কারখানা-মালিকও নিজেকে শ্রমিকই মনে করে। আর সবারই অধিক স্বার্থসিদ্ধি হোক এবং প্রাপ্য বেতনও ভাল পাক সবাই— এই ধারণা নিয়েই ওরা কারখানা চালায়। এভাবে চললেই মালিক ও চাকুরীরত কর্মচারী উভয়েরই হিত হয়। আমাদের কারখানাওয়ালারা মনে করে লাভ যতটুকু যা করার তা শ্রমিক-মজুরী ফাঁকি দিয়েই করবে। কিন্তু আমাদের কারখানা-মালিক পয়সাই বা পাবে কোথায়? একেই তো খরিদ্দারের কাছ থেকে বেশী পয়সা নেওয়া আর শ্রমিককে কম দেবার ধান্দা। এই একটা পথেই ওরা পয়সা কামাতে জানে। তৈরী মাল প্রস্তুত করে তা চটপট বিক্রি করা, সব যন্ত্রপাতি সদাসর্বদা কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা, কিংবা সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের কারখানাওয়ালাদের কোনই খেয়াল নেই। বিদেশে অনেক শুল্ক দিয়ে সস্তা কাপড় তৈরী যতক্ষণ সম্ভব হবে, ততক্ষণ আমাদের এখানে সংস্কার-সংশোধনের সম্ভাবনা বর্তমান। আজকাল মিল এজেন্টের সংস্কার-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। এ-ধরনের লোককে কাজে রাখা উচিত নয়। উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের হাতে কারখানা নিয়ে, যাতে বেশী লোক কারখানা থেকে পয়সা বেশী রোজগার করতে পারে, সেই ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা উচিত। কিংবা, শ্রমিকেরা আমার চিন্তাটা প্রচার করে সত্যিকারের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হোক।"

"তাহলে তোমার চিন্তাটা যাতে ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য কী করতে চাও?"

"আমি 'প্রকৃত বিপ্লব' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করব।"

পরিহাসের সুরে কালিন্দী বলল, "তুমি ভিজিটিং কার্ড বানালে আলাদা আলাদাভাবে তা ছাপাতে হবে। তাতে নিজের সম্পর্কে উকিল, সম্পাদক আর শ্রমিক নেতা' বলে উল্লেখ করতে হবে।"

27

ফেডারেশনের লোকেরা রামরাওয়ের সব খবরই রাখত। তবে তাকে নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধ ছিল। দ্বিতীয় যে কারণে রামরাওকে মালিকপক্ষ চিনত তা হল শেঠের বাড়ীতে সে গৃহ-শিক্ষকতা করত। শ্রমিক নেতৃবর্গের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল তাতে মিল-ওনার্স-সদস্যদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছিল। রামরাওয়ের বক্তব্য ছিল যে সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদ পৃথক ব্যাপার। বিষয়টা ফেডারেশন পর্যন্ত গড়িয়েছিল আর তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এই ব্যাপারে রামরাও কতদূর পর্যন্ত নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে পেরেছে তাই নিয়ে ফেডারেশনের লোকদের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল।

যদি ক্লাউড মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট স্যার সোরাবজী চৌথিয়া রামরাওকে অভিহিত করতেন সেনসিব্‌ল্ এ্যাটিটুড অর্থাৎ ভালবুদ্ধিযুক্ত লোক বলে তবে ফিলাংথ্রোপী মিলের সেক্রেটারি স্যামুয়েল সলোমন বলতেন, "রামরাও ভয়ংকর লোক আর এ-ই আমাদের সত্যিকারের শত্রু। এর থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন।"

সোরাবজী নিজের বক্তব্যের সমর্থন করতে শুরু করলেন, "পুঁজি-বাদীর দল আর সাম্রাজ্যবাদীবর্গ পরস্পর মিত্র নয়, এ কথা যদি

প্রচারিত হয় তবে সাধারণের সহানুভূতিটা আমাদের প্রতিই থাকবে এবং তাতে আমাদের লাভই হবে।"

স্যামুয়েল সলোমন বললেন, "সরকার আর পুঁজিবাদী এক নয়। এ কথাটা স্পষ্ট হলে বড় ক্ষতি হবে। কারণ বহু ব্যবসায়ী আমাদের সরকারী অধিকর্তার মতোই মান্য করে আর তার ফলে শ্রমিক পরিচালন ব্যাপারটার অনেক সুবিধা হয়। প্রশাসনের দিক থেকে আমাদের সম্পর্কে শ্রমিকদের কিছুটা ভীতি থাকা উচিত। আর সেই ভীতি বজায় রাখার জন্য সরকার যে আমাদের পক্ষে, এই চিন্তাটুকু থাকা দরকার। আমি বলব এই চিন্তাটা আরও বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। এদের বোধ হওয়া দরকার যে যদি আমরা হান্টার মেরে ওদের গায়ের চামড়া তুলেও নি তাহলেও সরকারের কাছে দরবার করে কোনও লাভ হবে না। সরকারী সব অধিকর্তা কার্যত আমাদের হাতের মুঠোয়, লোকেদের এরকম দেখানোটাই অধিক ফলদায়ী হবে। দেশী কল-কারখানা সম্পর্কিত নানা ঝামেলা-বিবাদের পেছনে সরকার আছে, এখন বদনাম যদি চালু করতে হয়, তবে ইংরেজী খবরের কাগজের কাজে যেতে হবে আর সে-সম্পর্কিত আলোচনাও শুরু করতে হবে। এইভাবেই জনসাধারণের সহানুভূতি পাওয়া যাবে। কিন্তু অশিক্ষিত শ্রমিকদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি না হওয়াই বাঞ্ছনীয় যে আমাদের কোনও মূল্যই নেই। শ্রমিকেরা যদি বুঝতে পারে যে পুঁজিবাদি ও শ্রমিক বিরোধে দুপক্ষেরই হিতার্থে সরকার নিরপেক্ষ-ভাবে সব বিচার করবে, তা হলে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদকে পরস্পরের মিত্র বলে অভিহিত করে দুপক্ষেই গালিগালাজ করে সাম্রাজ্যবাদীর লাঠিখাওয়ার মতো গর্দভ যত বেশী মিলবে, ততই আমাদের লাভ। কিন্তু রামরাও করবেটা কি? এটা সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদের মৈত্রী নয় এ কথা

বলে বেড়িয়ে সে আমাদের দুর্বলতার কথাটাই প্রচার করবে। আমাদের শত্রুর দলবৃদ্ধি পায় এমন কথা উপর উপর বলে কেবল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়বার সব শক্তি একত্রিত করবে। এইজন্যই এ-ধরনের লোক সম্পর্কে আমাদের সাবধান থাকা খুবই প্রয়োজন।"

সে সময় কংগ্রেস পক্ষের লোকেরা বলত, 'যে-কোন প্রকারেই হোক রামরাওকে আমাদের মিত্র বানাতে হবে। যখনই আমরা শ্রমিক-দের কংগ্রেসের পক্ষে আনার চেষ্টা করেছি, তখন সব সময়ই রামরাও আমাদের বিরোধিতা করেছে। সে কেবল বলে, শ্রমিক-কল্যাণ একটা ভিন্ন ব্যাপার।"

"তা, রামরাওকে নিয়ে আমরা কি করব?"

সোরাবজী বললেন, "এখনই কিছু করছি না।"

অন্য সভ্যদের কাছেও এই মত গ্রহণীয় মনে হল। এর পর রামরাওয়ের পরিকল্পনাটা নিয়ে আলোচনা হল, কিন্তু মতবিরোধ-টা বৃদ্ধি পেল। স্যামুয়েল সলোমন বললেন, "রামরাও আন্দোলনকারী। কোনওভাবে তাকে জেলে পাঠাতে পারলে তার পরিকল্পনা-দলিলও রুখে যাবে।"

সোরাবজী বললেন, "যে রকম বুদ্ধিমান লোক রামরাও তার জন্য উপযুক্ত কিছু করা উচিত।"

"শ্রমিকদের হিতের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে যদি সে স্বীয় হিতের প্রতি নজর দেয়, তবে সেটা আপনাদের কাছে ভাল লাগবে। তাই না?"

"হ্যাঁ, লাগবে," একজন উত্তর দিলেন।

"তা হলে আমি বলি যে আমরা রামরাওকে মিল-ওনার্স ফেডা-রেশনের একজন সহকারী কর্মসচিব রূপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাব।"

"বাঃ, বেশ কথা এটা। তা হলে সে নিজের বুদ্ধিটা মালিকের

হিতার্থে কাজে লাগাবে,” জনৈক ভাটিয়া সদস্য বললেন।

“তার বহুবিধ চিন্তার মধ্যে বেশ কটিরই রূপায়নে রামরাও সক্ষম। শ্রমিক-বেতনের অংশবিশেষ কাপড়বাবদে নেবার কথাটায় সমর্থন জানানো যেতে পারে আর সেজন্য ঋণও দেওয়া যেতে পারে। সে সঙ্গে মারোয়াড়ী ও কাবুলীওয়ালা, পাঠানের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য ইউনিয়নের সাহায্যে লোকদের উৎসাহদান করতে পারে। আমরাও এ কাজে কিছু সহায়তা করব। ইউনিয়নকে কিছু টাকা-পয়সা দিলে ইউনিয়নও হাতের মুঠোর মধ্যে থাকবে,” স্যার সোরাবজী বললেন।

স্যার সোরাবের এই প্রস্তাবকে সবাই স্বাগত জানাল। আর পরের দিন 500 পাঁচশত টাকা বেতনে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির নিয়োগ-পত্র রামরাওয়ের কাছে প্রেরিত হল।

28

এস্থারের বাড়ীতে কালিন্দীর একটা জায়গা হওয়াতে ডগ্‌গে পরিবারের দৃষ্টিতে সে স্থানের গুরুত্বটা বেড়ে গেল। কিন্তু কালিন্দীর সঙ্গে দেখা করার সাহস তখনও কারুর হয় নি। আপ্পাসাহেব অবশ্য ঊষাকে সত্যব্রতর চিঠিটা কালিন্দীর কাছে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। তবুও কালিন্দী তখনও চিঠি লেখালেখি শুরু করে নি। ঊষা এস্থারকে চিঠিখানা দিল আর তারা সত্যব্রতকে এখানে আসতে লিখেছেন তাও খবর হিসাবে জানাল। কালিন্দী সেই সপ্তাহেই যখন পুণা এল, তখন সত্যব্রতরও আসার সম্ভাবনা জেনে তার খুব আনন্দ হল। তার এই আনন্দটা সে এস্থারের কাছে ব্যক্ত করল। কালিন্দী সাগ্রহে এস্থারকে জানাল যে যদি সত্যব্রত পুণা আসে, তবে কোনওপ্রকারে তাকে

বোম্বাই পাঠিয়ে দিতে হবে। তারই মধ্যস্থতায় ভাইবোনের দেখা হচ্ছে, এ কথায় এস্থার স্বতঃই নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে খানিকটা অবহিত হল। আর তার মনে এ-চিন্তাটাও উঁকি দিল সত্যব্রতই তার দেখা সে লোক কি-না, তা-ও এখন জানা যাবে। সে-আবাই বা এতদিন পর কেমন দেখতে হবে, তারও একটা কাল্পনিক চেহারা তার মনের আয়নায় প্রতিফলিত হল।

রামরাও আর কালিন্দীর কথাবার্তার পর কোন এক কর্মোপলক্ষ্যে এস্থার 'রাস্তারপেঠের' নিজের ঘরটায় বসে ছিল। সে সময় তার মা 'তোর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে' বলে হলঘরে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে একটি যুবককে দেখা গেল। যুবকটিকে তার চেনা মনে হল। ক্ষণেকের জন্য তার মনে হল যে এ তো সেই পূর্বেকার দেখা আবা। সে যুবকটিকে চিনতে পারল। এ-ই আবা। গোড়ায় একবার তাকে সে দেখেছিল। দেখতে এখন একটু অন্যরকম হলেও, এবারেও তাকে সে চিনল। 'আবা'র মনে হল এ-মেয়েকে আগে কখনও দেখেছি। আর সেটা হল যখন সে সেই রুমালটা উঠিয়ে দিয়েছিল এবং হেসে সে-মেয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। এবারও যেমন স্মিতহাস্যে এস্থার তাকে স্বাগত জানাল সেটা তার খুবই পরিচিত মনে হল। বহুপূর্বে দুজনের মধ্যে যে সহজ স্মিতহাস্য-বিনিময় হয়েছিল সেটা কিছুলোকের নজরে পড়েছিল আর এই সাধারণ বিষয়টা নিয়ে অন্য ছাত্ররা তার সঙ্গে মজা করেছিল। তার একথাও মনে পড়ল যে সে সময় কোনও কোনও বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল যে পরিচয়টা সে আর বাড়িয়েছে কি-না। যদিও একে অন্যকে এরা চিনতে পেরেছিল তবুও ফর্মালি বা আনুষ্ঠানিকভাবে এদের পরস্পরের পরিচয় হয় নি। আবার মনে হল সে তো এস্থারকে চিনেছে, কিন্তু সে তাকে চিনল কি-না কে জানে। দুজনেই একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হতচকিত এবং ক্ষণেকের জন্য

চুপ করে রইল। আবা-ই নীরবতা ভঙ্গ করল— "আমিই কালিন্দীর ভাই সত্যব্রত।"

"তুমিই আবা?" হেসে এস্থার প্রশ্ন করল আর তার স্বরে ধ্বনিত হল যেন, বোঝ আমি কত বেশী জানি। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় 'আমি একটু আসছি' বলে সে ভেতরে গেল আর কালিন্দীর পত্রখানা তুলে নিল। ঘুরে আসার সময় আয়নায় নিজের চেহারাটা আর পোষাকের দিকে তাকাল। কিছুই গোলমাল মনে হল না, সব ঠিক আছে। তবুও সব ঠিকঠাক করার মতো করে চুলে খানিকটা ব্রাশ চালিয়ে নিয়ে সে ফিরে এল, বাইরে যাবার কাপড়টা সে বদলে নিয়েছিল, তাই ভাবল এ সময়টায় আবা আসায় ভালই হল। চেহারাটাও যেন খুলেছে। কেউ এলে হাসিমুখে কথা বলা তার নিত্যকারের অভ্যাস। আনন্দে তার আকর্ষণীয় ভঙ্গিমাগুলো যেন আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল।

"আমি আপনার কাছে দুটো ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। একে তো কালিন্দীর দুঃখের দিনে যে সাহায্য আপনি তাকে করেছেন···।"

"কী আবার সাহায্য -- তার জন্য ধন্যবাদ দেবারই বা কি আছে?"

"হাঁ, আমাদের বাড়ীর লোকেরা তো ধন্যবাদটুকুও জানায় নি।"

"যদি কালিন্দী তাদের ভালবাসারই পাত্রী হত তবে নিশ্চয়ই এরা ধন্যবাদ জানাত, কিন্তু যখন কালিন্দীর কোনও কিছুই তাদের ভাল লাগে নি তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাদের কাছে আমার এ-কাজটা খারাপই বলতে হবে।"

"এই দেখুন, বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি। উনি অবশ্যই ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপনাকে, আমি বেশ বুঝতে পারছি। আর এ-ও সত্যি যে ধন্যবাদের আলাদা প্রয়োজন আছে বলে মা হয়তো মনে করে নি। কিন্তু আপনার এই উপকারের কথা আমার সামনেই তিনি বহুবার উল্লেখ করেছেন। বাবা মা কেউই কালিন্দীর আচরণটা মেনে

নিতে পারেন নি। সেটা কিভাবেই বা আপনার মনঃপূত হবে? তবে কালিন্দীর আপৎকালে আপনি যে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সে কথার গুরুত্ব কি কখনও কম করে ভাবা সম্ভব?"

"ধন্যবাদ নিষ্প্রয়োজন, তবে তোমার কথাগুলো শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

"আচ্ছা, কালিন্দীর খবর কী আজকাল?"

"না, তেমন কিছু নয়। এই তার চিঠি, আজকের ডাকে এসেছে। সে লিখেছে যে স্বদেশী আন্দোলনের এত বড় একটা সমর্থন সত্ত্বেও এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে বস্ত্রের মিলগুলোর কোনও লাভ হচ্ছে না। তার নিজের খবর হল সে নিজের কাজ করে যাচ্ছে আর সেটা তার ভাল লাগছে। সে এখন একটা পথ পেয়ে গেছে।"

"এটাই ঠিক। একটা কাজ নিয়ে লেগে থাকাটাই ভাল।"

"হ্যাঁ, মানুষ যদি কাজ নিয়ে থাকতে পারে, তবেই সে বাজে কথার হাত থেকে রেহাই পাবে।"

এই সময় এস্থারের মা চিন্তামণিকে ঘরে নিয়ে এলেন। তার চেহারাটা কালিন্দীর মতোই, "আরে, দুষ্টুটা যে হাসছে" বলে তাকে ডাকল সত্যব্রত। এগিয়ে আসার জন্য চিন্তামণি হাত বাড়িয়ে দিতেই সত্যব্রত তাকে ধরে ফেলল আর কিছুক্ষণ ওকে নিয়ে খেলা করল।

এস্থার তাকে বলল, "বাবা হিসাবে তুমি ভালই হবে। আজকাল-কার যুবকেরা বাচ্চা কোলে নিতে লজ্জা পায়। তারা মনে করে সে কাজ মেয়ে বা আয়াদেরই।"

"ছোট বাচ্চা আমার খুব ভাল লাগে। গোলাপের কুঁড়ি কি ভাবে ক্রমে বড় হতে হতে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হয় সেটা অনেকেই খুব ঔৎসুক্য নিয়ে দেখে। তেমনি ছোট বাচ্চা দিনে দিনে এক-একটা শব্দ আর বুলি শেখে, তাতে আমিও খুব আনন্দ পাই।"

"এ দেখে যদি পুরুষের নিজ সন্তানকে ঠিকমতো লালন-পালনে ইচ্ছা জাগে তবে তারাও ভাল পিতা হতে পারবে। আমার তো অন্ততঃ সে রকমই মনে হয়," এস্থার বলল।

এস্থারের কথা শুনে সত্যব্রত একটু আড়ষ্ট-বোধ করল। মুখটা লাল হয়ে উঠল. একটা চাপা সলজ্জভাব দেখা গেল মুখে। এই ভাবটা কাটানোর জন্য সে কথা হাৎড়ে বেড়াচ্ছিল। তাই বোধ হয় তার সহাস্য বদনে আবার সেই পরিচিত গালের টোলটা নজরে এল। পূর্বেকার সেই ঘটনা মনে পড়ল আর হাসি পেল ওদের।

কিছুক্ষণ বাদে সত্যব্রত চিন্তামণিকে তার পাতানো দিদিমার কাছে দিল। এস্থার সত্যব্রতকে বলল, "তোমায় দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।"

"কেন?"

"অল্প বয়সেই কতরকম অভিজ্ঞতা তোমার হল। অনেক ঘুরেছ আর কত সাহসও বেড়েছে।"

"আমার ভাবনা আর সাহসিকতা?"

"কালিন্দীকে লেখা তোমার সব চিঠিই আমি দেখেছি। সমগ্র উত্তর ভারত তুমি ঘুরেছ। কাজের ব্যাপারে কত লোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে।"

"হ্যাঁ, বহুজনের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে।"

"প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে বইয়ের জন্যে বলে তাদের মনে অনুকূল ধারণা সৃষ্টির কাজটা নিশ্চিতরূপেই কঠিন।"

"তা কঠিন বটে, তবে কথাটা তুমি কী বলতে চাইছ?"

"বম্বেতে আমার স্বজাতিবর্গ একটা ধর্মীয় নাটক করল ও ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলল। টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে আমি বুঝেছিলাম যে শুধু টিকিট নয়, কারুর কাছে কিছু বিক্রি বা পয়সা সংগ্রহ কত কঠিন কাজ। আর সেরকম কাজে তুমি দু'হাজার টাকা

তুলেছ, এ তোমার খুবই বাহাদুরী।"

সত্যব্রতর মনে হল সংগ্রহ-কুশলতার যে উচ্চ প্রশংসা এস্থার করল, তার বাড়ীর লোক বা অন্য কারুরই সে-ব্যাপারে সঠিক ধারণা নেই। তাই এস্থার তার পরিশ্রমের ঠিক যাচাই-ই করেছে। তার কুশলতা ও পরিশ্রম এস্থার ঠিকমতোই অনুধাবন করেছে। সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করল, "কালিন্দী কবে আসছে?"

"এ হপ্তায় হয়ত আসছে না। তুমি এখানে এসে গেছ জানলে যত শীগ্‌গির সম্ভব এসে ওর তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা।"

"তা হলে কি আমিই সেখানে চলে যাব?"

"আমার ফুরসৎ হলে আমিও যাব। ভাই-বোনের মধ্যে যে বাদ-বিতণ্ডা হবে সেটা শুনতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে। তোমার মতামতের অনেক কিছুই আমার জানা।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, আমাদের দুজনের যাওয়ার চেয়ে সে এখানে এলেই ভাল, তাই না?"

"কালিন্দীর যেমন অভিপ্রায় সে-রকমই আমি করব।"

"আচ্ছা তুমি যখন যাবে দেখা করতে, তখন তোমাদের দুজনের আপত্তি না হলে, আমিও যাব, এ কথাটা কালিন্দীকে জানিয়ে দেবে," বলেই এস্থার আবার বলল, "না, না, কালিন্দীর এখানে আসা দরকার। আমি ওকে আসতে লিখছি।"

কিছুক্ষণ বাদে এস্থারের মা চা এবং পুণার সুস্বাদু বিস্কুট নিয়ে এলেন। সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করল, "তুমি তো আমায় স্বদেশী বিস্কুট খাওয়াচ্ছ।" এস্থার জবাব দিল, "আমরা কেবলমাত্র স্বদেশী বিস্কুটই পছন্দ করি।" এস্থার সম্পর্কে সত্যব্রতর মনে একটা উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হল।

29

কালিন্দী যখন রামরাওয়ের কাছে বসেছিল সেসময়ই মিল-ওনার্স ফেডারেশনের পিওন নিয়োগ-পত্রখানা নিয়ে এল। লোকটিকে দেখে কালিন্দীর মনে হল হয়ত বা রামরাওয়ের পরিকল্পনাটা মিল-ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পছন্দ হয় নি তাই কোনও একটা প্রতিকার বা ধমকানির নোটিশ এসেছে।

চিঠিখানা খুলে পড়তে পড়তে রামরাওয়ের হাস্যমুখ দেখে কালিন্দী আশ্বস্ত হল যে এতে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু সে-হাসিতে যেন উচিত বক্তব্যের একটা ঝলক ছিল। তাতে আবার সে চিন্তান্বিত বোধ করল। পিওনটি জিজ্ঞাসা করল, ''জবাব কি আপনি দিচ্ছেন?" রামরাও বলল, "পরে ডাকে পাঠিয়ে দেব।" সেলাম জানিয়ে পিওনটি চলে গেল। চিঠিখানা রামরাও কালিন্দীর হাতে দিল।

কালিন্দী চিঠিটা পড়ে আনন্দিত হল। সে রামরাওকে অভিনন্দন জানাল আর বলল, "পিওনের হাতেই জবাবটা দিয়ে দিলে না কেন?"

'এ-চাকুরী নেব কি-না এখনও আমি স্থির করি নি। আমার আদর্শ অনুযায়ী আমার এ-চাকুরী গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তবে এটা অপ্রত্যাশিত বলেই গ্রহণের একটা মোহ আমার জাগছে, সেটাও অবশ্য আমার স্বীকার করা উচিত।"

"কেন গ্রহণ করবে না এই নিয়োগ? বরং এই চাকুরী নিলে শ্রমিক-কল্যাণের আরও বেশী সুযোগ আসবে।"

"এই চাকুরী নিলে শ্রমিক-কল্যাণ আরও বেশী করতে পারব, সে-বিশ্বাস আমি করি না। বরং আমার মনে হচ্ছে স্বীয় আদর্শ থেকে তখন আমি আরও দূরে সরে যাব।"

"সেটা কেমন করে হবে? বরং এই চাকুরীর জন্য কর্তব্য-পরিসর তোমার বৃদ্ধি পাবে।"

"কি করে বাড়বে? সে-কাজে লেগে গেলে আমার সংকল্পানুযায়ী কাজ হয়ত কিছু করতে পারব। তা তুমি এসম্পর্কে কি মনে কর?"

"আমি দেখছি যে-সব মিলে কার্যপদ্ধতি উন্নত ধরনের, সমগ্র ব্যাপারটাই সেক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর হয়। তাই উন্নত পদ্ধতি-জনিত লাভ যদি ফেডারেশনের কাম্য হয়, আর সে-সম্পর্কে মিল-মালিকবর্গকে জানিয়ে দেয় তা হলে তদনুসারে মালিক শ্রমিক দুপক্ষেরই মঙ্গল হবে! উন্নত কর্ম-পদ্ধতির যদি প্রসার ঘটে, তা হলে মন্দ জিনিসটা অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি ফেডারেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হলে এসব ব্যাপারের সুরাহা সহজেই হবে।"

"হয়ত বা হবে।"

"তাহলে শ্রমিক-কল্যাণের এই যে একটা সুযোগ মিলছে, সেটা তুমি গ্রহণ করছ না কেন?"

"আমার ভেতরকার আদর্শ আমায় বলছে যে এ-চাকুরী তুমি নিয়ো না। আবার এটা গ্রহণ করার একটা মোহও জাগছে মনে।"

এমন সময় বাইরে থেকে কিছু লোক উৎসাহ-ভরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। ওরা বলল, "পারেলে শ্রমিকদের লাল ঝাণ্ডার পরাজয় হয়েছে। সেখানে কিছু বাড়ীর মাথায় কংগ্রেসের ঝাণ্ডা উড়ছে। আমাদের এলাকায়ও কংগ্রেসের ঝাণ্ডা নিয়ে লোকজন এসেছিল, কিন্তু আমরা তা ওড়াতে দিই নি। এ-ব্যাপারে ওদের-আমাদের মধ্যে খানিকটা গরম-গরম কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে।"

"কী বলছে ওরা?"

"ওরা বলছে তোমরা তোমাদের লাল ঝাণ্ডা রাখো তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু সঙ্গে আমাদের এই ঝাণ্ডাও থাকতে দাও।"

"তা, কি বললে তোমরা ?"

"আমাদের ঝাণ্ডা তোমরা কংগ্রেস কার্যালয়ে লাগাও, তাহলে আমরা তোমাদের ঝাণ্ডাটা আমাদেরটার সঙ্গে রাখব।"

"ঠিক কথা বলেছ। লাল ঝাণ্ডা সম্পর্কে শ্রমিকেরা যত সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করবে ততই ভাল। লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের সঙ্গে আমরা মিলে যাই নি, সেটা শুধু আদর্শগত কারণে। তবে শ্রমিক-কল্যাণ ভিন্ন ব্যাপার। তাতে আমরা সহযোগিতা করব এ কথা উষা কাকীমাকে বলে দিয়ো। সহায়তা চাইলে কংগ্রেসওয়ালারা পাবে সেটা আমাদের কাছে, তবে আমরা তাদের পুরোপুরি অধীন হব না। কংগ্রেসে শ্রমিক-প্রাধান্য না হয়ে শেঠীদেরই হয়েছে। কংগ্রেস শ্রমিকবর্গের নয়, শেঠীদের।"

"কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে আমাদের ভলান্টিয়ারদের মারা-মারি প্রায় হতে যাচ্ছিল।"

এসব কথাবার্তা চলার সময় কালিন্দী কান খাড়া করে সব শুনছিল আর 'প্রকৃত বিপ্লব' পত্রিকার একটি সংখ্যায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল।

কালিন্দী যখন পত্রিকাটির একটি সংখ্যা নীচে নামিয়ে রাখল, তখনও শ্রমিকদের সঙ্গে রামরাওয়ের কথাবার্তা চলছিল। অতঃপর সম্পাদককে লেখা চার-পাঁচটি পত্র রামরাও কালিন্দীকে পড়তে দিল।

শ্রমিকেরা চলে যাওয়ার পর কালিন্দী আবার তাকে জিজ্ঞাসা করল যে সেই চাকুরীটা সে করবে কি-না। রামরাও জবাব দিল, "না, আমি করব না।"

"কেন নয়? শ্রমিককুল আর কাপড়ের হিত চিন্তা করে এই চাকুরীটা গ্রহণ করলে তুমি বেশী ভাল করতে। উৎপাদন-ব্যবস্থার সংস্কারান্তে মার্কিন মুল্লুকে শ্রমিকদের যে মাইনে দিয়ে লোকেরা ব্যবসায়ে যেরকম সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে, সেরকম সংস্কারসা-ধনান্তে

ভারতবর্ষে তোমাদের পক্ষেও সেই প্রকারের সাফল্য আনয়ন সম্ভব।"

"আমার আপত্তি করার কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, আমার মনে হয় না তাদের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হয়ে পরিবর্তন সাধন কিছু করতে পারব। দ্বিতীয় কথা এই যে, চাকুরী করাটাই আমা রআদর্শ-বিরোধী। শ্রমিকবর্গকে পুরো রকমের শক্তিশালী করে গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য। মিলওয়ালাদের বেশী লাভ করানোটা আমার আদর্শ নয়।"

"উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে তো শ্রমিকদেরই কল্যাণ হবে।"

"না, একে তো যতটুকু যা পরিবর্তন-সাধন আমার পক্ষে সম্ভব, তাতে কেবল শ্রমিকদের কথাটা চিন্তা করেই সেটা কর্মে রূপায়িত করতে হবে। আমি উৎপাদন-ব্যাপারে বিশেযজ্ঞ নই। আমি শ্রমিক-পক্ষের হয়ে সংগ্রামে নেতৃত্ব করি। আর এই নেতৃত্ব ত্যাগ করে উৎ-পাদন-ব্যবস্থার সংস্কারসূচক কোনও কাজ আমি করতেও পারব না। মনে কর এই নিয়োগ আমি গ্রহণ করলাম আর কয়েকটি সংস্কার-প্রস্তাব তারপর পেশ করলাম। কিন্তু সেসবের কোনটাই ওরা মানবে না। যদি ধরেও নিই যে মালিকপক্ষের এতে লাভ বেশী থাকবে, তবুও এরা এ সবের বিরোধিতা করবে। আমার তো মনে হয় পুঁজিবাদী শ্রেণী যতক্ষণ না সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, ততক্ষণ শ্রমিকদের সমস্যা কিছুই তারা হৃদয়ঙ্গম করবে না এবং পরিবর্তন-ব্যাপারেও তৎপর হবে না। সুতরাং যদি তাদের নিজেদের ব্যবসায়-পরিচালন-প্রশ্ন নিয়ে কোনও বাধা সৃষ্টি করা যায় তা হলেই সব শেঠ সংস্কার-সাধনে অগ্রণী হবে। তবে সে সঙ্গে আমার মতো সংস্কারপন্থী এবং উৎপাদন-বিশেষজ্ঞের বুদ্ধিটাও যদি ধার করে, তা হলে এই চাতুর্যজনিত লাভটুকু শ্রমিককে না দিয়ে মালিক স্বয়ং আত্মসাৎ করবে। তাই এদের সঙ্গে সহায়তার ব্যাপারে আমি ইতস্তত করছি।"

"তা হলে চাকুরী তুমি নিচ্ছ না স্থির করলে ?"

"হ্যাঁ।"

"রামরাও, মস্ত একটা সুযোগ তুমি পাচ্ছিলে আর খামকা একটা কিছু কল্পনা করে নিয়ে সে সুযোগ তুমি খোয়াচ্ছ।"

"আমি যা করছি তা খুব চিন্তা করেই করছি। ক্ষণেকের তরে এ-চাকুরীর প্রতি মোহ জেগেছিল কিন্তু তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে অবস্থাটা সম্যক বুঝে সে মোহ আমি বিসর্জন দিলাম।"

"তা হলে আমার জন্য চাকুরী না নেওয়া তুমি স্থির করলে ?"

"কারণ তুমি নও, তবে নিমিত্ত বটে।"

"আমার ইচ্ছা যে তুমি চাকুরীটা নাও। শ্রমিক-কল্যাণ আর ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের অনেক বেশী সুযোগ তুমি এভাবে পাবে। ব্যবসায়ে লাভে, দেশেরও কিছু লাভ," সাগ্রহে কালিন্দী বলল।

"আর্থিক বৈষম্য দূর হয়ে মিল-শ্রমিকের কাজ অধিকতর ফলদায়ক হয় আর সে-কাজের যথোপযুক্ত ক্ষেত্রও যেন পাওয়া যায়, এটাই-আমার জীবনের পরম ধ্যান ও আদর্শ।"

"কিন্তু দেশ ও জীবনের অবক্ষয় বন্ধ করাটা কি প্রাথমিক কর্তব্য নয় ? আমাদের দেশে উদ্যম নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সেটা রক্ষা করা কি প্রয়োজন নয় ? যদি এই ব্যবসায় চলে তবেই শ্রমিকেরা দুটো পয়সা পাবে আর অচল হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ?"

"পরে একসময় বলব সে কথা।" রামরাওয়ের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল একটি দণ্ডায়মানা গুজরাতী মেয়ের চেহারা।

30

কিছুদিন বাদে যখন আপ্পাসাহেব বৈজনাথ শাস্ত্রীর কাছে গেলেন, তখন উনি বললেন, "কিভাবে নতুন জাতি আমরা স্থাপনা করব, তার সামনে আদর্শ কী রাখা হবে সে সম্পর্কে আমি একটি নোট তৈরী করেছি।"

"দেখতে দেবেন সেটা ?"

"তোমার দেখার জন্যই নোটটা আমি তৈরী করেছি। আমার হস্তাক্ষর তুমি পড়তে পারবে কি-না জানি না, তাই আমিই তোমায় পড়ে শোনাচ্ছি সেটা। এতে বাক্যগুলো পুরো লিখি নি, কেবল ইঙ্গিতসূচকভাবে লিখেছি। তুমি লিখে নাও তো ভাল হয়। নোটের সহায়তায় আমি পুরো বাক্য বলে যাব আর তুমি লিখে নেবে।"

শাস্ত্রীমশাই বলে চললেন আর আপ্পাসাহেব লিখতে লাগলেন।

"১। স্থাপয়িতাগণ এই জাতির নাম দিচ্ছেন 'ঋষিমণ্ডল'। সংসারের মহান্ কর্তব্য পালনের জন্য লোকেদের আচার-ব্যবহারে একটা বৈশিষ্ট্য প্রদানই এই জাতিস্থাপনার উদ্দেশ্য।

২। কেবল দেশের উন্নতিকল্পেই ঋষি-ধর্মের আর্য-স্বাতন্ত্র্যযুক্ত এই সমাজ স্থাপিত করা হচ্ছে না। কারণ আজকের অর্বাচীন জগৎ, ভারতবর্ষের চেয়ে অগ্রগামী না হয়ে বরং পশ্চাদ্‌গামীই হয়েছে। তাই আজ নিখিল বিশ্বের সামাজিক সব কুপ্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে, নতুন-আদর্শে-উদ্‌বুদ্ধ সমাজ-তৈরীর উদ্দেশ্যেই এই সমাজের স্থাপনা হচ্ছে।"

কথা দুটি লেখার পর আপ্পাসাহেব ডগ্‌গে বৈজনাথ শাস্ত্রীকে

বললেন, "এই দুটি পরিচ্ছেদেই আপনি আপনার মনের কথা তথা পুরাতন মতবাদ ও বর্তমানের পরিবর্তিত মতামত ব্যক্ত করে দিয়েছেন।"

"কি রকম সেটা?" বৈজনাথ শাস্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

"যেমন, স্বীয় কর্তব্যে আপনি আপনার দেশ নিয়ে ভাবেন। আর করণীয় যেটুকু, তা তো কোঙ্কণীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সহায়তা নিয়েই করতে চেয়েছেন? তাই না?"

"একসময় সেরকমই মত ছিল আমার। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ সে-মত খারিজ করে দিয়েছি। তবে তোমার সে কথাটা খেয়াল হল কেমন করে?"

"কেমন করে?

'জামদগ্ন্য প্রিয়া জাতিঃ
জামদগ্ন্য বলা ভতাঃ
রাষ্ট্রোদ্ধারপরা তস্যাঃ
বৈজনাথৈ কুলান্বয়ঃ'

আপনি যখন শিক্ষক ছিলেন, তখন আপনার সম্পর্কে রচিত কবিতা আমাদের সবার মুখে মুখে ফিরত। এসব ভুলি কি করে?"

"আচ্ছা, থাকুক সেটা। আমার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়ো না।"

"বলতে থাকুন।"

"৩। আজকের দুনিয়ায় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আচার-আচরণসূচক নিয়ম-রীতি-অনুশাসন ঘটিত যাবতীয় চিন্তা কেবলই পশ্চাদ্-মুখী হচ্ছে। আর সে-কারণেই এই বিষয়টায় সম্পর্কে একটা নতুন নিয়ম-প্রণয়নের আবশ্যকতা রয়েছে। আর সেই চিন্তাপ্রণোদিত হয়ে ঋষিমণ্ডলের প্রারম্ভিক নিয়মের প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের মত আমরা ব্যক্ত করেছি।"

বৈজনাথ শাস্ত্রী এতটুকু বলার পর আপ্পাসাহেবের লেখা বন্ধ হয়ে

ব্যাখ্যা শুরু হয়ে গেল। উনি বললেন, "সংসারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহার-আচরণের ক্ষেত্রটা সীমিত। অর্থাৎ, কর্তব্যও যাদের সীমিত, এই নিয়মানুসরণ তাদের জন্যই। কিন্তু কর্তব্য-পরিসর যাদের বড়, তাদের আদৌ এই নিয়মাদির আবশ্যকতা নেই। শাস্ত্র তথা দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব ব্যাপক প্রচারে যারা নিরত, তাদের অর্বাচীন সংসার সম্পর্কে কখনই কোনও চিন্তায় লিপ্ত হতে হয় না। আজকের বিবাহ-প্রথা কেবল যাদের একটা সুনির্দিষ্ট আয় রয়েছে, তাদের জন্যই। তাই বিবাহ-প্রথা যাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তাদের নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহার-বিধিটাই অন্য রকমের হওয়া দরকার। আমি ঋষিমণ্ডলের সভ্যবৃন্দের গোচরে এই কথাটা আনতে চাই।" আবার লেখাতে শুরু করলেন বৈজনাথ শাস্ত্রী।

লেখা শেষ হওয়ার পর আপ্পাসাহেব কলম বন্ধ করলেন। উনি বললেন, "বৈজনাথ শাস্ত্রীজী, আপনি যা যা বলে যাচ্ছেন তা লিখতে আমার হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। আপনার সব কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আপনার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করছে।"

"কেন, কী কথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে?"

"এখন যে বিধান আপনি দিলেন তার বিরুদ্ধে।"

"তা হলে আগে লেখক তৈরী করে নিয়ে পরে একসময় ডাকব তোমায়।"

"মানে?"

"মানের কি আছে? আমি যা বলে যাচ্ছি, তোমার তা লিখে নেবার ক্ষমতা নেই। এরকম করলে, তুমি বরং বাড়ী ফিরে যাও। সত্যব্রতকে পাঠিয়ে দাও কিছুদিন। সে তোমার চেয়ে ভাল লিখতে পারবে।"

"আচ্ছা" বলে আপ্পাসাহেব কলমটা নামিয়ে রাখলেন। তখন

আবার বলতে শুরু করলেন বৈজনাথ শাস্ত্রী।

"আমার সব সংস্থাপকবৃন্দ মহান্ ঋষিদের বংশধর আর একই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন-ব্যাপারে যে-স্বাধীনতা প্রাচীন ঋষিরা নিতেন, তা আমরাও নিচ্ছি। সংসারের কোনও নীতি-নিয়ম বা আইনের বন্ধনকে আমরা স্বীকার করব না। বিশেষ পরিস্থিতিতে আবদ্ধ লোকেদের বিশেষ ধারায় জীবনক্রম চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সব নিয়ম তৈরী করা হয়েছে, আমরা এরকম মনে করি না।"

31

শনিবার সন্ধ্যায় কালিন্দী যখন এল, তখন ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য এস্থার সত্যব্রতের কাছে খবর পাঠাল। সত্যব্রত জবাবে জানাল, "কাল দুপুরে আসব।"

আগের দিন রাতে যখন দুই সইয়ের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল, "তোর সেই পূর্বেকার দেখা আবাই তো আমার ভাই সত্যব্রত। তাই না?" জবাবে এস্থার ঘাড় বাঁকিয়ে একটু হাসল।

"তাহলে কি ওর গালটা তুই টিপে দিয়েছিস?"

"চিমটি দেবার ইচ্ছাটা তো হয়েছিল, কিন্তু ভরসা পাই নি। তবে তুই যে এসেছিস এখানে সেটা ভালই হয়েছে। তোর সামনেই গাল খিমচে দেব।"

"আমি তবে আবাকে বলি যে তোর মন ওর ওপর পড়েছে?"

"তুই এসব বলবি না। বার কয়েক আসুক সে। যেন সে কোনও-না-কোনও কারণে আমার কাছে আসে, সেরকম কিছু করিস।

ওর জন্য কিছু জিনিস এখানে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া বা আমার কাছে কিছু ওর মারফৎ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা— এভাবে আমাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের পালাটা বেড়ে যাওয়া দরকার।"

"একথাটা ঠিক। খুশী মনেই আমি তা করব।"

"আর বল, কী ওর ভাল লাগে। তাহলে এখানে এলে প্রতিবারই ওকে সেরকম খেতে দেব। সেই কারণে ওরও আমার এখানে আসতে ভাল লাগবে।"

"তুই বেশ ভাল, এস্থার। এব্যাপারে আমার কী করণীয় সে-বিষয়েও তুই ভেবে রেখেছিস।"

"আঠাশ বছর বয়স হল আমার। আবার আরেকটা মুহূর্তের প্রতীক্ষায় থেকে কি যে-সুযোগটা এল সেটাকে অনর্থক খোয়াব?"

'কোনওক্রমেই খোয়াতে হবে না। আবাই বা তোর মতো বউ পাবে কোথায়? তবে আবা তোর চেয়ে বয়সে খানিকটা ছোট তো? আমার মতে এতে কিছু ফারাক হয় না।"

'কিন্তু তুই-তো বললি না আবার কী ভাল লাগে?"

"প্রায় সব কিছুই সে পছন্দ করে। নোনতা খাবার, আর তা ঘরে তৈরী হলে, বড় খুশী হয়ে সে খায়।"

"পকৌড়াও?"

"হ্যাঁ, পকৌড়াও তার ভাল লাগে। কিন্তু আমরা পকৌড়া তৈরী করি না। দোকানের পকৌড়া তো সে খায়। দোকানে যা পাওয়া যায় না, আমরা বাড়ীতে তাই বানাতাম আবার জন্য।"

"তাহলে বাদাম আর কাজু মেশানো সুজির তৈরী যে বরফী বাড়ীতে আছে, তাই আমি ওকে দেব।"

"তবে মনে রাখিস পকৌড়াটা সে পছন্দ করে। একবার মা ঠিক করেছিল যে ওকে পেট ভরে পকৌড়া খাওয়াবে। সে খেয়েওছিল পেট

বোঝাই করে। কিন্তু মা যখন জিজ্ঞাসা করল যে পকৌড়া খেয়ে পুরো তৃপ্তি তার হয়েছে কি। তখন সে··· ।”

“কি জবাব দিল ?”

“সে বলল যে আমার পেট ভরে গেছে তাই আর পকৌড়া খেতে পারছি না, কিন্তু এ-খেয়ে তৃপ্তিও খুব একটা পাই নি।”

এভাবে দুই সইয়ে মিলে আবা সম্পর্কে নানা কথাবার্তা বলছিল।

এরপর আধঘণ্টার মধ্যেই কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল, “তোর জাত আর সমাজ তোর এ-বিয়েতে সম্মতি দেবে ?”

“না।”

“তাহলে ?”

“সম্প্রদায়ভুক্ত সবাই বলবে যে মেয়েটা কুলত্যাগিনী হল। কিন্তু আমি যদি ধর্মান্তরিত হিন্দু হয়ে হিন্দুসমাজভুক্ত হয়ে যাই, তাহলে আমার সমাজের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কি থাকছে ? সমাজের মতামতের গুরুত্ব মেয়েদের কাছে কতটুকু ?— যতক্ষণ তাদের বিয়ে না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্তই। কিন্তু বিয়েটা যদি সমাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর হয় তাহলে লোকমতে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই থাকে না। ভয় পেলে সেটা নিজের আপনজনকেই। দেখতে হবে আমার আশ্রয়-পরিজন আমায় না ছেড়ে দেয়। হয়ত এরকম বিয়ের কারণে ওরা গোড়ায় রেগে যাবে, তবে পরে তাদের বোঝাতে পারব।”

“কিভাবে ?”

“আমি ওদের বলব যে ইহুদী ছেলে যদি সমাজের বাইরের মেয়ে ঘরে আনে তবে তাতে কুল কলঙ্কিত হবে। কিন্তু মেয়ে বাইরে বিয়ে করলে কুলে কালি পড়বে না, কারণ মেয়ে তো বাইরের পরিবারেই চলে যাচ্ছে।”

“হ্যাঁ, কথাটা সত্যি, তবে তোদের সমাজেও তো লোক আছে, যারা

মাথা গুণে বেড়ায়, তারা বলবে আমাদের সমাজের একজন কমে গেল।"

"ওদেরও চুপ করিয়ে দিতে পারা যায়। পীছে নগরকা নামে এক ব্রাহ্মণ একটি ইহুদী মেয়েকে বিয়ে করেছিল, তখন কত যে গণ্ডগোল হয়েছিল, সব আমি জানি না। কিন্তু সে-শহরের একটি মেয়ে আবার এক বেন ইহুদীকে বিয়ে করে সমাজে ফিরে এসেছিল। একজন চলে গিয়ে থাকলে, অন্য আরেকজন ফিরে এসেছিল। আমার হিসাব পরিষ্কার।"

কালিন্দী হাসতে হাসতে বলল, "পরিষ্কার হিসাব হল? ইহুদী মেয়ের দু-তিনটে ছেলে হিন্দু হিসাবে যুক্ত হল তো তার উপায় কি?"

'সে হিসাবে সে ব্রাহ্মণের এক মেয়েও ইহুদী হল তো তার উপায় কি? সে-সঙ্গে এ-মেয়ের মা-ও বিয়ে না করে থাকলে কি ব্যাপারটা হয়?"

''কিন্তু তোর বিয়ে হচ্ছিল না। তাই তোর মত সুন্দরী সুশিক্ষিতা আর সহাস্যবদনা মেয়ে ইহুদী সমাজ ছেড়ে অন্য ধর্ম বা সমাজে চলে গেলি, এমন কথা কি কেউ বলবে না?"

"শোন, আমার দু-চারটা মেয়ে হলে বরং এক-আধটা আবার ইহুদী সমাজে ফেরত পাঠিয়ে দেব।"

"তোর মেয়ের বিয়ে কার সঙ্গে হবে সে-বিষয়ে আমি এখানে বসেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরী করছি। তবে বিয়ে সুনিশ্চিত কি-না, তাই এক প্রশ্ন বটে।"

"তবে কল্পনায় রাজ্য-পাট তৈরীতেই বা আপত্তিটা কিসের? একথা বলে কি আমি খোয়াতে যাচ্ছি কিছু? সত্যি রাজ্য না-ই বা হল, কল্পনার রাজ্য তো পেলাম। সেটাই বা কি কম লাভ?" জবাব দিল এস্থার।

''আবা কবে আসছে ভেবে আমি অধীর হয়ে উঠছি," কালিন্দী বলল।

"আমারও ওই এক ঔৎসুক্য, কিন্তু প্রথমে কে কথা বলবে ?"

"কথা আমিই বলব। সে সময় তুই পালাবি আর আমাদের কথাবার্তা যখন অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকবে, সে ফাঁকে তুই চা তৈরী করবি। ব্যস্," কালিন্দী উত্তর দিল।

32

সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ওয়েস্ট এণ্ড টকীজে সিনেমা দেখতে এসে উষা যখন সত্যব্রতের সঙ্গে সিনেমা-হলের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন তাকে অভিবাদন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একটি তরুণ এসে মাথার টুপিটা নামিয়ে নিল। এ দেখে সত্যব্রতও মাথাটা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল। উষা ছেলেটির দিকে তাকাল না আর সত্যব্রতরও উষার প্রতি দৃষ্টি ছিল না। ছেলেটিকে চেনে উষা। সেটা যে সে চেপে যাচ্ছে, তা-ও সত্যব্রত ঠিক ধরতে পারল না। যে কেউ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিনন্দন জানালে, তাকেও উলটে মাথা হেলিয়ে প্রত্যভিবাদন জানাতে হয়, সেটাই তার মনে এল এবং সে-ও মাথাটা ঝোঁকাল। মাথা হেলানো ব্যাপারটা তার পক্ষে খুবই সহজ ছিল।

তবে মাথা-ঝোঁকানো এ-লোকটি তার বা উষার ঠিক কার যে পরিচিত, সে-জিজ্ঞাসাটা সত্যব্রতের মাথায় পরে এল। তার নিজের চেনা মনে করেই গোড়ায় সে নিজেই প্রশ্ন করল কোথায় দেখেছি একে। কিন্তু এ যে কে, সেটা মনে আসছিল না। তার নিজের পরিচিত নয় তা যখন বুঝল, তখন সে ভাবল হয়ত বা উষারই চেনা হবে। হলে বসে সে বলল, "টুপি উঠিয়ে অভিবাদন জানাল যে ছেলেটি সে যে কে

ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। কোথাও না কোথাও পরিচয় সম্ভবত হয়েছে, কিন্তু এখন মনে আসছে না।"

উষা বলল, "পরে তোমায় এর সম্বন্ধে বলব।"

"তবে তোরই চেনা এ-ছেলেটি? তাহলে সে তোকে অভিবাদন জানানোর জন্যই টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে নিয়েছিল?"

"আমার পরিচিত এ নয়। আমার সঙ্গে জোর করে সে পরিচয় করতে চায় মনে হয়।"

"এ কে?"

"কে যে তা আমিও জানি না। তার আমার মধ্যে কোনও রকম পরিচয়ই নেই। একবার যখন এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমায় এসেছিলাম, তখন আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা কিন্তু এ করেছিল। বেরুবার মুখেও করেছিল। আমায় সে জিজ্ঞাসা করেছিল— ভাল গান গায় না নরিস সিভালিয়র?"

"তারপর?"

"আমার বোধ হয়েছিল হয়ত আমার বন্ধুটির সঙ্গে ওর চেনা আছে। আর পোষাক-আশাকেও ভদ্রলোকের মতোই।"

"তুই কি উত্তর দিয়েছিলি?"

"পরিচয়-প্রসঙ্গ বাড়িয়ে এর সঙ্গে রসিকতা করার কোনও রকম ইচ্ছাই আমার হয় নি। আমার কাছ থেকে, না, আমার বন্ধুর কাছ থেকে, জবাবটা কার কাছ থেকে সে প্রত্যাশা করছে বোঝার জন্য আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কেউ-ই জবাব দিই নি।"

"কেউ উত্তর না দেওয়ায় সম্ভবত সে সঙ্কোচ বোধ করল?" সত্যব্রত জানতে চাইল।

"একদমই নয়। আমরা যখন বাইরে এলাম, তখন আমাদের

দিকে ফিরে সে বলল, 'টাঙ্গা ডেকে আনব আপনাদের জন্য ?' 'কষ্ট করার প্রয়োজন নেই' আমার বন্ধুটি বলেছিল। তারপর টুপিটা নামিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সে চলে গেল। দুদিন বাদে এম্পায়ার থিয়েটারে গেলাম। সেখানেও সে সময় সে ছিল। টিকিট নিয়ে সীটে গিয়ে বসতে সে-ও আমাদের পাশে এসে বসল। চুম্বনের দৃশ্য হতেই সে বলে উঠল 'ভাগ্যবান যুবক !' আর আলিঙ্গনের দৃশ্যে বলল, 'আরও কাছাকাছি হয়ে জাপটে ধর।' আমার মনে হল এসব দৃশ্যে আমাদের হাবভাব-মুদ্রা কেমন হয়, তা-ও যেন সে অন্ধকারে বোঝার চেষ্টা করল। এর আগে বিরতির সময় একবার অনেক চকোলেট এনে আমাদের নেবার জন্য সে বহু সাধ্য-সাধনা করেছিল। আমরা নিই নি সেসব। 'নিতে লজ্জা কোরো না' এরকমভাবেও সে তখন বলল। তবুও আমরা ওর দিকে নজর দিই নি। তখন যেন সে একটু নিরাশ হল আর শেষে ছড়া কাটতে লাগল। তার বক্তব্যটা ছিল এরকম,

ক্ষুদ্র কীটও পরিশ্রম সহকারে পাথরে অনুপ্রবেশ করে। হে নিষ্ঠুরা কন্যা, আমিও তোমার হৃদয়ে স্থান পাবার জন্য সচেষ্ট হব।

তার ছড়া থেকে এটুকু পরিষ্কার হয়েছিল যে সে মারাঠী ভাষা জানে। এতকাল কথাবার্তা ইংরেজীতেই বলছিল, তাই আমার ধারণা হয়েছিল যে ইয়ুরেশীয়ান বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অথবা গোয়ার লোক।"

সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করল, "তারপরে আর দেখা হয়েছিল ?"

ঊষা জবাব দিল, "না, আজই আবার দেখা হল।"

দুদিনবাদে আবার নাটক দেখতে গেল সত্যব্রত আর ঊষা। সে যুবকটিকে ধারে কাছে দেখা গেল না। বিরতির সময় চা-জলপানের উদ্দেশ্যে একটা টেবিলের ধারে এসে বসেছে ঊষা, আর আবা টয়লেটে গেছে, সে সময়ই যুবকটি ঊষার কাছে এসে হাজির হয়ে বলল, 'গুড ইভনিং।' ঊষা ওর দিকে তাকাল না। 'তুমি আমার প্রতি কি

অসন্তুষ্ট ?' কথাটা ইংরেজীতেই সে জিজ্ঞাসা করল। আবারও উষা জবাব দিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী পছন্দ ? গরম কিছু, না ঠাণ্ডা চা ?' এটুকুতেই সক্রোধে উষা বলল, "আমার কিছুই চাই না। তুমি যাবে কি-না এখান থেকে ? না হলে কর্মকর্তাদের আমি জানাব—আমায় তুমি বিরক্ত করছ। আমার ভাই আমার সাথে রয়েছে। এখনই সে আসবে। সে মার দেবে তোমায়। অকারণ মারপিট হবে। চলে যাও এখান থেকে।"

সেই যুবকটি শান্তভাবে বলল, "আপনার বন্ধু আসছে, তাহলে চলে যাই আমি ? তা, তিনজনের জন্যই আমি পানীয় কিছু আনাই ? এতে মারপিটের কথা ওঠে কেন ?" উষা চুপ করে বসে রইল আর যুবকটি সসংকোচে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। ইতিমধ্যে সত্যব্রত ফিরে এল সেখানে। সেই যুবকটিকে দেখে তার অত্যন্ত রাগ হল, তবে হাত না উঠিয়ে নিজেকে সংযত রেখেই সে জিজ্ঞাসা করল, "একা মেয়েদের দেখলে তুই পিছনে লাগিস। তুই কি সভ্য মানুষ ? কোনও মেয়েকে একা দেখে যেচে তার সঙ্গে কথা বলাটা কি সভ্য রীতি ? ভারতীয় প্রথায় একে সভ্যতা-শালীনতা বলে না আর ইংরেজী রীতিতেও নয়।"

"সভ্য রীতি না হলেও বা এতে দোষটা কি ? আমি এক্ষুনি বলেছি আপনাদের যে আমি একজন ছাত্র। আমায় ভব্য-সভ্য ভদ্র-লোক হতে হবে।"

'ছাত্রদের পক্ষে এসব ব্যাপার একদমই উচিত নয়। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করা অনুচিত, এটুকুই আমি বলব, গুড বাই।"

"আমায় বিদায় জানাচ্ছেন কেন ? অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে পরি-চয়ান্তে কথাবার্তায় আপত্তির তো কিছু নেই ? প্রত্যেক পরিচিত মহিলাই একসময় অপরিচিত থাকেন।"

"তা, পরিচয় যদি করতেই হয়, তবে সেটা প্রচলিত মতেই করা কর্তব্য।"

"যথাযোগ্য পথে পরিচয়-সাধনটা সহজ-সরল হলে আমি সেটাই অনুসরণ করতাম। গোড়ায় আপনাকে ওর সঙ্গে দেখলে, আপনার সঙ্গে পরিচয়টা করে নিয়ে এ-পরিচয় যাচ্ঞা করতাম। আমার ধারণা আপনি নিশ্চয়ই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন।"

সত্যব্রত বলল, "কথাবার্তা তোমার আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ।" বিরুদ্ধ-ভাবটা সত্যব্রতের ক্রমে এখন কমে আসছিল।

"হয়ত বা আমার কথায় আত্মবিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আস্থা আমার রয়েছে আপনার উদারতার ওপর।" যুবকটি এ কথা বলল আর ঝগড়াঝাঁটিরও সমাপ্তি ঘটল। উষারও মত-পরিবর্তন হতে শুরু হল। গোড়ায় রাগ ছিল কিন্তু পরে সে ভাবল যে তার তরফেও এই ধরনের ব্যবহার অনুচিত হয়েছে। তারপর যেসব কথাবার্তা চলতে লাগল তাতেও তার চিন্তা বদলে গেল এবং শেষ অবধি একটা কৌতূহল জাগ্রত হল মনে।

"আমার উদারতায় তোমার কিছুটা আস্থা আছে? তা, তাতে লাভটাই বা কি? বোন আমার এখনও অনেক ছোট আর তার অভি-ভাবক আমি নই, আমার বাবা। তাই পরিচয়ের সুযোগ-দানের অধিকার আমার নয়, ওদেরই কারুর।"

এই জবাবটা দেবার সময় সত্যব্রতর মনে হল খুব শাণিত আর বুদ্ধিদীপ্ত হয়েছে সেটা।

সেই যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, "আমি তাহলে কি করব? আপনার কি মনে হয়?"

সত্যব্রত জবাব দিল, "অল্পবয়সী যুবতী মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে পরিচয় করার চেষ্টাটা ঠিক নয়।"

“আর আমার মন যদি কোনও যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে কি চুপচাপ বসে থাকব ?”

“তাহলে··· তাহলে করা যা উচিত তার সমাজসম্মত পথ রয়েছে। সে মেয়ের বাড়ীর লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তবে এই পরিচয়-বৃদ্ধিতে তৎপর হওয়া উচিত।”

“আমার কাছে এটা কোন কাজের পদ্ধতি নয়।”

“তবে আচার-আচরণ ও শালীনতার পদ্ধতিই এটা।”

“ভালবাসা হলে অর্থাৎ মেয়ে-পুরুষের আকর্ষণের পর পূর্বাপর সব ব্যবহারবিধিই সভ্য আচরণের নিয়মবদ্ধ করা যায় নাকি ? ভালবাসার আবার কোনও সুনিশ্চিত বিধি রয়েছে কি কিছু ? একেবারেই নয়। তাই আজ যে পরিচয় হল, তার পরিসর-প্রসঙ্গ বৃদ্ধিতে বাধা কিছুই নেই বলেই আমি মনে করি।”

“তোমার নামটা তো জানা হল না ?”

“আমার নাম বেঞ্জামিন।”

“তাহলে ইহুদী তুমি ?”

“না, আমি বেন ইহুদী (ইস্রায়েল)।”

“তার মানে হিন্দু না হয়েও তুমি হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে এধরনের ব্যবহার করতে চাও ?”

“মিষ্টার ডগ্‌গে, আমি চিনি তোমায়। অন্ততঃ তুমি আমায় দোষ দেবে না, মনে হয়েছিল।”

“কেন, তার কারণ কি ?”

“আমি এস্থারের দূর-আত্মীয়। তুমি মিস্ কিল্লেকারের সঙ্গে দু’-তিন দিন আগে সিনেমায় গিয়েছিলে না ?”

উষা সত্যব্রতের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

“হয়ত গিয়েছিলাম। তাতে কি ? আমি তখন আমার পরিচয়

গোপন করি নি।"

"তোমার আর এস্থারের মধ্যে পরিচয় তোমার বোন মারফৎই হয়েছে। যে-যুবকের বোন নেই সে কি করবে?"

বিরতি শেষ হতে সব লোক ভেতরে চলে গেল। যেতে যেতে বেঞ্জামিন সত্যব্রতকে বলল, "এখন আমি তোমার সহযোগিতা চাইছি। আমি তোমার বোনের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার কিছু করি নি। আবার দেখা হলে তোমার বোনের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি আমি চাইছি।"

সত্যব্রত কোনও জবাব দিল না।

সিনেমা শেষ হল। বাড়ী ফেরার জন্য যখন সত্যব্রত টাঙ্গায় উঠে বসেছে, তখন বেঞ্জামিন বলল, "আগামী শনিবার আমার তরফে সিনেমা দেখার নিমন্ত্রণ রইল। সেটা গ্রহণ করুন আপনারা। আমি কে সে-কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বম্বেতে গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। ছুটিতে পুনা বেড়াতে এসেছি।" সত্যব্রত জবাব দিল, "তোমার নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করতে পারছি না।"

রাস্তায় আসতে আসতে বেঞ্জামিনের আচরণ-সম্পর্কে ভাই-বোনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। যে-কোনও যুবকেরই কোনও অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে আলাপের চেষ্টা উচিত কি অনুচিত, সেবিষয়ে ভাই-বোনের মতটা একই ছিল। যদি বাড়ীর বয়স্ক কারুর মারফৎ পরিচয় ঘটে তবে তাকে প্রথমে কারণটা জানতে হবে। সে যদি বিয়ের প্রসঙ্গ করে? বিনা পরিচয়ের বিয়েতে কে-ই বা রাজী হবে? তাই বড় কারুর মাধ্যমে পরিচয়-প্রচেষ্টা ভুল এবং হাস্যাস্পদও বটে। দুজনেই এরা এবিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হল। তাছাড়া, সত্যব্রত ভাবল লোকটা ভাল না মন্দ কে জানে।

সে সময় ঊষা সত্যব্রতকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এস্থারের সঙ্গে নাটক দেখতে গিয়েছিলে, তা বাড়ীতে কাউকে কেন জানাও নি?" আবা ঊষাকে বলল, "এসব কথা বলতে গেলে ভুল বোঝাবুঝিটাই বেড়ে যায়।"

সদাশিবপেঠের দিকে টাঙ্গাটা যেতেই উষা জিজ্ঞাসা করল, "আজ-কের ঘটনাটা কি বাড়ীতে বলব ?" তখন আবা বলল, "এখুনি বাবা আর মাকে এসব বলার প্রয়োজন নেই।"

33

কালিন্দী যখন রামরাওয়ের কাছে এল তখন সে বলল, "আমি নিত্য-দিন শ্রমিকদের দারিদ্র্য-দুর্দশা দেখি। যতখানি মেহনৎ ওরা করে সে-অনুপাতে পেটভরে খেতে পায় না। ওদের দরিদ্রতা আমি যতটা জানি, ওদের হাজার হাজার পরিবারের আর্থিক অবস্থা আমার যতটা জানা, সম্ভবত আর কেউ ততটা জানে না। এমতাবস্থায় নিজের আর্থিক উন্নতির কথা ভেবে কেবল এদের কল্যাণকর্মে লিপ্ত থাকার মতো মেজাজ-স্ফূর্তি আমার থাকে না। তাদের বাস্তব পারিবারিক অবস্থাটা সম্যক না জেনে, প্রতিদিন ওদের ঘরে গিয়ে হালচাল না দেখে, ওদের মঙ্গল-সাধনের অনুপ্রেরণাটা তুমি কি ভাবে পাও, সেটা আমার জানতে ইচ্ছা হয়।"

"শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য নয়, বরং স্বীয় হিতার্থেই আমি সব কাজ করছি। যে-দৃশ্যটা আমার দেখার অভিলাষ, তা দেখার জন্যই প্রয়াস করছি।"

"এরকম ধরনের লোক তো গল্প-উপন্যাসে লেখক এনে হাজির করেন। ব্যবহারিক জীবনে এদের প্রত্যক্ষ করা যায় না।"

"অর্থাৎ, তুমি আমার মনের রহস্যটি উদ্ধার করতে চাও!"

"বড় কাজে যারা লিপ্ত, তাদের মনের চিন্তাধারা বোঝার অধিকার

সবারই রয়েছে। মনটা চেপে রাখা আর কার্যপ্রণালী এই হবে এসব বলা, অনেকটা যেন আমাদের শ্রমিকদের বোধগম্য যন্ত্রের ভাষার মতোই। কিন্তু এদের চালনা করার প্রধান শক্তির উৎসটা কোথায়, কোন যন্ত্রে, তা কখনই বলা হয় না। তোমার কাজে যাতে পূর্ণ-সহযোগিতা করা সম্ভব হয়, সেজন্য কার্যপ্রণালীর সব শাখা ভাল করে বোঝা প্রয়োজন। আর সে কারণেই শক্তি-প্রবাহের রহস্যটা আমাদের জানা দরকার।"

"এ-রহস্য ব্যক্ত করাটা খুব রুচিকর হবে না।"

"অরুচিকর রহস্যও বন্ধু-বান্ধবের কাছে ব্যক্ত করায় আপত্তির কিছু নেই। বরং যেখানে মিত্রতার ব্যাপার সেখানে এসব রহস্য ব্যক্ত করলে মনের বোঝাটা হাল্কা হবে।"

"একবার মনে হচ্ছে বলি সব, কিন্তু আবার মনে হয়, না, বলব না।"

"বলতে এত সংকোচ কেন? এসবের পেছনে কি কোনও বেদনা-দায়ক ঘটনা রয়েছে বা তাতে কোনও মেয়ে জড়িত?"

"তুমি ব্যাপারটা যাচাই করতে চাও? সেটা এমন আর কি কথা?"

"আমার ভাই সত্যব্রত বলে যে বহু-স্বার্থত্যাগীর কাজকর্মের পিছনে প্রেমের দুঃখদায়ক স্মৃতি বর্তমান।"

"আমি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছি কি-না বলতে পারব না।"

"নিজের মনটাই তুমি নিজে জান না?"

"নিজের ব্যথা-বেদনার কথা বলাটা আমার বেশ কঠিন বলেই মনে হচ্ছে। এরকম ব্যাপারের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় হয়ত আছে. তবুও কাল্পনিক না হয়ে এটা সত্যই বটে। একজন লেখকের আত্মকথা এটা। সব যদি তোমার জানা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে যা বলতে চাইছি, সেটায় নতুন আর কিছু থাকছে না।"

"কোন গল্প এটা?"

“ ‘অভাগী-ভাগ্যবান’ নামে যে গল্প চন্দ্রিকা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, সেটা তুমি কি পড়েছিলে ?”

“ভাল করেই পড়েছিলাম গল্পটা। বেশী কি, কয়েকবারই পড়েছিলাম। কে তার লেখক ? সম্পাদককে কথাটা আমি জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, তবে তিনি জানান নি সেটা।”

“তা হলে ঠিক আছে। আমিই সম্পাদককে খুব তম্বি করে লিখেছিলাম যেন লেখকের নাম গোপন রাখা হয়।”

“গল্পটা পড়েছি আমি, তবে তা থেকে তোমার কাজের প্রেরণা কিভাবে বৃদ্ধি পেল, তা তো পরিষ্কার হল না।”

“এটুকুই বলার বাকী ছিল। এখন সেটা বলছি।”

“বলো তুমি। তার আগে একটা কথা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই। যেই নয়দেব ভগিনীকে তুমি প্রত্যুত্তর দিয়েছিলে, সে অন্য কেউ নয়, আমি স্বয়ং। নয়দেবের মানে যম। যমের অর্থ যমুনা অর্থাৎ কালিন্দী। আমার দু'তিন জন বান্ধবীর কথা একত্রাকারে উপেন্দ্রবজ্রা নামের এই কাহিনী আমি খাড়া করি।”

“আশ্চর্য, তুমিই নয়দেব ভগিনী ?”

“কেন, তোমার কল্পনায় কি মনে হয়েছিল ?”

“নয়দেব ভগিনী সম্পর্কে আমার মনে কোনও রকম কল্পনাই ছিল না।”

“আমার কিন্তু মনে হত যে আমার গল্পের প্রত্যুত্তর যে লিখেছে, নাম গুপ্ত রাখা সত্ত্বেও কখনও না কখনও তার সঙ্গে দেখা হবে।”

“আমারও মনে হত যে নয়দেব ভগিনীর সঙ্গেও নিশ্চয়ই আমার একবার দেখা হবে।”

“গল্পটা তোমার কেমন লেগেছিল ?”

“আজ কেমন মনে হচ্ছে, তা-ই বলছি। যে-মেয়ে এটা লিখেছে,

জীবনের বহু-অভিজ্ঞতা তার লাভ হয়েছে, এরকম মনে হয়েছিল।"

"উত্তর যে লিখেছিল, তার সম্পর্কে কি ধারণা হয়েছিল? এমন মনে হয় নি তো যে আপন দুর্নীতি সে সদম্ভে প্রকাশ করছে?"

"আমার সেরকম মনে হয় নি। আমি জানতাম যে লেখক হতভাগ্য। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে অল্প-বয়সেই সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতাহেতু দুনিয়ার ওপর অবিশ্বাস জন্মে গেছে— এমন লোকই এ-গল্পের লেখক। সত্যি, তাঁর প্রতি আমি সহানুভূতি বোধ করেছিলাম। কেউ কি এর আলোচনা করে বলেছে যে এটায় দুর্নীতির প্রচার হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, সে সময় অনেক পত্র-পত্রিকায় এধরনের কথা লেখা হয়েছিল। কেউ কেউ এটাকে নকল বলে জানত।"

"কেন?"

"কখনও যদি পুরুষ কেউ কোনও মেয়ে সম্বন্ধে অবৈধ সম্পর্কের উল্লেখ করে তখন সেটা মিথ্যা হয়ে পড়ে, আর তাই এ-গল্পকে নকল বলে মনে করা হয়েছিল। এরা কেবল এধরনের সম্পর্ক ব্যাপারে বড়াই করার চেষ্টা করে, কিন্তু দায়িত্ব সহকারে কিছু বলে না।"

হাসতে হাসতে কালিন্দী বলল, "তা হলে পুরুষেরাও মিথ্যাবাদী হয়, সে কথা তুমি মানো?"

"তবে মেয়েরাও কম মিথ্যাচারী নয় আর নীতিবিহীন সম্পর্ক কিছু থাকলে সেটা স্বীকার করতে চায় না।"

"তা হলে এর অর্থটা দাঁড়াচ্ছে যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মিথ্যা কথা বলে, তবে এদের চলার ধরনটা ভিন্ন। প্রত্যেকেরই তো আলাদা আলাদা ধরনের মিথ্যা বলার দরকার হয়।"

"পুরুষ আর মেয়েদের সামাজিক অবস্থার পার্থক্যহেতু কাজ বা বৃত্তি ভিন্ন হয়। মনে কর, একজন পুরুষ আর একটি মেয়ে একত্রে

থাকে কিন্তু তারা বিয়ে করে নি। তা হলে পুরুষ বলবে যে এ আমার রক্ষিতা। একে আমার স্ত্রী করব।”

কালিন্দী প্রশ্ন করল, “এতে পার্থক্যটা কোথায় ?”

রামরাও জবাব দিল, “মেয়ে যখন বিয়ের কথা বলে তখন সে স্বীয় অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হয়। আর পুরুষ যখন সেটা মেনে নেয়, তখন সে আপন ‘দায়’ স্বীকার করে নিচ্ছে।”

একটু দুষ্টুমীর ভঙ্গীতে কালিন্দী বলল, “ভালবাসার জন্য না করে যদি নিতান্ত টাকার জন্য বিয়েটা করা যায়, তাহলেই বা মন্দ কি ?”

“সে মেয়ে স্বামী বলে যাকে মেনেছে তার সঙ্গে ততটা একাত্ম হতে পারবে না, যতটা না সে আমার সঙ্গে হয়েছে, আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু এই একাত্ম ভাবটা বিষয়ভোগের ধাক্কায় খান্ খান্ হয়ে গেছে। আমার নীচু পদ, বিবাহের পক্ষে তার অযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। এর গোড়াকার কারণটা কিন্তু টাকা-ই।”

“করুণসুন্দরীর কাহিনীটা আমি মনে মনে অল্পবিস্তর চিন্তা করেছি। তার এই অর্থকেন্দ্রিক আচার-আচরণ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রেম করে বিয়ে করার ব্যাপারটায় তাকে ক্ষান্ত দিতে বলা হয়েছিল। হয়ত বা মা-বাবা বিয়ে ভেঙে দিতে দেয় নি। তার গহনা-সম্পত্তিহেতু মিলের অধিকার বা মালিকানাটা তখনও বজায় ছিল,” কালিন্দী বলল।

রামরাও বলল, ‘ তুমি ঠিকই অনুমান করেছ।”

কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল, “বাবার আদেশ মেনে নেওয়াটা কি ভাল মেয়ের কর্তব্য নয় ?”

“না। আমাদের প্রাচীন পরিবার-বিধি যাচাই করে, যা কিছু মিথ্যা সেটা ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যেও অনু-শাসন জাতীয় মিথ্যা ব্যাপারও কিছু রয়েছে।”

“সেটা কি রকম ?”

"পীড়নকারী বাপের আদেশ মানতেই হবে, এমন যে নিয়ম!"

"এধরনের নিয়ম চাই না, এই কথা?"

"ভালবাসার জনকে না করে অন্যকে বিয়ে করার পরেও, ছেলে বা মেয়ের কি মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করতে হবে?"

"তাদের মঙ্গলের জন্যই এটা," কালিন্দী জবাব দিল।

"কিন্তু অনেক সময়ই এ জিনিসটা আপন-হিতের জন্যই করা হয়, সন্তানের হিতের জন্য নয়। রাজনীতির উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাজকন্যার বিয়ে স্থির করা হয় আর বৈশ্য কন্যার হয়, অর্থের কারণে।"

"অন্ততঃ করুণ-সুন্দরীর বিয়েটা যে তার বাবা টাকার জন্যই স্থির করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে তার বাবার হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিল।"

"আর তার বাবা হয়েছিল পরিস্থিতির ক্রীড়নক।"

কালিন্দী কৌতূহল প্রকাশ করল, "সেটা কেমন ব্যাপার?"

"তার বাবারও তার শ্বশুরের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন পয়সার জন্যই, কারণ তার সেটার প্রয়োজন ছিল। বাপের টাকার প্রয়োজন ছিল, কেননা সেটা বেশী না হলে, কেবল হিসাবের খাতিরে তাকে যে মিলের সূত্রধার এজেন্ট করা হয়েছিল, সেটা সম্ভব হত না। টাকা সংগ্রহের কেরামতি অনুযায়ী তার ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়েছিল। সমগ্র ব্যাপারটাই টাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যতক্ষণ সুষ্ঠুভাবে কাজ করার হিসাবানুযায়ী পদাধিকারের প্রশ্নটা স্থিরীকৃত হচ্ছে, যতক্ষণ টাকা সংগ্রহ-কারীর কায়দা-কেরামতির ভিত্তিতেই টাকার অধিকার সুনির্দিষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ কর্মের কর্তৃবৃন্দকে মাল-সংগ্রহ কিংবা পাওয়ার চেষ্টায় সব ধরনের কথায় লিপ্ত হতে হয়। আমার মনে হয় আজকের বিবাহ-পদ্ধতি তাই প্রেমপ্রধান নয়, নিতান্তই অর্থভিত্তিক।"

"মাত্র অর্থ-ভিত্তিক হলে সে বিয়ে টিঁকবে না। কিছু লোক অবশ্য

বলে যে প্রেমভিত্তিক বিবাহ ধোপে টিঁকবে না।”

“মানুষ স্বীয় চেষ্টায় যে বিয়ে করে সেটা প্রেম না টাকার কারণে তা চিন্তা করতে গিয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় হয়েছি যে সেটা প্রেমভিত্তিক। প্রেমের এই সম্পর্কটা আর্থিক দুরবস্থার দরুন ভেঙে যায়, তাই সেই বাধা দূর করা দরকার। প্রেমের রাজ্যে অর্থ-বৈষম্য একটা মস্ত অন্ত-রায়। কথাটা আমার মনে আসায় এই বৈষম্য দূরীকরণ তথা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা আমার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

বাড়ী ফিরে সেদিন কালিন্দীর মনে আনন্দ হল যে রামরাও তাকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করেছে।

34

কালিন্দী বাড়ী ফিরে চিঠি পড়তে বসল। একটা ছিল সত্যব্রতের —“পুণায় আমাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, সে-অনুসারে বম্বেতে যখন নিজের আলাদা বাড়ীর জন্য তুমি প্রস্তুত থাকবে, তখন থাকার জন্য তোমার কাছে আমি আসব। এখন আমি বৈজনাথ শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছে খাই ও খবরাখবর শুনি। তাঁর প্রদত্ত খবর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী বিপ্লব-অন্তে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কটা এক নয়া আদর্শের ভিত্তিতে সংস্থাপনে উনি প্রয়াসী। তাঁর সব সিদ্ধান্ত আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। তাঁর সংস্কার-চিন্তা কেবল ভারতেই সীমিত নয়। গতকাল থেকে বাড়ী ফিরে তাঁর কথাবার্তা নোট করে রাখা আমি স্থির করেছি। এস্থারবাঈয়ের কাছে একবার গিয়েছিলাম।

সে একটা নাটক লিখছে। আলাদা বাড়ীর ব্যবস্থা হয়ে তোমার সঙ্গে থাকার সুবিধা যদি না হয়, তবে কিছুদিন সরদার-গৃহ বা মাধবাশ্রম হোটেলে উঠব।" এসব কথা সত্যব্রত তাকে লিখেছে। এ-চিঠি আসার পর কালিন্দীর মনে হল যে সত্যব্রত আসছে, তাই আলাদা একটা বাসা নিতে হবে। বিয়েটা হবে স্থির হলে তো ব্যবস্থাটা ঠিক, নয়ত এটা নিরর্থক হবে না ? তাই এমন কিছু করা প্রয়োজন যাতে রামরাও নিজের ভালবাসার কথাটা জানায়। প্রেম ব্যক্ত করাটা আপাতত সে স্থগিত রেখেছে। তাহলে, আমি নতুন বাসা নিচ্ছি, আমার ভাই আসছে – এসব কথা আমি বলতে শুরু করি। একত্রে বাড়ী ভাড়া নেওয়ার প্রস্তাবটা সামনে রেখে দুজনে এক জায়গায় থাকাটা পছন্দ কি-না ইত্যাদি বিষয় যাচাই করে দেখা যেতে পারে। আর এস্থার যেসব পরামর্শ দিচ্ছে, তা-ও কাজে লাগানো যায়। রামরাওয়ের খাওয়া-দাওয়ার বিষয়টা কিছু আলোচনা করি আর চা-প্রাতরাশাদি একসঙ্গে করার কথাটা ওকে বলি। এভাবে তাকে বোঝাই যে আমি যে বাসা নিচ্ছি, সেটা তুমিও নিচ্ছ। খাওয়াটা আমার কাছেই করো। তাতে হোটেলে খাওয়ার বরাতটা পাল্টাবে। এটুকু আভাস দিলে রামরাও তার মনের কথা ব্যক্ত করতে হয়ত ভরসা পাবে। তাহলে আজ আরম্ভ করা যাক। খাওয়া-দাওয়া কিছু বানিয়ে ওকে দিই ইত্যাদি কল্পনা তার মাথায় আসায় পরের দিন সে কিছু খাবার তৈরী করে রাম-রাওয়ের কাছে নিয়ে গেল।

কালিন্দী এসে বাইরে একটা মোটর দাঁড়ানো দেখে বুঝল যে রাম-রাও হয়ত কারুর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত রয়েছে। অনুমানটা ঠিকই। ভেতরে ঢুকে কালিন্দী ওই অফিস থেকে পরনে খাদি, কিন্তু মুখমণ্ডলে জড়োয়া গহনার চমক নিয়ে একটি গুজরাতী তরুণীকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। সে মহিলাও কালিন্দীকে দেখতে পেলেন আর নজরে

পড়তেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে তাকে দেখলেন। নজরটা কালিন্দীর ভাল লাগে নি। আভাসে তার মনে হল যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তিনি দেখছেন। সে মহিলার চোখে কেবল সন্দেহের ভাবই নয়, যেন একটা ঈর্ষাও মেশানো ছিল। এধরনের একটা চিন্তা কালিন্দীর মনে উঁকি দিল। মহিলাটি কে জানার জন্য কালিন্দীর কৌতূহল হচ্ছিল। সেসময় একটা টাকার থলি নিয়ে রামরাওয়ের কারকুন বাইরে এল। কালিন্দীকে দেখে সে মাথাটা নোয়াল আর পার্সটি সেই গুজরাতী তরুণীর হাতে দিল। 'আপনি পার্সটা আনতে ভুলে গিয়েছিলেন' এ কথাটাও সে বলল। 'থ্যাঙ্ক য়ু্য' বলে মহিলাটি ওর হাতে একটি টাকা দিলেন। কারকুনের কাছে জানা গেল যে এ-মহিলা রামরাওকে মাস্টারমশাই বলে সম্বোধন করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে এ-ও বলল যে কোন মেয়ের সঙ্গে মাস্টার বেড়াতে-ঘুরতে যায়, সে কথাও এ মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

অতি সম্প্রতি কালিন্দী জানতে পেরেছিল যে রামরাওই 'অভাগী অথবা ভাগ্যবানে'র লেখক। তাই এ-মেয়ে কে সে-প্রশ্নের জবাবের বিশেষ আবশ্যকতা ছিল না। আর কালিন্দী-প্রসঙ্গেও সে খোঁজ করেছিল, সেটা হয়ত তার তরফে খুবই স্বাভাবিক।

যখন কালিন্দী আর রামরাওয়ের দেখা হল, তখন রামরাও কালিন্দীর একটা মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করল। যে গুজরাতী মেয়েটি এখন এসেছিল তাকে দেখে ওর মনে একটা ঈর্ষার ভাব উঁকি দিয়েছে, এমন একটা কথা রামরাওয়ের মনে হল।

রামরাওয়ের ভালই লাগল যে ঈর্ষা জেগেছে কালিন্দীর মনে। কারণ, রামরাওয়ের ওপর কেবল তারই অধিকার এমন একটা ভাবনারই প্রতিফলন এই ঈর্ষাভাবটা। ঈর্ষার কথাটা সে এখন ব্যক্ত করলে ভালই হয়। কথাটা বললে সে অন্ততঃ তার কৈফিয়ৎটা দেবার সুযোগ

পাবে। এমন একটা চিন্তা রামরাওয়ের মনে এল।

কালিন্দী কথা বলতে শুরু করল। একটু ব্যঙ্গের সুরে সে বলল, "এখন সব বড় বড় মক্কেল আসছে তোমার কাছে। তুমি পাঁচশো টাকার চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেছ। তা সে-ক্ষতি তেমন কিছু নয়। গাড়ীওয়ালা সব বড়লোক আসছে এখন তোমার কাছে। এমন সবাই আসে তো পয়সার অভাব তোমার কখনই হবে না।"

"তোমায় সত্যি কথাই বলছি। যে এসেছিল সে মেয়েটি বড়লোক। এ আমার পুরানো ছাত্রী।"

"তুমি যে-ছাত্রীর গল্প করেছিলে, এ কি সেই?"

"এধরনের প্রশ্ন তুমি কোরো না। কারণ যদি নিজের অনাচার মেনেও নিই, তাহলেও যে-মেয়ের সঙ্গে এ-ব্যবহার করেছি, তার বদনাম হতে দেব না। আর সে-কারণেই তোমার এধরনের প্রশ্ন করাটা ভুল বলে মনে করি।"

"তোমার করুণসুন্দরীটি কে, তা তো আমার জানার ইচ্ছা হয়," কালিন্দী মজা করে বলল।

"তা সে ঔৎসুক্য তোমার দাবিয়ে দেওয়া উচিত।"

কালিন্দী জিজ্ঞাসা করল, "কেন এসেছিলেন এ মহিলা?"

"মিল-ওনার্স ফেডারেশনের চাকুরী তো নিলাম না। এখন এদের ওখানে করতে প্রস্তুত আছি কি-না, সেকথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন।"

"তুমি কি করছ ওদের ওখানে চকুরী?"

"না", রামরাও জবাব দিল।

কথাটা শুনে আনন্দ হল কালিন্দীর।

অতঃপর "তোমার জন্য কিছু এনেছি" বলে পাত্রভরে খাবার যা এনেছিল, সেসব বড় বড় কাগজের বাক্সের ঢাকনা সে খুলল। ভাগে ভাগে সাজানো সব খাবার দেখে রামরাও খুশি হয়ে উঠল।

35

রামরাওয়ের মনে থেকে থেকেই কালিন্দীর কথা উঁকি দিচ্ছিল। তার জাত কী এসব বিষয় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। হয়ত বলা ঠিক হবে যে এর চেয়ে বেশী চিন্তা তার মাথায় আসে নি। সে একটা কথাই ভাবত যে মেয়েটি তার জীবনাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ কি না। সম্মুখে আমার সংগ্রামের কর্মসূচী, নিছক বড়লোক হওয়াই নয়। এত সব বুঝে সে আমায় মেনে নেবে তো? এটা সে বুঝে নিয়েছিল যে তার এরকম জীবনসঙ্গিনীই প্রয়োজন। সে-সঙ্গে দৈবযোগে আমার পূর্ব-ইতিহাসও যে তার কাছে ব্যক্ত করার অবসর মিলেছে, সেটাও ভালই হয়েছে। কালিন্দীর তরফেও বিবাহের ইঙ্গিত আমি পেয়েছি। এ-লোক রোজগার ঠিকমতো করবে না, আমার দেওয়া জিনিস-পত্রের অপেক্ষায় সে থাকবে না, ইত্যাদি কথাও তার মনে এসেছিল। আমার পূর্ব-ইতিহাস জেনেও সে আমায় মন্দ না ভেবে দুর্ভাগাই মনে করেছে, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায় নি। আমার জীবনের সব সত্যি ঘটনা বা বিষয়-বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য সম্পর্কে যতক্ষণ না কালিন্দী সচেতন হচ্ছিল, ততক্ষণ তাকে পরীক্ষা করার সুযোগ মেলে নি বলে সে মনে করল। কিছু না হলেও, আমি একজন উকিল আর আমার বড়লোক হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। আমি যেমন এ কথা ভাবছি, তারও সে-রকম মনে করা উচিত। কিন্তু আবার যেন মনে হল যে আমি বিষয়-বিতৃষ্ণ দেখে সে হয়ত নিরাশও একটু হয়েছে। এমতাবস্থায় আদর্শ-গত কারণে আমি ভোগের সামগ্রীকে পায়ে দলে চলে যেতে পারি, সেটা প্রত্যক্ষ করার কোনও ঘটনা সংঘটিত হলে পরেও সে আমায় গ্রহণ

করবে কি-না বোঝা প্রয়োজন। গুজরাতী তরুণীটি সম্পর্কে ঈর্ষা তার মনে জেগেছে এবং ফলে একটা স্বার্থবোধ যেন জন্মেছে তার মধ্যে, মনে হচ্ছে। আর এ-কারণে প্রেমজ বিবাহ সম্পর্কে একটা আশাবাদ যেন ঘিরে ধরেছে ওকে।

এ-ধরনের চিন্তায় যখন মন তোলপাড়, তখন পরের দিন কালিন্দী এসে উপস্থিত হতেই রামরাও তাকে বলল,

"কালিন্দী, চলো আমরা গ্রন্থি বাঁধি জীবনে।"

"ভেবেচিন্তে বলছ তো কথাটা ?"

"পুরোপুরি বিবেচনা করেই বলছি।"

"তা হলে আমায় বলতে হয় আমায় এই করুণা করার জন্য আমি ঋণী হলাম তোমার কাছে। কিন্তু আমার কোনও লাভ হবে না।"

"তাহলে কি আমার প্রেমের কোনও মূল্য নেই ? সে কথা তো আরও কঠোর— মর্মভেদী। তোমার প্রেমের পাত্র যদি অন্য কোনও যুবক হয় আর এজন্য যদি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করো, তাতে আমার কোনও অপমান নেই। কিন্তু তেমন কারুর সঙ্গে অগ্রসর না হয়ে থাকলে, মনের অমিল সত্ত্বেও তোমার তুলনায় আমি হীন, তাই কি তোমার বক্তব্য ?"

"রামরাও, আমি তোমায় মানা করছি। আমার সত্যিকারের কাহিনী সব যখন জানবে, তখন তুমিই আমায় ফিরিয়ে দেবে, সেটাই সত্যি ব্যাপার। তোমার কথাটা তাই কেমন করে মানি আমি ?"

"এমন কী দোষের কাজ তুমি করেছ ?"

"তোমায় কথাটা বলব কি বলব না সে-প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। তবে যখন তুমি সরল মনে আমায় পত্নীর সম্মান দিতে চেয়েছ, তখন আমিও তোমায় বলি সব কিছু খোলাখুলি। নিজের কথা তোমায় সব বলায় আমার কোনও রকম বাধা নেই। আমার অন্ততঃ সেরকমই

মনে হচ্ছে।”

“বলো। মন খুলেই সব বলো,” রামরাও বলল।

“প্রথমত তুমি মনে করছ আমি ব্রাহ্মণ। আমি তা নই।”

“জাতের কথা আবার কবে তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম? পুরানো সব সমাজ-শ্রেণী-বন্ধন আমি বিসর্জন দিয়েছি।”

“এ ছাড়াও, আরেকটা কথা রয়েছে।”

“সেটা কি?”

“সব বলতে ঠিক যেন আবার সাহস হচ্ছে না। তবুও বলি।”

“নিশ্চয় বলবে। তবে মনের সব সংশয় দূর করে দাও। মন খুলে সব বলো।”

“সব বললে তোমার প্রেমের পাত্রী আর থাকব না। একবার আমি ঘা খেয়েছি।”

“ব্যস্, এটুকুই তো কথা? এর কোনও গুরুত্ব আমি দিই না। তুমি একদম সব ভুলে যাও। ব্যস্। আমার ভালবাসা ওসব একেবারেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু এসব নিয়ে আর কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বোলো না। আমিই বা কী এমন শুদ্ধ-সাত্ত্বিক? আমি কি বলি নি আমার গল্প?”

“কিন্তু পুরুষেরা মনে করে নিজেরা যা-ই হই-না-কেন আমাদের স্ত্রীরা হবে নিষ্কলঙ্ক,খাঁটি, ঠিক যেন পরিশুদ্ধ রত্ন···”

“অনেকেই এরকম মনে করে। কিন্তু বহুজনেই আবার এ-ধরনের কিছুর আবশ্যকতা আছে বলে মনে করে না। আমি কি কোনও বিধবাকে বিয়ে করতে পারি না?”

“কিন্তু আমি তো ঘটে-যাওয়া ব্যাপারটা ভুলতে পারি না।”

“কেন?”

“আমার একটি ছেলে রয়েছে।”

"আর সে আছে কোথায় ?"

"পুণায় আমার এক বান্ধবীর কাছে ওকে রেখেছি। আমি দু-এক সপ্তাহ বাদে বাদে পুণা যাই।"

"আর তোমার ছেলের বাপ ?"

"সে কখনও তার খবর করে না। আমি তাকে ছেড়েছি বা আমায় সে ছেড়েছে, তা-ও আজ আট মাস পার হয়ে গেল। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।"

"তুমি কি তোমার ছেলের বাবাকে ভালবাসো ?"

'এখন তো একেবারে কোনও ভালবাসাই তার ওপর আমার আর নেই। তার দর্শনও যেন আমি আর না পাই, সেরকম মনে হয়। আমার এই বাচ্চার বাপের সঙ্গে আর কোনও রকম সম্পর্ক রাখার দরকার নেই।"

"রাখবে না ঠিক, তবুও একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে। লোকটি যে তোমার ছেলের বাপ, এ কথা একেবারেই মনে ঠাঁই দেবে না। তবুও কিছু-না-কিছু গুরুত্ব তোমায় এবিষয়ে আরোপ করতে হবে।"

"এরকম কথা যে বলছ, তোমার কি কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে এ ধরনের ব্যাপারে ?"

"না, আবার হ্যাঁ-ও বটে।"

"তবে বাচ্চাটা অসুস্থ হলে ওর বাবা দেখা করতে এলে তোমার মনোভাবটা কি দাঁড়াবে, সেটা কি মনে হয় তোমার ?"

"কি রকম দাঁড়াবে ? বলতে পারব না। তবে একটা গল্প পড়েছিলাম। হয়ত বা সেরকম কিছু। হ্যাঁ, মনে এসেছে সেটা। বিখ্যাত ফরাসী লেখক জোলার একটা উপন্যাস আছে 'আসামবার'। এর ইংরাজী অনুবাদ হয়েছে 'ড্রামশপ' নামে। এতে আছে এক লণ্ড্রীতে কর্মরতা একটি মেয়ে ভবঘুরে অজ্ঞাত-পরিচয় জনৈক যুবকের প্রতি

আসক্ত হয়। শিক্ষায় আর পোষাকে যুবকটিকে মধ্যবিত্ত বলে মনে হত।

"আসক্ত রজক-কন্যাটি ছেলেটির সঙ্গে বসবাস করতে লাগল। খাওয়া-পরাও ওর সঙ্গেই করত। পরে একটি সন্তান হল তার। প্রেমিকবর আবার অন্য একটি মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে আসে। রজক-কন্যাটিও পুনর্বার একটি ছুতোরকে বিয়ে করে। যখন এ-মেয়েটির প্রথম প্রেমিকের সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন ছুতোরটি সেই যুবককে আসতে দিতে রাজী হল। কিছুদিন পরে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম প্রেমিকের আবার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল।"

"ভগবান দেন ঠিকই তবে কর্ম তাকে তার পথে টেনে নিয়ে যায়—এধরনের কথার এটি উত্তম উদাহরণ। মেয়েটিকে ভগবান নতুন পতি তথা নতুন জীবনধারা অনুসরণের সুযোগ একটা দিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্বজন্মের পাপ এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল, যেন বলল তোর পূর্বজন্মের পাপের ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। এখন তুই আর পুণ্যের পথে যাচ্ছিস কেন? গেলেও জোর করে এদিকেই তোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। একেই কর্মফল বলা উচিত," রামরাও বলল।

"তোমার এই কথায় আমার দুঃখ আর আনন্দ দুই-ই হচ্ছে। আমি নীতি-পথে চলি নি, তার জন্য আমায় তুমি অস্বীকার করছ না। কিন্তু আমার প্রথম প্রেমিক জীবিত আর তার বাচ্চাও রয়েছে আমার কাছে, তাই তুমি আমায় চাইছ না। এর মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে বাচ্চা না থাকলে আমি তোমার প্রেমের পাত্রী হতে পারতাম," ব্যঙ্গ সহকারে কালিন্দী বলল।

কঠোরভাবে রামরাও বলল, "সে-বাচ্চার বাপ যদি মরে যেত, তাহলে শুধু প্রেমের নয়, বিবাহের পাত্রী তুমি হতে।"

ব্যথিত হৃদয়ে কালিন্দী বলল, "তোমার মতো উদারমনার পক্ষে

অবিবাহিত মাতৃত্ব মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য হবে।"

সেদিন বাড়ী ফিরে কালিন্দী তার ইহুদী সখীর সঙ্গে কথা না বলে সোজা নিজের কামরায় চলে গেল। তার মনে এ-চিন্তাটা এল যে আমি অনাচার যা-ই করি-না কেন সংসারে, আমার সন্তানের অস্তিত্বের কোথাও কোনও স্বীকৃতি নেই। তার মনে হল সংসারটা কি ? এ-সংসার বলতে আমি কেবল রামরাওকেই বুঝেছি, কিন্তু সে-ছাড়াও তো বিশাল দুনিয়া একটা রয়েছে। রামরাওকে ঘিরে আমার কি চিন্তা আর তার মনেই বা আমার স্থান কতটুকু ইত্যাদি কথা স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। আমার যা মূল-চিন্তা সেটা প্রেম-সম্পর্কিত, এটা বুঝে সে স্থিরনিশ্চয় হল যে যে-কোনও প্রকারেই হোক রামরাওকে সে পাবেই।

36

বম্বে থেকে পুণা যাবার গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় একজন যুবক বসে ছিল। সে কারুর সঙ্গে কথা বলছিল না আর চাইছিলও না যে কেউ তার সঙ্গে কথা বলুক।

ভয়খলা স্টেশনে গাড়ীটা থামার পর প্রবেশোন্মুখ যাত্রীদের মধ্যে কিষাণের দল একে চিনতে পেরে বলল, "তাহলে বলুন আপ্পা শেঠ, সব পয়সা আজ বাজীতে খুইয়েছেন। তাই তৃতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছেন। আপনার মতো লোক, হয়ত হাজার টাকা আজই উড়িয়ে দিল। আর সেটা তো আপনার হাতের ময়লা।"

বিকটভাবে হেসে উঠল আপ্পা শেঠ, কিন্তু কোনও জবাব দিল না।

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, "বম্বে এসে ঘুরে গেলেন। তা

আপনার কালিন্দীর সঙ্গে দেখা করলেন কি ? তার এখন আর অবশ্য আপনার টাকার প্রয়োজন নেই। সে একটা চাকুরী পেয়ে গেছে।"

আপ্পা শেঠ আবার হাসল।

লোকটি বকবক করেই চলেছিল, "পয়সার যখন তার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন সে রক্ষিতা হিসাবে ছিল। এখন সে স্বাধীন, কিন্তু কখনও কি সে আপনার কথা মনে করে ?"

আবার হেসে উঠল আপ্পা শেঠ।

'বিয়ে-করা বউ আর রক্ষিতার মধ্যে পার্থক্য একটা থাকেই। যতই সে বলুক-না কেন যে সে তোমার আপন, তবুও টাকার জন্যই তো তার যত ভালবাসা।"

আপ্পা শেঠ আবার হেসে উঠল।

"এ-অভিজ্ঞতাটুকু আপনার এখন হচ্ছে। আমার তো বহু-আগেই হয়েছে। আপনাকে দোষ দিচ্ছি না আমি। ফুর্তি তো যৌবনের দিনেই। আমি যখন যুবক ছিলাম তখন ফুর্তি-ফার্তা যথেষ্ট করেছি। এখন অবশ্য খুব সেয়ানার মতো কথাবার্তা বলছি। যখন বুড়ো হবেন, তখন আপনিও এমন ভাবেই কথা বলবেন।"

আবারও হেসেই জবাব দিল আপ্পা শেঠ। বক্তা লোকটির অনর্গল কথা চলেছে আর আপ্পা শেঠও মুচকি হাসির বেশী জবাব কিছু দিচ্ছে না— এটি কিন্তু তার খেয়াল হয় নি। কারণ নিজে কথা বলা এবং অন্যকে বলতে না দেওয়াটাই তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার মনে হল আপ্পা শেঠ হয়ত বা ভাবছে যে একসময় আমার ওখানে চাকুরী করেছে, আজ সে সমানে কথা চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে তাকে সেভাবে বলতে দেওয়া যাক। এই ভেবে লজ্জিত বোধ করে সে অন্য বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

স্টেশন এল একটা। আবার চলতে শুরু করল গাড়ী। নতুন

যাত্রী কেউ উঠল না। আবার সেই লোকটি আপ্পা শেঠের কাছে এসে কথা শুরু করল।

"আমি কিভাবে এখানে এলাম, তা ভেবে বোধহয় আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন। আমি তো হাতের সবটা একসঙ্গে খরচ করি না। আজ চারশো টাকা রোজগার করলাম। যে-বাংলোটা ছেড়ে এলেন আপনি, সেখানে যে-মারোয়াড়ীটি ছিল তাকে উঠিয়ে দিই নি আমি। সে প্রতি মাসে আমায় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া দেয়।"

হাসল আপ্পা শেঠ, কিন্তু কোনও জবাব দিল না।

"সাট্টা-জুয়ায় পয়সা আমি কামিয়েছি। তবে খরচা কম করি, তাই টাকাটা আছে এখনও আমার কাছে।"

আবার আপ্পা শেঠ হাসল। কোনও কথা বলল না, তাই যাত্রীটি তার মুখ ফিরিয়ে নিল।

দাদর স্টেশনে গাড়ী পৌঁছানোর পর সেই বাক্যবাগীশ যাত্রীটি দেখতে পেল যে আপ্পা শেঠ বেঞ্চির নীচে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। ভাল করে দেখে বোঝা গেল যে সে বেহুঁশ অবস্থায় রয়েছে। স্টেশনে অন্যান্য যাত্রীরা লোকটি অসুস্থ মনে করে গার্ডকে খবর দিল এবং বাইরে বের করে নিয়ে এল তাকে। পুলিশ এসে সব মালপত্রের জিম্মা নিয়ে নিল। খোঁজখবর করে জানা গেল লে লোকটি পুণার ব্যবয়ায়ী শিবশরণ আপ্পা শেঠ। আজই সাট্টায় তার পনেরো হাজার টাকা খোয়া গেছে। এক-জন যাত্রী বলল, "আমি চিনি একে। তবে বম্বেতে কেউ এর আছে কি-না জানি না। এর একজন রক্ষিতা আছে কালিন্দী। লেবার অফিসে কাজ করে, তাকে খবর দেওয়া যায়।"

লোকটি আরও বলল, "এর স্ত্রীর নাম তায়ম্মা আর মা রখমাই পুণায় আছে। না···না··· মা তো সম্প্রতি মারা গেছে। তায়ম্মা ব্যাঙ্গালোরের এক বড় ব্যবসায়ীর মেয়ে।" লোকটি জানাল যে তার

নিজের নাম মল্লিকার্জুন মডকী।

পুলিশ আপ্পা শেঠকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার ডাকা হল। মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছিল. তবে আফিমের গন্ধটাও চাপা ছিল না। পেটে পাম্প লাগানো হল আর অবস্থাটা কাটানোর জন্য কিছু ওষুধ দিল তারা। ভোর চারটা নাগাদ যখন জ্ঞান এল শিবশরণের সে 'কালিন্দী-কালিন্দী' বলে ডাকল। হঠাৎ তার নজর এল যে বেশবাসের পরিবর্তন হয়েছে তখন সে কাগজ-কাগজ করে চেঁচিয়ে উঠতেই সিস্টার তার ছাড়া জামার পকেট থেকে কাগজ একটা এনে দিল।

চেতনাটা ক্রমে যেন ফিরে আসছিল কিন্তু আবার তার শক্তি ক্ষীণ হয়ে দুর্বলতাটা বাড়তে শুরু করল।

37

শিবশরণ আপ্পাকে যে রাত্রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তার পরের দিন সকালে কালিন্দী রামরাওয়ের অফিসে আসে। আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছিল রামরাও তবুও সে হেসে কালিন্দীকে স্বাগত জানাল। কালিন্দীর সন্দেহ জাগল এটা কি নিছক স্মিত হাস্য না আনুষ্ঠানিক-উপচারিক ব্যাপার বা একান্তই ফর্মালিটি। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না যে তাকে দেখে রামরাওয়ের আনন্দ হয়েছে না শঙ্কা জাগছে মনে। মনে হচ্ছে যেন রামরাও তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে। 'যে মেয়ের সঙ্গে পরিচয়টা অন্তে প্রেমে রূপান্তরিত হয়, সেরকম প্রেম-ভাবনার কখনো বৃদ্ধি কখনো ক্ষয় ভাল কথা নয়, অন্ততঃ বাঞ্ছনীয় নয়। সেরকম পরিচয়-প্রসঙ্গ বাড়িয়ে লাভ কি ?' হয়ত বা এমন একটা চিন্তা রামরাওয়ের মনে দেখা দিয়েছে আর তাই আমার আসায় তার শঙ্কা-

বোধ হচ্ছে। কথাটা ভুল, কিন্তু এরকম কিছু হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। বহু ভাবনাই তার মনে উদয় হয়েছিল, তবে বিশেষভাবে এ-ভাবনাটাই জেগেছিল মনে।

'মেনে নেবার মতো উপযুক্ত পরিস্থিতি না হওয়ায় যে পুরুষ আমায় প্রত্যাখ্যান করে, তার সঙ্গে অগ্রসর হওয়াটা মান-অপমান বোধ-সম্পন্না যে-কোনও মেয়ের পক্ষে অপমানজনক ব্যাপার।' এ-চিন্তাটা আর সে বাড়তে দিল না। সে ভাবল, 'মান-অপমানের কথা কল্পনা করে এবং সে হিসাবে গণ্ডগোল করে কোনও পুরুষকে কামনা করাটা ভুল নয়, তবে দয়া-ভিক্ষা না, বরং সে-পুরুষের সঙ্গে তর্ক করে পত্নীত্ব-প্রাপ্তিতে সচেষ্ট হওয়ায় কোনও আপত্তির কারণ নেই। অন্ততঃ এ-পুরুষটি সে-ধরনেরই।'

কালিন্দীর মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে মানা করলেও, রামরাওকে পেতেই হবে। তার এমনও মনে হয়েছিল বিবাহজ-দায়দায়িত্বে যদি রামরাও অসম্মত হয়, তবে সে স্বাধীনতাটুকুও তাকে দেওয়া হবে। আইনসিদ্ধ বিবাহের সন্তান-সন্ততিও এরকম ক্ষেত্রে মিশ্র জাতির পরিচয় থেকে রেহাই পাবে না। তার ধারণানুযায়ী নিয়মের বিয়েও পয়সার জন্যই। তাই যদি রামরাও বিয়েতে আপত্তিও করে, এবাড়ীতে থাকার কথায় হয়ত আপত্তি জানাবে না। বিয়ে না করে যদি রামরাওয়ের সঙ্গে আমি থাকি, তাহলে আগে যা করেছি, তার চেয়েও খারাপ কিছু সেটা হবে না। এমতাবস্থায় কোনও রকম দায়িত্বই যখন রামরাওয়ের ঘাড়ে চাপাচ্ছি না, তখন আর জিজ্ঞাসাই বা করি কেন, কী আমার সঙ্গে থাকতে চাও? জীবনের গোড়া থেকেই যখন বিবাহ-বন্ধন-সম্মত পুরুষের সঙ্গে একত্রে থাকার সুযোগ আমার মেলে নি, ভবিষ্যতেও হয়ত বা সে-সম্ভাবনা নেই, তাহলে কেন আমি রামরাওকে আমার প্রেমিক হিসাবে মেনে নেব না। আমার তরফে এতে কোনই আপত্তি নেই।

তবে রামরাও কি এটাকে অপবিত্র সম্পর্ক বলে মনে করবে? তা, বোধহয় সে এরকম মনে করবে না. কারণ সে সাম্যবাদী আর সনাতন ধারার চিন্তা তার কাছে অর্থহীন। হয়ত বা তার অভিধানে অপবিত্র বলে কোনও শব্দই নেই।

রামরাও একজন আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলছিল। তবুও কালিন্দীর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না ভেবে সে বলল, "কালিন্দী বাঈ, আজ কি তোমার মনে কোনও গণ্ডগোল পাকানোর মতলব রয়েছে? আমার সেরকমই মনে হচ্ছে।" কালিন্দী জবাব দিল, "হাবভাবটা যদি সেরকম হয়ে থাকে, তবে তা নিতান্তই মনের নানা চিন্তা-ভাবনার দরুনই হয়েছে।"

"তাহলে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ বাদে কথা বলছি।"

"আচ্ছা বেশ।"

রামরাও তখন সেই আগত লোকটিকে বলল, "এসব লোকের মাতৃভক্তি যে কতখানি সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। এ-ব্যাপারে আমি একটা বাজী রেখেছি।"

"সেটা কি?"

"মাতৃত্বের যথার্থ মাহাত্ম্য যাতে সমাজ আরোপ করে, সেই উদ্দেশ্যে পুত্রের জন্য সবচেয়ে বড় স্বার্থত্যাগ যে মা করে, তার সম্মান আর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা প্রয়োজন। অবিবাহিত মাকে নিজ সন্তানের জন্য যতখানি স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, সেটা অন্য মায়েদের চেয়ে অনেকখানি বেশী। তাই যাদের অবিবাহিত অবস্থায় মাতৃত্ব মেনে নিতে হয়েছে, তাদের প্রতি যৌথ-সম্মানের ব্যবস্থা যদি করা হয়, তবে এসব লোকের আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে।"

মাতৃ-দিবস উদ্‌যাপনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য লোকটি এসেছিল। সে রামরাওয়ের মতটা শুনে ঘাবড়ে চলে গেল। এর পর কালিন্দীর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হল। সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি

অবিবাহিত মাকে এতখানি সমর্থন করছ। তা হলে কি আমার সম্পর্কে তোমার চিন্তাটা বদলেছে ? আমায় তোমার যতখানি মন্দ মনে হয়েছিল আগে, এখন বোধ হয় ততটা মনে হচ্ছে না ?"

"কালিন্দী, সত্যি করে বলি, তুমি মন্দ এমন আমার কখনই মনে হয়নি। বিয়ের প্রস্তাবে আমি যে মানা করেছি, তা তুমি মন্দ এ-ই ভেবে নয়। তার কারণ এই যে, যে পরিবার আমি শুরু করব, তাতে বিপত্তির সৃষ্টি না হয়।"

"তবে মানা করো নি ?"

"আবার আমার মত বদলে গেছে। তোমার মতো মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করার কথাই ওঠে না। আমি আমার মনের শঙ্কাটা তোমায় জানিয়েছি। অনিষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আমি এসব থেকে দূরে থাকতে চাই। তুমিও তাই। এই অনিষ্টকর পরিণাম থেকে রক্ষা পেয়ে স্ব-পরিবার-পরিজন বজায় রাখার আত্মবিশ্বাস তোমার থাকলে, আমি আজই আমাদের এই বিয়ের জন্য প্রস্তুত আছি।"

কথাটা শুনে খুবই আনন্দ হল কালিন্দীর। সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেমন করে ভাবলে কথাটা ?"

"অবিবাহিত মায়েদের ভবিষ্যৎ কী এসম্পর্কে গতকাল আমি চিন্তা করছিলাম। তখন আমার মনে হল যে এদের যে এত গঞ্জনা দেওয়া হয়, তার পেছনেও আর্থিক কারণ বর্তমান। যারা নির্ধন, লোকে তাদের ক্ষতি করে, এটাই সংসারের নিয়ম। আমরা যারা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী, তাদের এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে," কথাটা বলে রামরাও জানলাটার ওপাশে গেল।

এই সময় কয়েকজন লোককে একটা মোটর থেকে নেমে তার দিকে আসতে দেখা গেল। সাদা পোষাকে পুলিশও তাদের মধ্যে ছিল। তার মনে হল নতুন কোনও বিপদ ঘটেছে। লোকেদের দৃষ্টি

পড়ল রামরাওয়ের প্রতি। তারা মাথা হেলাল। রামরাও প্রত্য-ভিবাদন জানাল। তারা জিজ্ঞাসা করল, "মিস্ কালিন্দীবাঈ ডগ্‌গে কি আপনার কাছে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ", বেচারী কালিন্দীর আবার কী বিপদ হল এ-চিন্তাটা মাথায় এল। সে বলল, "কালিন্দী, তোমার কাছে পুলিশ এসেছে।"

কিঞ্চিৎ-বিচলিত ভাব সত্ত্বেও কালিন্দী বলল, "না, চিন্তার কিছু নেই। আমি একজন বিচক্ষণ উকিলের দফতরেই রয়েছি।"

রামরাও তার হাতটা ধরে বলল, "শুধু তা-ই নয়, তুমি তোমার ভাবী স্বামীর ঘরেই আছ।" এসময় পর্দার ওধার থেকে মুন্সী বলে উঠল "কালিন্দীবাঈয়ের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছেন।"

"তাদের ভেতরে আসতে দাও।"

"ব্যাপারটা কি ?" রামরাও বলল।

"শিবশরণ আপ্পা নামে পুণার এক ভদ্রলোক অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পাশেই কিং এডওয়ার্ড হাসপাতালে রয়েছেন। তিনি কালিন্দীবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"আমার যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই।"

"আপনি খুব তাড়াতাড়ি চলুন, কারণ এ বাঁচবে বলে মনে হয় না। আর যতক্ষণে গিয়ে পৌঁছবেন, ততক্ষণ জীবন থাকবে কি-না, তাতেও সন্দেহ আছে।"

কালিন্দীর চোখ জলে ভরে এল। সে বলল, "আসছি আমি।"

"শিবশরণ আপ্পা কে ?" রামরাও জিজ্ঞাসা করল।

"এ-ই আমার ছেলের বাবা," চাপা কান্নার স্বরে কালিন্দী বলল।

"খুবই তাড়াতাড়ি যাও। দরকার হলে আমিও সঙ্গে আসি। বাইরে অপেক্ষা করব" বলল রামরাও। কালিন্দী বলল, "তুমিও চলো।" দুজনে গাড়ীতে করে রওনা হয়ে গেল।

১৪

কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালে চলে এল কালিন্দী। তাকে শিবশরণের শয্যায় পাশে নিয়ে যাওয়া হল। শিবশরণ তাকে দেখে স্মিতহাস্য করল আর তার হাতে একটা খাম দিল। এর পরেই 'কালিন্দী' বলে একটা চীৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল কালিন্দী। সব রাগ-দুঃখ-ক্রোধ তার ভেসে গেল। নিজেকে দোষী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা এ সময়টায় যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। শিবশরণের মৃত্যু-কালে তাকে এভাবে ডাকা হল, একথাটা তার কাছে অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক মনে হচ্ছিল।

শিবশরণের দেওয়া খামটায় তারই নাম লেখা ছিল তার দান-পত্র তথা উইল। এটা পড়ে খুবই শোকাভিভূত হয়ে পড়ল কালিন্দী। নিম্নোক্ত প্রকারের ছিল সেটি :

"শ্রীশঙ্কর সহায়

"আজ আমি আমার জীবন বিসর্জন দিতে চলেছি। সাট্টা-জুয়ায় যদি আমি সফলকাম হই, তবেই জীবন রাখব আর না হলে এ-পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। যার হাতে এ-চিঠি পৌঁছুবে, তিনি যেন এটাকে আমার দান-পত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সুরক্ষিত অবস্থায় এটি মিস্ কালিন্দী ডগ্‌গে, লেবার অফিসার সকাশে পৌঁছে দেন আর সরকার এটিকে যেন উইলের মর্যাদা দান করেন।

"সংসারের কিছু লোক আমার প্রতি দোষারোপ করছে এবং ধরে নিয়েছে যে দুর্নীতি আর অনাচারের প্রতীক আমি। এই ভুল ধারণা নিবারণের জন্য গোড়ায় আমি আমার জীবন সম্পর্কে কয়েকটা কথা স্পষ্ট করে বলে নিচ্ছি। আমার বিয়েটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত জীবনটা আমার বিগড়ে দেবার কারসাজি করেই আমার আত্মীয়বর্গ আর গোমস্তা এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। এই বিয়ে স্থির করার জন্য আমাদের মুন্সী মল্লিকার্জুন মডকী টাকা খেয়েছিল। কথাটা আমি মাত্র কিছুদিন আগে জানতে পারি। আমার পত্নী তায়ম্মা যে নারীত্ব প্রাপ্ত হয় নি, সেকথা সে নিজে আর আমার জ্যেষ্ঠতাতের জানা ছিল। সেজন্যই এরা একে পত্নী নির্বাচন করেছিল। সত্যি ব্যাপার এই যে বিয়ের সময় তার বয়স ছিল সতেরো, কিন্তু তখন তার রজঃস্রাব শুরু হয়নি। কথাটা চাপা দেবার জন্য বলা হয়েছিল যে তার বয়স তেরো বছর। এই দুরভিসন্ধিটা মার দৃষ্টিতেও ধরা পড়েনি। সংক্ষেপে আইনের চোখে তায়ম্মা আমার পত্নী হলেও সত্যিকারের স্ত্রী সে ছিল না। পুরোপুরিভাবে না-ই যদি হল, তবে সে আর আমার স্ত্রী হয় কীভাবে? এরকম মেয়েকে বাবা-মা বিয়ে দেয়-ই বা কেমন করে তা জানা নেই। বিদর্ভের এক প্রসিদ্ধ আইনজীবীর এরকম একটা অবস্থা হয়েছিল। সেকারণে শেষ অবধি দুই বিবাহের কলঙ্ক বর্তেছিল তার ওপর।

"কালিন্দীর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে তাকে আমি একদমই উপেক্ষা করেছি, তবে তা ভুল। তার বিষয়ে আমার খেয়াল ছিল। আমার মনে হয়েছিল যে আমায় ছেড়ে যদি সে চলে যায়, তবে তাতে তারই মঙ্গল। পরবর্তী দায়-দায়িত্বের হাত থেকে নিছক নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই এজাতীয় চিন্তা আমার মনে আসে নি। আমার তখন ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হচ্ছিল আর কেবল মনে হচ্ছিল যেন এ-ও সেই অন্ধকার ভবিষ্যতের জটিলতায় জড়িয়ে না পড়ে। আর আমার এ-ও

মনে হচ্ছিল যে আমার মতো অশিক্ষিত আর দুর্ভাগা লোকের পাল্লায় এ পড়েছে আর প্রতারিত হয়েছে। ওকে সিনেমায় নামার ইঙ্গিতটা আমি আন্তরিকভাবেই দিয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে তার জীবনটা নষ্ট হতে চলেছে, তার সংশোধন আমি করতে চেয়েছিলাম। আর ঐ বাঁধন কাটায় একটাই উপায় ছিল, দেখানো যে আমি তার তোয়াক্কা করি না।

'কালিন্দী যখন আমার আশ্রয়ে ছিল, তখনই বিষয়-সম্পত্তির জন্য অনেকবারই মনে আত্মহত্যার চিন্তা এসেছিল। তখনই যদি তা করতাম, তা হলে এর অভিসম্পাতটা লোকে ওকেই দিত, সন্দেহ নেই। এইসব কারণেই মনে হত যে কালিন্দী আমার কাছ থেকে দূরেই থাকুক।

'এ-পত্র যদি কালিন্দীর হাতে পড়ে, তবে তাকে এটুকুই বলব যে এমন একটা দিনও যায় নি যে তার স্মৃতি আমার মনে ভেসে ওঠে নি। অনুক্ষণ এই ভাবনাই আমার হত যে তার জীবনটা আমিই নষ্ট করে দিলাম। বম্বেতে তার চাকুরী হয়েছে শুনে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। অন্য এক যুবকের প্রতি তার ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে এটাও আমি জানতাম। অধিক কি, আমি উভয়কে একত্র দেখেওছি। যাতে ওদের নজরে আমি না পড়ি, তার প্রতিও খেয়াল ছিল। আমায় ওরা দেখেনি, এরকমই আমার মনে হচ্ছে।

"আমি চিন্তামণিকে মোটেই ভুলে যাই নি। আমি ওকে বৈধ সন্তান বলে মানি বা না-ই মানি, ও আমারই ছেলে আর উত্তরাধিকারী। আমার আর যা, তা-ও ওকে দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করেছি। যে-সাট্টা খেলতে আমি যাচ্ছি, তাতে সর্বস্ব খোয়া গেলেও, যাতে চিন্তামণির ক্ষতি না হয়, সেজন্য মার কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই হুবলীর বাড়ীটা চিন্তামণির নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আর মায়ের যে চার হাজার টাকা গোবিন্দের দিদিমার দোকানে বারো আনা সুদে লগ্নী করা আছে, তা-ও

চিন্তামণির নামে রেখে দেওয়া হয়েছে। কথাটা আমার আমৃত্যু যাতে গোপন থাকে, সে-ব্যবস্থাও করেছি। তবে কালিন্দীকে এই বাড়ী আর চার হাজার টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

"যদি দ্বিতীয়বার কালিন্দীর বিবাহ করতে হয় (আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল বলেই মনে করি), তবে যেন সে করে। চিন্তামণির বাবতে খরচা-খরচ তার দ্বিতীয় স্বামীর ওপর বর্তানোর কোন কারণ নেই।

"চিনবসপ্পা শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে স্ত্রীধন হিসাবে তায়ম্মা দশ হাজার টাকা পেয়েছে। তার নামেই এই টাকাটা ধরেছি আমি। যদি তায়ম্মা আমার ওপর বিরূপও হয়ে থাকে, তবুও আমি কিন্তু কখনও দুর্ব্যবহার তার সঙ্গে করি নি। তায়ম্মার এখনও ঋতুস্রাব হয় নি। এখনও সে কুমারী। তায়ম্মা সম্পর্কে এই সত্যটা যারা জানে না, তাদের ধারণা যে আমার দুর্ভাগ্যের কারণ কালিন্দী। আর উপর উপর যারা দেখে, তাদের এইরকমই মনে হয়। কিন্তু এটা সত্যি ব্যাপার নয়। আমার বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমার দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমায় বিয়ে করানো হয়েছিল। আমার জীবনটা নষ্ট করার জন্য যে-সব মতলব আঁটা হয়েছিল, বিয়েটা দিয়ে সে সব পাকা করা হয়েছিল। এই বিয়ের কারণেই আমার জীবনের রস সব নষ্ট হয়ে গেল। তায়ম্মা আমার স্ত্রী এ-কথা সত্যি সত্যি বলা চলে না। এমনিতে স্ত্রী বললেও, পত্নীর মতো আচরণ তার সঙ্গে সম্ভব ছিল না। তার শারীরিক অবস্থাটা যখন এ-ধরনের, তখন তার বাবা বিয়ে দিলেনই বা কেন? লজ্জাহেতু আমি কাউকে বলতেও পারি নি যে এ-মেয়ের ছেলেপিলে হবে না। যখন বিষয়টা মার নজরে এল, তখন তিনি আমায় দ্বিতীয়বার বিবাহের পরামর্শ দিলেন। তাই শুধু নয়, গরজও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ বিষয়ে কিছুই আমি স্থির

করি নি। ঠিক করেছিলাম যে ঋতুস্রাবের জন্য বছর দুয়েক অপেক্ষা করি। এই দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাবটা বরবাদের জন্য স্বার্থপর কিছু লোক সুবিধা গ্রহণে তৎপর হল। তায়ম্মার সন্তান হচ্ছে না, তার কারণ আমারই তরফে কিছুর অভাব বা দোষ, এ-ধরনের একটা কথা আমার স্বজাতিভুক্ত কিছু লোকই রাষ্ট্র করে দিল। এই কারণে আমার পুনর্বিবাহেও কিছুটা বাধা পড়ল। আমার স্পষ্ট ধারণা নেই কে বা কারা এই অপবাদটা রটিয়েছিল। পরে খোঁজখবরের পর এটুকু জানা গেল যে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমার শেঠের ছেলেপিলে হচ্ছে না কেন?" তখন মল্লিকার্জুন রসিয়ে জবাব দিয়েছিল, "কুয়োতেই নেই, তা খালে আসবে কোত্থেকে?" আমার কানে হঠাৎ কথাটা এসে গেল। অন্যলোকে যেভাবেই এর অর্থ করুক, অন্যভাবে আমি অর্থটা বুঝতে চাইলাম। লোকে এই আলংকারিক ভাষার অর্থ করল যে শিবশরণাপ্পা পুরুষই নয়। যখন লোকেরা এ-ধরনের গল্প ফেঁদে বসল, তখন মনে হল একটি রক্ষিতা রাখি। তার বাচ্চা হলে বিরুদ্ধবাদীরা যে মিথ্যার সৃষ্টি করেছে, সেটা দূর হয়ে যাবে। স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় আমার জাতির অন্যেরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মেয়ে দিতে ইতস্তত করছে। এই অবস্থায় বিয়ে না করে কোনও মেয়ের সঙ্গে এরকম সম্বন্ধ স্থাপনা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথই বা কী ছিল?

"রক্ষিতার প্রয়োজনে আমি কালিন্দীর দিকে ভিড়েছিলাম, তা ঠিক নয়। আমি আদৌ কোনও মতলব নিয়ে কালিন্দীকে ফাঁসাতে চাই নি। একসঙ্গে চলাফেরার দরুন আমি কালিন্দীকে ভালোবাসতে শুরু করলাম। পরিণতিতে তাকে গৃহত্যাগ করতে হল। পরোক্ষভাবে কালিন্দীকে তায়ম্মার কথা যা বলেছিলাম, তা থেকে সে সব ঠিক বুঝেছিল কি-না, আমি জানি না।

"কেমন করে মরতে হয়, তা খুব কম লোকই জানে। বড়লোকের

মুন্সী-কর্মচারীরাই তাদের ডোবায় আর জমি-জায়গা কব্জা করার জন্য এদের সব ছেলেদের পাগল কিংবা নাবালক বলে। ছোটদের জীবন বিগড়ে দেবার যে-সব নানা ফন্দি ফিকির এরা করে, তার মধ্যে গণ্ড-গোলে মেয়েদের সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্তটা অন্যতম। আমার বেলায়ও তাই হয়েছিল। আমার বাবা কাজে যতটা কুশলী ছিলেন, ঘর-সংসারের বিষয়ে তত সরগর ছিলেন না। আমার সর্বনাশ করার ব্যাপারে আমার দুই কাকা মল্লিকার্জুনকে সাহায্য করেছিলেন। তাদের ধারণা হয়েছিল যে শিবশরণ আপ্পার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে, সারা এস্টেট তাদের ছেলেদের হবে। কয়েক বছর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণের পর যখন বুঝতে পারলাম যে তায়ম্মার সন্তান হওয়া সম্ভব নয়, তখন আবার দ্বিতীয়বার বিয়ের ইচ্ছাটা ব্যক্ত করি। তখন আমার কাকারা খুব চেঁচামেচি করলেন যে এত অল্প বয়সে অধীর হওয়া উচিত নয় আর বাচ্চা না হলেই বা কি, ভাইপোরা তো আছে? এই তো এমন একজন বড়-লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল। এখন তাকে বিসর্জন দেবে? তার মাথার ওপর সতীন এনে তুলবে? একটু ধৈর্য ধরতে পার না? — এঁরা এ-সব বলতেন। আমি তখন নেহাত ছোট নই, কিন্তু লজ্জা অবশ্যই ছিল। আমার সাহস ছিল না যে বলি মেয়েকে লেডী ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাও আর দেখো সে মেয়ে কি-না। এরা আমার লজ্জার সুযোগটা নিয়েছিলেন আর শহরময় আমার দুর্নাম রটিয়েছিলেন।

"আমি রক্ষিতা কাউকে রাখি তাতে আমার কাকাদের আপত্তি ছিল না। কারণ তারা জানতেন যে রক্ষিতার সন্তান এস্টেট পাবে না। আমার সন্তান না হয়, সে নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা ছিল না। তবে এই ভাবনাটা ছিল যেন তা বৈধ না হয়। বাবা-মায়ের সংসার ছেড়ে কালিন্দী যখন আমার কাছে এসে বসবাস করতে লাগল, তখন আমার বদনাম ছড়ানোর ব্যাপারে আমার কাকারাও অংশ নিয়েছিলেন।

কারণ, আমি বিয়ে ছাড়াও, একটা 'অঙ্গবস্ত্র' অর্থাৎ রক্ষিতার ব্যবস্থা করেছি। খবরটা চাউড় হয়ে গেলে আমার কাছে আর কেউ মেয়ে বিয়ে দেবে না। কালিন্দী উকিলের মেয়ে। কিছু একটা লেখা-পড়ার ব্যাপার না করেই কি সে এসে শুধু শুধু থাকছে? সে-কথাও তাঁরা রটালেন। যখন কালিন্দী আমার কাছে চলে এল, তখন তায়ম্মার বিষয়ে সে. বিশেষ কিছু কথা বলতে চাইত না। তাই তায়ম্মা সম্পর্কে সত্যি কিছু জানতে পেরেছিল কি-না, তা আমার জানা নেই।

"আমি যে কালিন্দীকে উপেক্ষা করেছিলাম, তার অন্য কারণও ছিল। যখন মল্লিকার্জুন চুরি করে আমার ব্যবসা-পত্তর খতম করে দিল, তখন একটা বাংলো বন্ধক দেওয়া হয়েছিল। আমায় কেউ ধার দিচ্ছিল না। তখন আমার একজন স্বজাতি হিতৈষী সেজে আমায় কিছু কর্জ দিয়েছিলেন। তবে তাঁর একটা শর্ত ছিল যে আমায় ভালো পথে চলতে হবে, অর্থাৎ কালিন্দীর চিন্তা ছেড়ে ব্যবসায়ে ঠিকমতো লিপ্ত হতে হবে। আমি তাঁর কথা মেনে নিয়েছিলাম তবে কালিন্দীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাত্রে লুকিয়ে চুরিয়ে যেতে শুরু করেছিলাম। এই ভদ্রলোক আমায় কালিন্দীর কাছ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। এটা কিন্তু আমার সত্যিকারের মঙ্গলের কথা ভেবে নয়। বস্তুত ইনিও ছিলেন তাদেরই একজন যারা কালিন্দীকে বলেছিল, "আমার সঙ্গে থাকবে কি?"

"এখন আমি আমার এস্টেটের অবস্থাটা বর্ণনা করছি। যে বাড়ীটায় থাকতাম সেটা, বাংলো, দোকান— সবই বন্ধক দেওয়া। দোকানে মালের চেয়ে ধারের অঙ্কটাই বড়। আর সেটাও আমার সাধ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। আর যতটুকু যা-সঞ্চয় তা-ও দোকানের হিসাবে। ব্যবসার গুডউইল বা সুনামটুকু কেনা এবং ধার-কর্জের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার মতো খরিদ্দার পাওয়া গিয়েছিল আর

আমিও ঋণমুক্ত হতে পেরেছিলাম। অবশিষ্ট হাতে ছিল মাত্র আড়াই হাজার টাকা। মা তাঁর যাবতীয় জমি-জমা চিন্তামণিকে দিয়ে গেছেন। আমার আড়াই হাজার থেকে পাঁচশ টাকা আমার অন্তিম কাজের জন্য সরিয়ে রাখা গেল। কাদাদির পেট্রীতে সেটা আছে। সেই অ্যাকাউন্টটা কালিন্দী ডগ্‌গে আর শিবশরণ আপ্পা এই দুজনের নামে রয়েছে। আমার স্বজনবর্গ যদি আমার অন্তিম সংস্কার না করে তবে কালিন্দী যেন সেটা করে। এটাই আমার বিনীত অনুরোধ। বাড়তি দুহাজার টাকা আমি আজ সাট্টায় লাগাচ্ছি। জিততে যদি পারি ভালোই, নইলে পরবর্তী করণীয় স্থির করাই আছে। কালিন্দী বিনা জীবনটা খুবই ফাঁকা ঠেকছে আর তাকে কাছে ডাকার অধিকারও নেই। কারণ তার জন্য যা আবশ্যক তা আমার নেই।

"চিন্তামণি শৈবধর্মকেই নিজের বলে গ্রহণ করুক, এটাই আমার অভিলাষ। আমি নিজে শৈবধর্মী লিঙ্গায়েৎ। তা নিয়ে আমার আত্মা-ভিমানও আছে। এ-বিষয়ে একবার কালিন্দীকে আমি বলেছিলাম। তবে সে মনে করেছিল যে 'লিঙ্গ ধারণ' একটা অন্ধবিশ্বাস। কালিন্দী সব ব্যাপারেই আমার মতে সায় দিয়েছিল। তবে কোনও ব্যাপারে যদি নীতিহীনতা দেখিয়ে থাকে তবে সেটা ছিল এই ক্ষেত্রেই। সে বলেছিল, "আমি ভস্মই মাখি আর লিঙ্গই ধারণ করি, তাতে কি কোনও জাতিভুক্ত হয়ে যাওয়া যাবে? তা যদি নেয়, তবে দুটো কথা বলব।" আমি নিজে সে সময় সমাজ-বহির্ভূত, তাই কোনও ভরসা তাকে আমি দিতে পারি নি। আমার বক্তব্য ছিল যে গোড়ায় এরা শৈবধর্ম মেনে নিক, তারপর দেখা যাবে, সমাজ এদের মেনে নেয় কি-না। এটা পঞ্চায়েতের বিচারের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে কথাটা কালিন্দীর পছন্দ হয় নি। এখন ভগবান ভরসা।

"আমার চিতাস্থানে যে সমাধি তৈরী হবে, তাতে এটুকু লেখা হবে—

'বিশ্বাস আর সে-সঙ্গে ষড়যন্ত্রী দেওয়ানের কারচুপির শিকার পঙ্কাচার্য ধর্মের উপাসক শিবশরণ তার সব পাপের জন্য শ্রীশঙ্করের ক্ষমা প্রার্থনা করছে ।' "

পত্রখানা পড়ার পর কালিন্দী কাঁদতে চাইল। কিন্তু আশেপাশে এত লোকজন দেখে সেটা সংবরণ করে নিল আর পত্রটি রামরাওকে দিল। রামরাও চেনা-জানা দুয়েকজন·লিঙ্গায়েৎ সাহুকার ব্যবসায়ীদের ফোন করল আর শেষকৃত্যের সব বন্দোবস্ত করল। এতে বম্বের কাদাদি-শাখার লোকেরাও সাহায্য করল।

39

বৈজনাথের স্মৃতিকথার লেখক হিসাবে কাজ করার দিন আজ। মহারাষ্ট্র তথা বিশ্বের ইতিহাসে এটাকে গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে গণ্য করা হয় আর পরেও হয়তো তাই হবে।

সেদিন বৈজনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্য লিখে নেবার দায়িত্ব ছিল সত্যব্রতের। এই দায়িত্বটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, পরাশর প্রভৃতি ধর্মদ্রষ্টারা কোনও বিশেষ স্থান বা যুগেরই মাত্র ছিলেন। আর শাস্ত্রীজী স্বীয় ধর্মকে 'সার্বভৌম' এবং 'সর্বযুগের' করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। মূল্যটা কি এর কম ছিল ?

আজ বৈজনাথ শাস্ত্রী কেবল সূত্র বলে যাচ্ছিলেন আর সত্যব্রত লিখে নিচ্ছিল।

সে-সব সূত্রকে পরিচ্ছেদে ভাগ করে তথ্যবিন্যাস করা ইত্যাদি সত্যব্রতই করছিল। তবে উনি যা বলছিলেন তা থেকে একটি কথাও বাদ দেবার অধিকার সত্যব্রতের ছিল না।

হাতে লেখা একটি নোট প্রতিলিপি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সত্যব্রত বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল. আমি দুদিন বাদে সব নিয়ে আসব। তারপর বিশেষ কাজে শাস্ত্রীজী পুণা থেকে কোঙ্কণ চলে যান। দু'তিন মাস হয়ে গেল। কাউকেই কোনও পত্রাদি তিনি লেখেন নি। হঠাৎ পুণায় তাঁর মৃত্যু-সংবাদ এসে পৌঁছুল।

দৈনিক সংবাদ-পত্র বিক্রেতা চীৎকার করছিল, "বৈজনাথ শাস্ত্রী মারা গেছেন।"

তাঁর মৃত্যু-সংবাদ সব পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটায় সারা মহারাষ্ট্র শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতিসভাও হয়েছিল।

আপ্পাসাহেব ডগ্‌গে আর সত্যব্রতরও খুবই দুঃখ হয়েছিল। কারণ তাদের মনে হয়েছিল যেন পরিকল্পিত সৌধটি ধসে পড়ল। শাস্ত্রীজীকে প্রধান রেখে যে নতুন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছিল সেটা অসমাপ্ত রয়ে গেল।

বৈজনাথ শাস্ত্রীর লেখানো বা বলা সব তত্ত্বাদর্শ সত্যব্রতর কাছে রয়ে গিয়েছিল। সে-সব নিয়ে নয়া সমাজ-স্থাপনের ধৈর্য ওদের ছিল না। বৈজনাথ শাস্ত্রীর জীবন ও চিন্তার একটা দিক যাদের জানা ছিল, তারা এ-সব সূত্র পড়ে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না যে এ-সব মতামত সত্যি তাঁরই কি-না। এ-সব অনুলিখনের শেষে তাঁর স্বাক্ষর ছিল না। আর প্রাথমিক নোটহিসাবে যা লেখা হয়েছিল, তা শাস্ত্রীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল। বৈজনাথ শাস্ত্রীর অনুগত বন্ধুবান্ধবদের কাছে লেখা চিঠির সব নোটেরও খোঁজ পাওয়া গেল না। যদি এরা নিজেরা বৈজনাথ শাস্ত্রীর ট্রাঙ্কবাক্স তল্লাস করতেন, তবে হয়তো সে-সব পাওয়া যেত। কিন্তু ঠিক অতটা কষ্ট তারা করে নি।

সত্যি সত্যি ব্যাপারটা এই ছিল যে আপ্পা সাহেবের নয়া সমাজ

স্থাপনের ইচ্ছাটাই থিতিয়ে এসেছিল। কালিন্দী লাইমলাইটে আসায় সেই ইচ্ছাটা আর তেমন রইল না। বিয়েটা হয়ে গেছে। এখন সুখে-শান্তিতে তারা থাকুক। যদি এখন নয়া সমাজগঠন করা যায়, তবে সব পূর্ব-কথা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। আর লোকেরা বলবে যে অনাচারের একটা সভ্য-সুষ্ঠু রূপ দিচ্ছে এরা। সত্যব্রতরও বিয়ে হয়েছে আর স্ত্রীর প্রতি প্রেমও তার খুব গভীর। তার সেই সাহসও ছিল না যে নয়া সমাজের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়। সেই সমাজে প্রত্যেকে স্বাধীনতা মেনে নিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রচেষ্টার কাজ শাস্ত্রীজীর মতো কর্মদক্ষ এবং প্রখর অহমিকাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্তই ছিল, তবে নতুন দাম্পত্য-জীবন যাপনে প্রয়াসী বেচারী সত্যব্রতর জন্য নয়। অর্থাৎ এদের কারুর-ই 'নয়া সমাজ' স্থাপনের ক্ষমতা ছিল না। রামরাও, কালিন্দী, আপ্পাসাহেব, সান্তাবাঈ, আবা এস্থার সবাই এরা বুঝেছিল যে আমাদের যার যার সমস্যার সমাধান তো হয়ে গেল। পরবর্তীদের যখন কোনও সমস্যার উদ্ভব হবে, তখন সেটা ভেবে দেখা যাবে'খন। ঊষার সমস্যার সমাধান মিলেছিল। এস্থারের বিয়ের পর কতিপয় ইহুদী ক্রুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তার প্রতি বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিসম্পন্নের দল তাকে ছেড়ে যায় নি। এরকমই একজন বিশ্বাসভাজনের সঙ্গে ঊষার পরিচয় ঘটে আর পরে তা প্রেমে পরিণত হয়ে তাদের বিয়েও হয়। বৈজনাথ শাস্ত্রী মৃত্যুকালে জানতেন না যে একটি ইহুদী যুবক ঊষার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। এর তাৎপর্য এই যে 'নয়া সমাজ' স্থাপনে উদ্যোগী সব কজনেরই ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল আর অবশিষ্ট যে আদর্শ নিয়ে বৈজনাথ শাস্ত্রী সংসার উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিসমাপ্তি ঘটল। শ্রমিক-কল্যাণের যে পরিকল্পনাটা রামরাও প্রস্তুত করেছিল সেটা এখনও রয়েছে। কিন্তু তার পক্ষে নয়া সমাজের সেই আদর্শের সম্‌সাধন সম্ভব ছিল না।

নয়া সমাজ স্থাপনা বিষয়ে যখন রামরাওয়ের মতামত আপ্পাসাহেব জানতে চাইলেন, তখন সে বলল, "নতুন চিন্তানুসারে সমাজ-সংস্থাপন আর নতুন জাতি তৈরী— এ-সবের বিরুদ্ধে আমি।"

"লেখাপড়া-জানা লোকের একটা ভিন্ন প্রজাতি স্থাপনটা জরুরী নয়। মারাঠা সমাজ বহুব্যাপক। সবাইকে তার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এখনও এদের মধ্যে অশিক্ষা রয়েছে, তাই এদের দলবৃদ্ধি আপনার ভালো লাগছে না আর এ-থেকে সবাই বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমার তো মনে হচ্ছে জাতিভেদ-বিরোধীরা এই এক মারাঠাজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-তৈরীর দায়িত্ব যেন কেউ না নেয়। আচার-বিচার আর উপাসনা-পদ্ধতি— দুটো আলাদা ব্যাপার। পূর্ণ-স্বাধীনতা পাওয়ার পরেই আমরা এই ভাঙার কাজটায় হাত দেব। যতদিন জনতার অধিকার আমাদের ওপর নির্ভরশীল, ততদিন এই সংস্কার কার্যটি সহজ হবে না॥"

—